বাংলায় বিপ্লববাদ

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ

স্বর্গীয়া তরলা সুন্দরী বসুর
স্মৃতি সম্মানার্থ
পুস্তক সংগ্রহ
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
শ্রীকালীন্দ্র নাথ বসু।

আর্য্য সাহিত্য ভবন
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীবারিদকান্তি বসু

দ্বিতীয় সংস্করণ
মাঘ, ১৩৩৬

মুদ্রাকর—শ্রীশান্তকুমার চা
বাণী প্রেস
৩৩-এ, মদন মিত্র লেন,

দাম আড়াই টাকা

উৎসর্গ

মা, বাংলার বিপ্লবযুগে বাংলাকে মন্থন করিয়া বিষ অমৃত ভগবান উঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সে হলাহল, দুঃখ-বদনা নীরবে বাংলার মায়েদেরই আকণ্ঠ পান করিতে ইয়াছে। বাংলার ঐ যুগের ব্যথার বড় অংশই গ্রহণ রিয়াছিল, বাংলার অসংখ্য তরুণ যুবকের মায়েরা! মা, মি আজ পরলোকে, অনেক মা-ই পরলোকে। কিন্তু হলোক বা পরলোকের ব্যবধান সন্তানের কাছে মাতৃত্বের হিমাকে ছোটও করে না, অস্পষ্টও করে না। যাহাদের থা এখানে থাকিতে অনেক শুনিয়াছ, যাহাদের জন্য কটা মস্ত দরদ নিজের বুকে পোষণ করিতে, সত্য হউক মথ্যা হউক, যাহাদের চাইতে 'ভাল ছেলে' বলিয়া কাহাকেও নে করিতে না, সেই বিপ্লববাদীদের প্রসঙ্গে লিখিত আমার ই 'বাংলায় বিপ্লববাদ', তোমার ও সেই সঙ্গে আর সব ীবিত ও পরলোক-গত মায়েদের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়া ন্য হইলাম। যাঁহারা সন্তানদের অত ব্যথার দান নীরবে হণ করিয়াছেন, প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই, তাঁহারা, যোগ্য হইলেও, সন্তানের দান বলিয়াই 'বাংলায় বিপ্লববাদ' হণ করিবেন, জানি। ইতি—

তোমাদের—

নলিনী

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

'বাংলায় বিপ্লববাদ' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পাঠকদের এবং প্রকাশকের যথেষ্ট চাহিদা ও তাগিদ থাকা সত্ত্বেও আমারই অনবসর জন্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় এই সংস্করণ প্রকাশে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল।

বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের মর্ম্ম কথাটি প্রকাশ করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, প্রথম সংস্করণে সেই চেষ্টাই করিয়াছি, দ্বিতীয় সংস্করণেও তাহাই করা হইয়াছে। সেই মর্ম্ম কথাটি—তাহাদের কর্ম্ম, চেষ্টা, ত্যাগ, দুঃখ, ভুল, ভ্রান্তি সকলের অন্তরালে দেশ সেবার পরম আকুতি। তাহাদের বাহিরের প্রকাশের অন্তরালে যে তত্ত্ব ও সত্য ছিল তাহার যথার্থ পরিচয় দিতে হয়ত সক্ষম হইয়াছি, হয়ত হই নাই; কিন্তু দেশকে স্বাধীন করিবার আকুল আগ্রহে যে তাহারা ঘর ছাড়িয়াছিল, পথে পথেই বাসা বাঁধিয়াছিল, সঙ্গীর অদর্শনে, পতনেও পথ ছাড়িয়া গৃহে ফেরে নাই, পথের কণ্টকে রক্তাক্ত চরণ বিদ্ধ করিয়াছে—আন্দোলনের এই মর্ম্ম কথাটিই বক্তব্য, তাহাই বলিয়াছি।

ইতিহাস লিখিবার মত করিয়া 'বাংলায় বিপ্লববাদ' লিখি নাই, তাই ব্যক্তি ও ঘটনার হিসাব যথাযথ ভাবে করি নাই, অনাবশ্যক বলিয়াই করি নাই। আমার বক্তব্য বিষয়টি, বিপ্লব

আন্দোলনের মর্ম্ম কথাটি প্রকাশ করিতে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই 'ব্যক্তি' ও 'ঘটনা'র আশ্রয় লইয়াছি।

বর্ত্তমান সংস্করণে কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বহু বিষয়বস্তুও বাড়িয়াছে।

বিনীত

গ্রন্থকার

স্বর্গীয়া তরলা সুন্দরী বসুর
স্মৃতি সম্মানার্থ
পুস্তক সংগ্রহ
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
শ্রীক্ষিতেন্দ্র নাথ বসু।

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

'বাংলায় বিপ্লববাদ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। 'শঙ্খে' ইহার কতকটা বাহির হইয়াছিল, সবখানি হয় নাই। বিপ্লবযুগের ঠিক ইতিহাস আমি লিখি নাই। লেখা সম্ভবও নহে। বিপ্লববাদের অনেক খবরই নানা ভাবে প্রচারিত হইয়াছে। সংবাদ পত্র ও পুলিশের রিপোর্ট, প্রচলিত জনরব, কোন কোন রাজনৈতিক মামলার বিবরণী, বিপ্লবযুগের স্বীয় ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং রৌলট কমিটির রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া বিবৃত ঘটনাগুলি সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি। কোথাও ভুল থাকিতে পারে—তবে তাহাতে বিশেষ কোনও ক্ষতি হইবে না, কেন না আমি যাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি তাহা ইতিহাস নহে, বিপ্লববাদের অন্তর্নিহিত কতগুলি ভাব। অনেকেই বিপ্লবযুগকে সরাসরি ভাবে বিচার করিয়া, সেটা ভাল কি মন্দ, ইহা এক নিঃশ্বাসেই বলিয়া ফেলে, কিন্তু বিষয়টা সত্যই অত অনায়াসে ধরা যায় না। প্রকাশটাই সংসারে সবখানি কথা নহে—প্রকাশের অন্তরালেও সময়ে অনেক সত্য আত্মগোপন করিয়া থাকে—সে কথা না জানিলে, যাহা প্রকাশ হইয়াছে, তাহারও সত্যকার রূপকে ধরা যায় না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই বিপ্লববাদের তথা বিপ্লবযুগের কতগুলি দিক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বিপ্লবযুগকে ভাল বা মন্দ বলিবার কোন উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ লিখিত নহে। গ্রন্থ লিখিবার

উদ্দেশ্য ভুল ভ্রান্তি, দোষ গুণ সহ দেশবাসীর কাছে বিপ্লবযুগকে পরিচিত করা। যাঁহারা সেই যুগকে নিছক প্রশংসা করেন, আর যাঁহারা সে যুগকে নিছক নিন্দার্হ মনে করেন, তাঁহারা সেই যুগের সত্যকার পরিচয় পাইলে, প্রশংসা করিতে বা নিন্দা করিতে হয়ত আর একটু বিবেচনা করিবেন।

বাংলার বাহিরের বিশেষ কোন কথা আমি লিখি নাই। বাংলার বিপ্লববাদীদের কথাই আমি প্রধানত বলিয়াছি। ব্যক্তিগত ভাবে কোন বিপ্লববাদীর জীবনকথা বলি নাই। সমগ্র ব্যাপারটাকে ফুটাইয়া তুলিতে স্থানে স্থানে ব্যক্তিগত দুই চারিটা কথা বলিয়াছি মাত্র।

বিপ্লববাদীদের জেলভোগের কোন পরিচয় দেই নাই। তবে জেলভোগটা বিপ্লববাদীরা কে কেমন ভাবে গ্রহণ করিত তাহার পরিচয় দিতে, ঢাকা জেলের সামান্য পরিচয় দিয়াছি।

পলাতক নলিনী বাগচীর কথা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাকড়াশী লিখিত বিবরণী হইতে গ্রহণ করিয়াছি। সিডিশন কমিটির রিপোর্ট হইতেও অনেক সাহায্য পাইয়াছি। পরিশিষ্টে লিখিত, অভিযোগের কথা, Modern Review, Amrita Bazar Patrika ও Englishmanএ প্রকাশিত তদন্ত কমিটির মন্তব্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। ইহাদের সকলের নিকটই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

স্বর্গীয়া তরলা সুন্দরী বসুর
স্মৃতি সম্মানার্থ
পুস্তক সংগ্রহ
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বসু।

বাংলায় বিপ্লববাদ

উপক্রমণিকা

বাংলার কবি শিখ জাতির ইতিহাস ঘাঁটিয়া একটা সত্য পাইয়াছিলেন। ছন্দো-বন্ধে তাহাই ফুটাইয়া লিখিয়াছেন—

"এসেছে সে একদিন,
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ,
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।"

কবিরই জীবনকালে, তাঁহারই স্বদেশে প্রদেশে, এই কথাটা সার্থক হইল, ছন্দঃ মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। "লক্ষ পরাণে—শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ"—সে সত্য যে কেমন ধারার তা বাংলার বিপ্লববাদীদের জীবন-খেলায় (১৯০৬—১৯১৭ পর্য্যন্ত) দেশবাসীরা প্রত্যক্ষ করিলেন।

এমন আপন-ভোলা, এমন হিসাব নিকাশে অবুঝ অনভিজ্ঞ মানুষ—যাহারা দেশকে পাইয়া আপন ভুলিয়াছিল, রাখিয়া ঢাকিয়া কিছু করিতে পারে নাই, দেশের হিসাব নিকাশ বুঝিতে গিয়া আর সব হিসাব নিকাশ ছাড়িয়াছিল, গুনিয়া গুনিয়া পা না ফেলিয়া একেবারে মৃত্যুর দ্বারে গিয়া অমৃত সন্ধানে পাঁয়তাড়া অভ্যাস করিয়াছে,—যাহারা নামের ব্যাধিকে মন্ত্রগুপ্তিতে নিঃশেষ করিয়াছে, প্রকাশকে লুকাইয়া উপেক্ষা ও অবহেলা করিয়াছে—তাহাদের *এই মৃত্যুরঙ্গের জীবন-খেলা কেহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে নাই।* সেই অজ্ঞাত অথচ কর্ম্মবহুল জীবন-ভঙ্গীর একটু ছায়া-চিত্রও তো কেহ রাখে নাই! আর সত্য সত্য, তাহা রাখাও যায় না, যাহাদের খবর তাহাদের কাছ হইতে না পাইলে পাওয়া যায় না, ভাই বন্ধুও যাহাদের জীবন ও গতির সহিত অপরিচিত বা পরিচয় রাখে নাই, দেশবাসী দূর হইতে যাহাদের শুধু লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু পরিচয় লইতে সাহসী হয় নাই; যাহাদের আপন জনে ছাড়িয়াছিল, অথচ, যাহারা সেই আপন জনেরই মুক্তি ক্রয় করিতে আপন জন হইতে দূরে, দূর হইতে দূরে, তাহাদের জ্ঞানের বাহিরে গিয়াই সাধনায় লিপ্ত ছিল, তাহাদের ইতিহাস লেখা চলে না; আমরাও সে ইতিহাস লিখিব না। যাহারা ঘরে বাহিরে লাঞ্ছিত হইয়াও সেই লাঞ্ছনাকেই তাহাদের সান্ত্বনার বস্তু করিয়া তুলিয়াছিল, যাহাদের লাঞ্ছনাকে দেশবাসী উৎসাহিত করিয়া, সম্মান করিয়া সহ্য করিবার মত গৌরবের সামগ্রী করিয়া তুলে নাই, যাহাদের অগ্র পশ্চাতে cheering crowd জয়ধ্বনি করে নাই—যাহারা

জেলে নির্ব্বাসনে যাইতে বা তথা হইতে ফিরিয়া আসিতে দেশবাসীর বাহবা পায় নাই, হয়ত খুব বেশী, খবরের কাগজে শুষ্ক খবর (news) মাত্রই বাহির হইয়াছে—ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিলেও যাহাদের জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিবার সামর্থ্যও দেশবাসীর হয় নাই,—বুদ্ধিমান অভিজ্ঞদের কথায়, যাহারা কেবল ভুলই করিয়াছে, সেই ভ্রান্তি-পথের মৃত্যু-যাত্রী এমন অদ্ভুত মানুষগুলির কথা কেমন করিয়া বলিব?

যাহারা নির্ব্বাসন, জেল ও দ্বীপান্তর হইতে রুগ্ন, ভগ্ন-দেহে, দেশে কোনরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি না করিয়া নীরবে, দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই নিন্দা-প্রশংসার অতীত মানুষগুলির কথা আজ কেন লিখিতে বসিলাম, সে কৈফিয়ৎ দিতে হয় পরে দিব, তবে তাহাদের কথা জানা ও শোনা ভাল, তাহাতে এই নাম যশের কাঙ্গাল আমাদের মঙ্গল হইবে।

বাংলার বিপ্লববাদীদের, দেশবাসী সাধারণ ভাবে Anarchist অর্থাৎ অরাজকপন্থী আখ্যা দিয়াছিলেন; কিন্তু ইংরেজ কর্ম্মচারীরা তাহাদের কার্য্যকলাপ ব্যাপকভাবে জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন—ইহারা কেবলই Anarchist অরাজকপন্থী নহে, ইহারা স্বাধীনতাপ্রয়াসী, বিপ্লববাদী।

বাংলার বিপ্লববাদীরা হয়তো ভুল করিয়াছিল, হয়তো ভ্রান্ত ধারণায় পরিচালিত হইয়াছিল, কিন্তু এ যুগে স্বাধীনতার মূর্ত্তি তাহারা যে অন্তত কল্পনা করিতে পারিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তাহারা যাহা চাহিয়াছিল সেজন্য তাহারা কতখানি দিতে পারিয়াছে, কতখানি দিতে পারে নাই, কতখানি ব্যর্থ হইয়াছে, কতখানি সফল হইয়াছে, তাহা জানিতে হইলে, তাহাদের ভিতরকার সত্যটির অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহাদের বাহিরের প্রকাশটার অন্তরালে কোন্ বস্তুটি লুকাইয়া আছে,—তাহার সন্ধান পাইলেই বুঝা যাইবে ইহার কতখানি সত্য কতখানি মিথ্যা। একেবারে লুকাইয়া লুকাইয়া কাহাকেও জানিতে না দিয়া মৃত্যুর দ্বারে গিয়াও যাহারা আত্মগোপন করিতে পারে, তাহাদের ঐ গোপন ব্যাপারটির মধ্যে কেবল কি সৎসাহসের অভাবজনিত ভীরুতার গ্লানিই রহিয়াছে না আরো কিছু আছে—তাহাও আমাদের জানিতে হইবে। এই জানায় আমরা কতখানি শিখিতে পারিব, কতখানি ভুলিতে পারিব, তাহার বিচার পরে করা যাইবে।

এমন ঘটনাও জানা গিয়াছে,—উভয় পক্ষের (পুলিশ ও বিপ্লববাদী) সাক্ষাতের ফলে দুই দিকেই গুলি চলিল .... বিপ্লববাদী আহত অবস্থায় হাঁসপাতালে শায়িত—পুলিশ নাম লইতে ব্যগ্র—dying declaration, মৃত্যুকালীন জবানবন্দী চাহে।

মৃত্যুশয্যাশায়ী বিপ্লববাদী অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আসন্ন মৃত্যুকে অপেক্ষা করিয়া আছে। অপরে যাহাই জানুক, সে নিজে জানে দেশহিত-ব্রতে উদ্বুদ্ধ হইয়াই সে আজ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে। তাহার এই ধারণার মধ্যে আত্ম-প্রবঞ্চনার লেশমাত্রও নাই।

যাহাই হউক, জীবনের এমন শেষ সময়ে সাধারণ ব্যক্তি আত্মগোপন করিতে পারে না, বরং আত্মপ্রকাশ করিয়া যায়।

ইচ্ছা হয়, তাহার কার্য্যাবলী দেশবাসী সম্যক বুঝে। যাহাদের জন্য সে মরিতেছে তাহারা জানুক যে, তাহাদের জন্যই সে প্রাণপাত করিল। এমন ধারার ইচ্ছাই সাধারণ মানুষের হয়। কিন্তু বাংলার বিপ্লববাদীদের আত্মগোপন-ভঙ্গী সাধারণ নহে; শিক্ষা ও সাধনা ভিন্ন তেমন আত্মগোপনে সামর্থ্য আসে না। মৃত্যুর সময়েও ইচ্ছা নাই, কেহ তাহাকে জানুক, কেহ তাহার 'মূল্য' বুঝুক্—কোন message নাই,—"unwept, unhonoured, unsung"ই সে যাইতে চাহে!—

তাই মৃত্যুশয্যাশায়ী বিপ্লববাদীর ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর বাহির হইল, Don't disturb, let me die peacefully :—বিরক্ত ক'র না, আমাকে শান্তিতে মর্‌তে দাও।

পুলিশ নানা ভাবে চেষ্টা করিল,—বলিল, নামটি বল,—বাড়ী কোথায়? বিপ্লববাদীর একই উত্তর, Don't disturb, please let me die peacefully—অনুগ্রহ ক'রে শান্তিতে মরতে দাও গোলমাল ক'র না।—

একবার স্থির হইয়া এমন মৃত্যুর মহিমার কাছে আমাদের নাম যশের আকাঙ্ক্ষার কথা ভাব, আর বুঝিতে চেষ্টা কর, কেমন করিয়া তাহারা আত্মবিনাশ করিয়াছে। জীবনের সমস্ত আশা ভরসা অপূর্ণ রাখিয়া সংসার হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, প্রতিষ্ঠার একবিন্দু কামনাও রাখে নাই। মৃত্যুর দ্বারে গিয়া যেখানে প্রকাশের ভয় নাই সেখানেও খ্যাতিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াই শান্তিতে মরিয়াছে। নিজের কর্ম্মে নিজের তৃপ্তি হইয়াছে,

তাই অপরের অপেক্ষা না রাখিয়াই আত্মপ্রসাদের শান্তিতে মরিতে চাহে। জগতে আর চাওয়ার কিছুই নাই, কেবল দেওয়ারই সে মালিক। এ আত্মগোপনকে কি বলিব? যাহা বলিতে হয় বল, কিন্তু ইহা অপূর্ব্ব!

এই 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি' লোকগুলির চরিত্র যে কেমন করিয়া এমন অদ্ভুত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা বাংলার বিপ্লববাদীদের ক্রমবিকাশের ধারা জানিতে পারিলে সম্যক বুঝা যাইবে।

স্বর্গীয়া তরলা সুন্দরী বসুর
স্মৃতি সম্মানার্থ
পুস্তক সংগ্রহ
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বসু।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলায় মাল মসলা ছিল

একটা জাতির উঠা-পড়া, বাঁচা-মরা কাহারো অনুগ্রহে হয় না, নিগ্রহেও হয় না—সে বাঁচা-মরার একটা নিয়ম আছে। সেই নিয়মের ব্যতিক্রমে আমরা মরিও নাই, বাঁচিবও না।

মৃত্যুকে বরণ করিয়া অনেক জাতি বাঁচে, আবার বাঁচাকে আঁকড়াইয়া থাকিয়া অনেক জাতি মরে। ভোগকে ত্যাগের দ্বারা সত্য করিয়া তুলিতে হয়; সেই খবর না জানিলে, ভোগ সম্ভব হয় না। উপনিষদে আছে 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা।'

স্বদেশীযুগের বাঙালী ত্যাগের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিল। সেই ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই বাংলার যুবজন শেষে বিপ্লবাগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। সেই আগুনের খেলায় জাতিহিসাবে বাঙালী তথা ভারতবাসী সায় দেয় নাই। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ইহাদের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—who in their eagerness for political progress have broken the law—কিন্তু সেই 'আইন ভঙ্গ' যে কেমন ধারার তাহা অনেকেই জানে না।

(বাংলায় বিপ্লববাদ সাধারণতঃ ও মুখ্যতঃ ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা প্রচারিত হইয়া নব্য বাঙালী-সমাজে বিস্তৃত হইয়াছিল,

তাহা অতিক্রম করিয়া বাংলার সাধারণ মনকে স্পর্শ করে নাই, করিতে পারে নাই।)

(রাষ্ট্রীয় বিপ্লব একটা জাতিতে হঠাৎ সম্ভব হইয়া উঠে না, তাহার গোড়ায় আরো অনেকখানি কথা থাকে।) বাংলা দেশে বিপ্লব আরম্ভ হইত না যদি বিপ্লবের যোগ্য মন বাংলার শিক্ষিত সমাজ পূর্ব্বাহ্নেই প্রস্তুত করিয়া না রাখিত। 'স্বদেশীর'ও বহু পূর্ব্বে মনের দিক দিয়া বাঙালী 'বিপ্লববাদী' হইয়া পড়িয়াছিল। এই খবরটি না রাখিলে বাঙালীকে কিন্তু সম্যক্ বুঝা যাইবে না। ধর্ম্মে, সমাজে, শিক্ষায় সেই বিপ্লব সংঘটন হইয়াছিল বলিয়া বাঙালীর মনেই সর্ব্বপ্রথম এই রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষাও জাগিয়া উঠিয়াছিল।

ঐ যে নদীয়ার আঙ্গিনায় গোরাঙ্গটা নাচিয়াছিলেন, তাঁহার প্রভাবে বাঙালীর সাহিত্য সমাজ ও ধর্ম্ম যে কোন্ বিচিত্র নবীন রাগে রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল—মানুষকে শ্রেষ্ঠ করিয়া দেখিবার যে গণ্ডীকাটা গতি সে যুগে বাঙালীকে পাগল করিয়াছিল,—বাঙালী সে সন্ধান কতটা রাখে, জানি না। তাহার পরবর্ত্তী যুগে রামমোহন, বিদ্যাসাগর পুরাতনের বন্ধনকে ভাঙ্গিবার যে আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন,—এই যে মুক্তির জন্য সে যুগের ব্যাকুলতা, এই যে বন্ধনকে, অবসাদকে, হীনতা ও মিথ্যাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য ও শিক্ষায় বিদ্রোহ—ঐখানেই বিপ্লবযোগ্য মনের পত্তন। একদল বাঙালী স্বদেশীযুগে এই মনের জোরেই বিপ্লব পথে ছুটিয়া রাষ্ট্রীয় মুক্তি অর্জ্জন করিতে চাহিয়াছিল।

(ধর্ম্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে ও সাহিত্যে যখন মানুষ মুক্তিকে চাহে, তখন সকল সময় সে মাত্রা ঠিক রাখিয়া চলিতে পারে না; মুক্ত হইবার ব্যাকুলতায় সে গণ্ডী কাটিয়াও চলে। নব্য বাংলায় সে গণ্ডীকাটার যুগ ঠিক কবে আরম্ভ হইয়াছিল বলা না গেলেও একথা বলা চলে যে, ডিরোজিও, রামতনু, রাজনারায়ণ প্রভৃতির যুগেই সেই ভাঙ্গার সূত্রপাত হয়। নূতনের নেশায় পুরাতনকে, মুক্তির আগ্রহে বন্ধনকে ভাঙ্গিবার ও ছিন্ন করিবার উন্মাদনা সেই সময়কার যুবজনের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। সেই ভাঙ্গার মুখে তাঁহাদের যে ত্যাগ ও দৃঢ়তা দেখি, তাহা কেবলই উচ্ছৃঙ্খলতা বা ভ্রান্তি বলিয়া মনে করিতে মন সরে না; সেখানেও তাঁহাদের মুক্তির বাসনায় ব্যাকুল টাটকা তাজা চিত্তগুলি জাতীয় সম্পদ হইয়াই রহিয়াছে! জোর করিয়া 'অভক্ষ্য' ভক্ষণে উচ্ছৃঙ্খলতা থাকিতে পারে, কিন্তু মুক্ত হইবার ভ্রান্ত বাসনাকেও শ্রদ্ধা না করিয়া পারা যায় না। বাঙালীকে জানিতে হইলে বাংলার সেই ভাঙ্গার অধ্যায়টাও আমাদের জানিতে হইবে।)

(রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ সকলেই জাতির কাছে নানাভাবে সেই এক 'মুক্তি'ই প্রচার করিয়াছিলেন। বন্ধনহীন, মুক্ত, তাজা মন তাঁহাদের শিক্ষায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে সেই মনের মালিক হইয়াই বাংলার যুবজন দেশাত্মবোধের নূতন ধারায় মাতিয়া একেবারে এক অপূর্ব্ব পথে যাত্রা করিয়া বসিল।)

সে পথের আদি মধ্য অন্তে যে কত অদ্ভুত কর্ম্ম, কত কঠোর ব্যথা, কত রক্তাক্ত স্মৃতি রহিয়াছে, সে পথে যে কত দেবতা-

অপদেবতার মিলন ঘটিয়াছে, স্বর্গ-নরক এক সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছে, তাহাও সেই বন্ধুর দুর্গম পথের বিস্তৃত পরিচয়কালে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারিব।

বাংলার বিপ্লববাদীদের এই সুদীর্ঘকালের কার্য্য-প্রণালীর মধ্যে আর-একটা জিনিষ বুঝিতে পারিব, তাহা এই, যে উদ্দেশ্য লইয়া একটা জাতি প্রথম জাগে, নানা অবস্থায় পড়িয়া, কর্ম্মক্ষেত্রের নানা অভিজ্ঞতায় কিন্তু সেই উদ্দেশ্য ছাড়িয়া ক্রমে বৃহত্তর উদ্দেশ্য, বৃহত্তর আদর্শে সেই জাতি অনুপ্রাণিত হয়। তদানীন্তন বাংলা কোন্ উপলক্ষে, কোন্ মূল সূত্র অবলম্বনে জাগিয়া ক্রমে কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাও ঘটনা বিবৃতি কালেই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

জাতির ধর্ম্ম, সাহিত্য, সমাজ বিপ্লববাদীদের কাছে যে একটা স্বতন্ত্র রূপে দেখা দিয়াছিল—বাংলার উগ্রপন্থী-মধ্যপন্থী রাজনীতিবিদগণের, বাংলার সংরক্ষণশীল গোঁড়া এবং উদারনীতিক সমাজ-সংস্কারকগণের কোন একটা মতই যে তাহারা পরম সত্য বলিয়া মানিয়া নিতে পারে নাই, এদিকেও তাহাদের চিন্তাধারা যে একটা স্বতন্ত্র পথ ধরিয়াই চলিয়াছিল, তাহাও এই ইতিহাস আলোচনায় কতকটা বুঝা যাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সূচনা

রুষ-জাপান যুদ্ধ বাংলার জাতীয় জাগরণের গোড়ায় কতখানি কাজ করিয়াছে তাহা আজ বুঝা শক্ত বটে, কিন্তু বড়র সঙ্গে ছোটর বিরোধ বলিয়াই হউক বা এসিয়াবাসীর সঙ্গে ইউরোপের প্রবল রাজশক্তির লড়াই বলিয়াই হউক, আমাদের সহানুভূতি কিন্তু স্বভাবতই জাপানের উপর গিয়াছিল এবং সেইখানেই যেন বাঙালীর মনেও একটা ক্ষীণ আশা জাগিয়াছিল। এবং ক্ষুদ্র জাপান যেমন রুষকে পরাভব করিয়াছে তেমনি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিয়া আমরাও ইংরাজকে শেষে পরাভূত করিতে পারিব এমন আশাও কারো কারো ছিল। জাপানের উপর সহানুভূতিতে বাঙালী একটা ambulance corps পর্য্যন্ত খাড়া করিতে উদ্যত হইল। ঐ সময়ে এবং তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই শরীর-চর্চ্চার দিকেও একদল লোক বেশ নজর দিলেন। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী, স্বর্গীয় পি, মিত্র প্রভৃতির উৎসাহে তেমন একটা দলও গড়িয়া উঠিল। সেখানে আত্মরক্ষার নানাবিধ কৌশল ও লাঠিখেলার চেষ্টা চলিতে লাগিল। তখনকার শরীর-চর্চ্চা কিন্তু সাধারণত রাস্তা-ঘাটে রেল-ষ্টিমারে, গোরার অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্তই চলিয়াছিল। ঐ লাঠি-

খেলা ও আখড়ার সঙ্গে ঐ সময়ে গুপ্ত সমিতির কল্পনা এবং তাহা গড়ার চেষ্টা চলিতেছিল। তবে তাহাদের কোন বিশেষ কার্য্যকলাপ তখনও দেশে প্রত্যক্ষ হয় নাই—দুই চার দশজন সভ্যই হয়ত ছিল। কল্পনায় আকাশকুসুমও খুব গড়া হইত। তরোয়ালের প্রতিনিধি লাঠির ভাঁজের কৌশলে, আর আনন্দমঠের ছত্রে ছত্রে তখনই একদল বাঙালী স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। তখনো কেবল মনের মধ্যে, বন্ধুর সঙ্গে, গল্পে, সময় মত ও ঘটনা চক্রে এক-আধবার স্বাধীনতার অসম্ভব রকমের জল্পনা-কল্পনা চলিত। বলা বাহুল্য তখনো সেটা কার্য্যে পরিণত করার কোন চেষ্টা চলে নাই। এই সময়ে, স্বদেশী আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্ব্বে, বোমাওয়ালাদের কয়েকটা বিপ্লবকেন্দ্রও স্থাপিত হইয়াছিল। অথচ তাহাও ব্যাপক কিছু নহে, দুই-চার-দশজন লইয়া শলা-পরামর্শ মাত্র। Secret Society, গুপ্ত সমিতি স্থাপনের চেষ্টা মাত্র। ব্যাপক organisation যাহাকে বলে, তখন পর্য্যন্ত তাহার কিছুই নহে। বঙ্গভঙ্গ ব্যাপারে স্বদেশী আন্দোলনের যে সূত্রপাত হয়, তাহা হইতেই মুখ্যভাবে বাংলার বিপ্লববাদের সূচনা ও তাহা প্রসার লাভ করিতে থাকে। সুতরাং প্রধানত স্বদেশী আন্দোলনের আমল হইতে আমরা কথা আরম্ভ করিব।

বুঝি বড় শুভক্ষণে বাংলা দেশ বিভক্ত করিতে বড়লাট কার্জ্জন গোঁ ধরিলেন। এই উদ্দেশ্যে পূর্ব্ববাংলায় সফর দিয়াও আসিলেন। জমীদারদের বুঝাইলেন,—কিন্তু মহারাজ সূর্য্যকান্ত তাঁহার বাড়ীতেই বলিলেন 'আমি সমর্থন করিব না'। বাংলা দেশ সম্বন্ধে আবেদন

করিল, নিবেদন জানাইল—"ওগো আমাদের ভাগ করিও না।" কত সভাসমিতি, কত দৌড়-ঝাঁপ! সেই উচ্ছ্বাস যাহারা দেখিয়াছে তাহারাই জানে সে কি ব্যাপক উত্তেজনা! যখন আবেদন বিফল হইল, ক্ষোভে যেন বাঙালী গর্জ্জিয়া উঠিল। 'বয়কট' মন্ত্র চারিদিকে ঘোষিত হইল! মুসলমান ভিন্ন সমগ্র বাংলা তখন এক।

সকল আন্দোলনই আরম্ভ হয় কলিকাতায়—তারপর তাহা লুফিয়া লয় মফঃস্বল। বাংলার লাঠিখেলা বল, বোমা বল, সব কিছুরই আরম্ভ এইখানে।

তখন আমাদের ছাত্রজীবন। পূর্ব্ব বাংলায় যেন একটু বেশী হুজুক। আজিকার এ দিনেও ঐ স্বভাবটা তাহার যায় নাই, বুঝি যাইবেও না। "বাঙালের গোঁ" নাকি বড় বিশ্রী।—ছাত্র হইলে কি হয়—ছাত্র শিক্ষক একসঙ্গেই আমরা স্বদেশী সভা করিয়া বেড়াই। তখন 'সঞ্জীবনী' আর 'প্রবাসী'ই বেশী স্বদেশী ছিলেন। এই দুইখানা কাগজই আমরা বেশী পড়িতাম। 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি একটু পরে আসে। তখন কিন্তু আমরা 'খাঁটি' স্বদেশী অর্থাৎ তখনও 'অপবিত্র' হই নাই, বিপ্লবের বালাই রাখি না। বঙ্গভঙ্গ রদ করিতেই হইবে, নতুবা আমাদের মান ইজ্জত আর থাকে না—উহাই ছিল তখনকার প্রধান কথা। বাঙালীকে ভাগ করিয়া ফেলিস—কি সর্ব্বনাশ! কত যুক্তি যে তখন দিতাম তাহার আর অন্ত নাই। সে সমস্ত কথা মনে হইলে হাসি পায়। তবে বঙ্গভঙ্গে ঠিক যে কি ক্ষতিবৃদ্ধি হইল, তাহা কিন্তু বুঝিলাম না। না বুঝিলে কি হয় ও ত নিমিত্ত মাত্র। বাংলার প্রাণে যে জোয়ার আসিয়াছিল সে জোয়ারে, "জয় মা"

বলিয়া তরী ভাসাইয়াছিল সকলেই, ভাবিয়াছে পরে। ভাল-মন্দ বলিব না, কিন্তু ইহাই দস্তুর। যাক্, স্বদেশী হইয়া কিন্তু প্রথমেই রৌদ্র বৃষ্টির সঙ্গে দস্তুর মত 'নন্-কো-অপারেশন' আরম্ভ করিয়া দিলাম। অর্থাৎ রৌদ্র বা বৃষ্টি হইলে আর defence আত্মরক্ষার জন্য ছাতা ব্যবহার করিতাম না। কেন জানি না, স্বদেশী কাপড় পরিতে আরম্ভ করিয়াই দেখিলাম দেহখানি বেশ সাত্ত্বিক হইয়াছে—চুল একটু এলেমেলো হইয়াছে, পাদুকা অদৃশ্য হইয়াছে! এদেশে সাত্ত্বিকতার ইহাই লক্ষণ। প্রথম মিলনের আবেগে, কেবলই আনন্দ! শুনিয়াছি, ছাতা বিক্রয় কমিয়া গিয়াছিল। বৃষ্টিতে ভিজিয়াই সকলে সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের কথা শুনিবে। দৈবাৎ যদি কেহ ছাতা মেলিয়া ফেলিত তাহাও ঐ ত্যাগের রাজ্যে তৎক্ষণাৎ বন্ধ। গ্রামে গ্রামে সভা—পাঁচ মাইল দশ মাইল দূরে দূরে সভা। রৌদ্র মাথায় করিয়া খাঁ খাঁ মাঠের মধ্য দিয়া দল বাঁধিয়া সভায় চলিলাম ; - মুখে আবার ঐ সময়েই গানের সুর খেলিতেছে—'নগরে নগরে জ্বাল্‌রে আগুন, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ।' সে কি বেপরোয়া আনন্দ—আজ কেবলই মনে হয় 'তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ!' বাংলার তরুণ হৃদয়গুলি আজ তেমনি ত মাতিয়া উঠিয়াছে, আজ মাতৃমঙ্গল শঙ্খধ্বনিতে তেমনি ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে ; তাইত আশা, জাতির কাণ্ডারী ভগবানই জাতির হাল ধরিয়া আছেন—আমরা ত নিমিত্ত মাত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দেশাত্মবোধ

বঙ্কিমচন্দ্রের আমল হইতে বাংলা দেশে বিশেষ করিয়া দেশাত্মবোধ জাগিতেছিল।—হেমচন্দ্র, নবীন, রঙ্গলাল দেশের কথা গাহিলেন;—গোবিন্দ রায় আক্ষেপ করিলেন 'কতকাল পরে বল ভারত রে, দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে',—কিন্তু সে দেশাত্মবোধ যেন সুধীসমাজেরই একচেটিয়া ব্যাপার, জনসাধারণ তাহাতে মাতিল না। শেষে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে সারা বাংলার একাত্মতা বুঝাইতে গিয়া বাঙালী ঐক্যমন্ত্র উচ্চারণ করিল। সেইখানেই দেশাত্মবোধের জন্ম। তাহার পর আবেদন-নিবেদন করুণ ক্রন্দন যখন ব্যর্থ হইল, তখন বাঙালী বুঝিল, 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'। তখন আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা। ক্রমে বাঙালা কেমন করিয়া দেশাত্মবোধে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল,—প্রথম জাগরণের উত্তেজনা ও বিদ্বেষের অন্তে, কেমন করিয়া দেশভক্তিকে আশ্রয় করিয়া দেশমাতৃকার চরণে জীবন উৎসর্গ করিল, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া নবীন বাঙালী নবীন সন্ন্যাসী সাজিতে বসিল—একে একে তাহা বলিতে চেষ্টা করিব। একটা জাতি একদিনে জাগে না; গোড়ায় অনেক মালমসলা ব্যয় করিলে তবে তাহার জাগরণের সৃষ্টি সূচিত হয়। যে সময়কার কথা

বলিতেছি, তখন একদিকে 'বয়কট' আর 'পিকেটিং'-এর উন্মাদনা, অপর দিকে বাংলার সাহিত্যিক ও কবিকুল সহস্রধারে শুদ্ধ দেশাত্মবোধকে ঢালিয়া দিয়া জাতির চিত্তটি কানায় কানায় ভরিয়া তুলিতেছিলেন।

আত্মসম্মানে আঘাত পাইয়া ইংরেজের উপর ক্রুদ্ধ আবেগে যাহার গতি, বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার দারুণ জেদই যাহার কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনার মূল, ইংরেজের পার্লামেণ্ট হইতে বঙ্গভঙ্গ রদের হুকুম আদায় করিয়া লইবার জন্যই যাহাদের তর্জ্জন-গর্জ্জন—তাহারা কিন্তু দুই দিন পরেই আবেদন-নিবেদন, তর্জ্জন-গর্জ্জন একই কালে অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া নূতন সুরে গান বাঁধিল। সে গানের ছত্রে ছত্রে মাতৃমহিমা কীর্ত্তিত হইল, সে গানের অপূর্ব্ব ছন্দে, সুরে, মূর্চ্ছনায় দেশমাতৃকার চিরন্তন মূর্ত্তি মূর্ত্ত হইয়া বাঙালীর কাছে প্রত্যক্ষ হইল; সে গান বাংলার প্রাণ-নিংড়ানো রসে সিক্ত হইয়া ভাষা জননীকে পুষ্ট, স্বচ্ছ ও শ্রেষ্ঠ করিল; সে গানের আকুল আহ্বান তরুণ বাংলাকে ঘর ছাড়াইয়া পাগল করিল। সে-বাঙালী বাংলা দেশকে এমন সত্য করিয়া পাইল—যাহা সহজেই তাহার কাছে দেশ-ধর্ম্মেই পরিণত হইল। দেশ যে আর মাটির বস্তুটিই নহে—এ যে জাতির যুগ-যুগান্তরের সাধনার জমাট বিগ্রহ—এ বিগ্রহের সেবায়ই যে জীবন ধন্য হয়, জীবের অমৃত লাভ হয়—এই ধারণা বাংলার কর্ম্মীদের মধ্যেই প্রথম জাগিয়া উঠিল। সে শুদ্ধ ভাবধারায় আবেদন নাই, নিবেদন নাই, তর্জ্জন নাই, গর্জ্জন নাই, পরমুখাপেক্ষিতা নাই, পরবিদ্বেষ নাই—যাহা রহিল সে শুধু

মাতৃভক্তি—অনাবিল দেশপ্রীতি! যাহা রহিল, তাহা দেশমাতৃকার জন্য সর্ব্বস্বত্যাগের উদাত্ত গদ্‌গদ্‌ করুণ আহ্বান—সে গান, সে সাহিত্য যে সত্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহা অমর। বাংলার দেশাত্ম-বোধের আকৃতি, প্রকৃতি সে ধারায় স্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। সে ভাবের ধারায় অবগাহন করিয়াই বাংলার যুবকগণ বঙ্গভঙ্গ রদ করাই আর দেশসেবা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই—দেশকে সনাতন ও নিত্যনূতন করিয়া এক সঙ্গেই পাইল।

বঙ্গভঙ্গ রদ করিতে যখন বিদেশী বর্জ্জনের দারুণ প্রতিজ্ঞা লইয়া পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে বাংলার ছাত্রগণ জোর 'পিকেটিং' চালাইতেছিল, আর প্রৌঢ়গণ বক্তৃতা দ্বারা তাহাতে ইন্ধন যোগাইতেছিলেন, তখনও কিন্তু বাহির-নিরপেক্ষ হইয়া বাঙালী দেশাত্মবোধকে একান্ত আশ্রয় করে নাই—তখনও লর্ড কার্জ্জনের হঠকারিতাই ছিল তাহাদের দেশসেবার প্রধান উপকরণ।

তখন বাঙালী উন্মাদকণ্ঠে গাহিত—

"সাতকোটী লোকের করুণ ক্রন্দন,
শুনে' না শুনিল কুর্জ্জন দুর্জ্জন
তাই, নিতে প্রতিশোধ মনের মতন
করিলাম রাখি-বন্ধন।"

তারপর গাহিল—

"নগরে নগরে জ্বাল্‌রে আগুন
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ,

বিদেশী বাণিজ্যে কর্ পদাঘাত
মায়ের দুর্দ্দশা ঘুচারে ভাই।”

শুধু বিদেশী বাণিজ্যে পদাঘাত করিলেই যে মায়ের দুর্দ্দশা ঘোচে না—একথা বাঙালীর কাছে তখনও সত্য হইয়া উঠে নাই। কিন্তু দুই দিন না যাইতেই, বাংলার প্রাণে যে স্বদেশীর শুদ্ধ সত্য ধারা চলিতেছিল, তাহা কবি ও সাহিত্যিকদের মুখে মুক্ত হইয়া উঠিল।

যে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি একদিন বিদেশীর সঙ্গে তুলনা করিয়া বিদেশীর সুখ সভ্যতা সম্পদের কাছে দাঁড়াইয়া নিজেদের কেবলি ছোট ভাবিয়া দেশের দুঃখে গাহিয়াছিলেন, ‘মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি’, ‘একি অন্ধকার এ ভারত ভূমি’ প্রভৃতি নানা দুঃখ-দৈন্যের গান, সেই রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিই দেশাত্মবোধের নূতন ধারায় গাহিলেন,—

“ওগো মা, তোরে দেখে দেখে
আঁখি না ফেরে।”
“তোর দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে।”

দেশ যে সনাতন, দেশ যে কুজনের আগেও ছিল, পরেও থাকিবে—ইংরেজ সভ্যতার সৃষ্টির আগেও ছিল পরেও থাকিবে—সে সত্যকার দেশ যে জীবন্ত—সেখানে আমার ভক্তি আশ্রয় করিলে আর ত সে ছোটটি থাকে না। মাকে ত কোন অবস্থায়ই কেহ ছোট ভাবিতে পারে না—মাতৃত্ব নিজেই যে সত্য, পূর্ণ। তাই অনুতাপে কবি গাহিলেন—

"যখন অনাদরে চাইনি মুখে,
ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা
আছে ভাঙ্গা ঘরে একলা পড়ে,
দুঃখের বুঝি নাইকো সীমা"—

কিন্তু আজ মাকে চিনিয়াছি—মার ঐশ্বর্য্যে, মার চরণের দীপ্তিতে আকাশ আজ আলোকিত।

"আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল,
ঐ চরণের দীপ্তিরাশি।"

কাঙ্গাল যে আর আমি নই, তাহাও জানিয়াছি; মার হৃদয়ে, যেখানে রতন মাণিক জমিয়া আছে, তাহারও সন্ধান পাইয়াছি। "কে বলে তোর দরিদ্র ঘর, হৃদয়ে তোর রতনরাশি, জানি গো তোর মূল্য জানি, পরের আদর কাড়্‌ব না, মা।"

শুধু কি তাই! দেশ-মাতৃকার মধ্যে বাঙালী কবি তখন বিশ্ব-মাতাকে সত্য করিয়া উঠাইলেন।

"ও আমার দেশের মাটি
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর,
তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

অনেক সময় বাহিরের কোন ঘটনা উপলক্ষ করিয়া মানুষ ও জাতি জাগে—কিন্তু যদি সে জাগরণের উপকরণ শেষে নিজের মধ্যেই সে একান্ত করিয়া না পায়, তবে তাহার জাগরণ কখনো স্থায়ী হয় না। কারণ বাহিরের তাগাদ, আঘাত তাহাকে বরাবর

সজাগ রাখিতে পারে না, কর্ম্মের দ্যোতনা দিতে পারে না; তাগিদ আসা চাই ভিতর হইতে, অন্তরের মণিকোটায় যে আত্মদেবতা রহিয়াছেন সেইখান হইতে,—তবেই তাহা স্বাভাবিক হয়, সত্য হয়, সুতরাং স্থায়ী হয়।

কথাটা হইতেছে এই, লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গকেই যাহারা দেশসেবার প্রধান ও শেষ উপকরণ করিয়াছিল, তাহারা দুই দিন পরে যখন 'আসল পথে আঁধার নেমে' তখন আর দেশসেবায় লাগিয়া থাকিতে পারিল না—কিন্তু, যাহারা বঙ্গভঙ্গকেই আর দেশসেবার উপকরণ করিয়া দেখিল না—দেশকে বাহির-নিরপেক্ষ হইয়াই পাইল—তাহারা ঘন অন্ধকারেও পথ খুঁজিল, সহজে আর ফিরিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্বদেশী আন্দোলনের আর-এক দিক

সেই বয়কটের পুরাদমের সময়, নেতাদের গাড়ীও খুব টানা হইল। ঘোড়াগুলি বুঝি হতভম্ব হইয়া ভাবিল—'এরা ক্ষেপেছে!' তখনও ফুলের মালা, বাহবা, ধন্য ধন্য থামে নাই। কয়দিন পরেই যখন সরকার রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, মুসলমানদের সহায় করিয়া নির্য্যাতন আরম্ভ করিলেন—পূর্ব্ব বাংলার জামালপুর প্রভৃতি স্থানে মুসলমানেরা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া হিন্দুভাইদের উপর অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত হইল না—তখন আন্দোলনের গতিভঙ্গী চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখন অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইতে নানা স্থানে সমিতি হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতে লাগিল। দলবদ্ধ হইয়া শরীর-চর্চ্চা, লাঠিখেলা চালাইল—দলবদ্ধ হইয়া যুবকগণ নানা-স্থানের অত্যাচারের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হইয়া উঠিল। স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানেরা শুধু যোগ না দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বিরুদ্ধতাও করিতে লাগিল। হিন্দুর মন্দির, প্রতিমা উন্মত্ত মুসলমানেরা ভাঙ্গিয়া ফেলিল; কুমিল্লায় ঢাকার নবাব বাহাদুরের গমন উপলক্ষে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাইল। একদল মুসলমান হিন্দুদের নির্য্যাতন করিতে চেষ্টা করিল, হিন্দু যুবকেরাও আত্মরক্ষায় বদ্ধ-

পরিকর হইল। ইংরেজের ভেদনীতির জয় হইতে দেখিয়া দেশভক্ত হিন্দু মুসলমান সমভাবেই মর্ম্মপীড়া ভোগ করিতে লাগিলেন। জামালপুরে উন্মত্ত জনসঙ্ঘকে কে বা কাহারা গুলি করিল! বিপ্লববাদীরা এই সময়ে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল না। তাহারা এই উন্মাদনার অবসরে তাহাদের দলপুষ্টি করিয়া যাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য বিপ্লববাদীরা এই বিরোধের মূল যে ইংরেজের ভেদনীতি এই কথাই বুঝিল। [মুসলমানদের সঙ্গে বিরোধের প্রবৃত্তি, ইচ্ছা বা দুর্ব্বুদ্ধি তাহাদের ছিল না। তবে বাঙালীকে সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত ও সজাগ করিতে যুবকদের বাছিয়া বাছিয়া দলে লইতে লাগিল।]

এই সংঘর্ষের মধ্যে যে নূতন শক্তি জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহা দেখিয়া যুগপৎ রাজপুরুষেরা ও দেশের মাথাওয়ালা নেতারা সকলেই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। নেতারা বক্তৃতা পর্য্যন্তই দিয়াছেন, কিন্তু সত্যই যে বাংলার যুবকগণ তাঁহাদের হাতছাড়া হইয়া ক্রমে এক নূতন পথের পথিক হইয়া পড়িতেছে, তাহার ইঙ্গিত পাইয়া তাঁহারা কতকটা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। রাজপুরুষেরাও দেখিলেন, মুসলমানকে লেলাইয়া বা গুরখা পিটুনীর দৌলতে বাঙালীকে ঠাণ্ডা করা যায় নাই, বরং নূতন শক্তির আস্বাদ পাইয়া বাঙালী নূতন ভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। সূক্ষ্মদর্শী রাজশক্তির একথা বুঝিতে বেশী বিলম্ব হয় নাই। যাহাই হউক, সরকার মূলে কুঠারাঘাত করিতে নূতন আইন করিয়া সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন—নানা আইনের নাগপাশে জাতিকে বদ্ধ করিলেন। সভাসমিতিতে বক্তৃতা দেওয়ার ও বাহবা পাওয়ায় কোন সুযোগই

রাখিলেন না। যাহারা 'প্ল্যাট্‌ফরম্‌' কাঁপাইয়া কত বক্তৃতা দিতেন তাঁহারা সরিয়া গেলেন, বক্তৃতামঞ্চগুলি কয়দিনের জন্য জুড়াইল। কিন্তু সব ঠাণ্ডা হইল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গ-ভঙ্গের পূর্ব্বেই বাংলায় কয়েকটা বিপ্লবকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার অনুষ্ঠাতারা সহানুভূতির অভাবে তখন কিছুই ব্যাপক-ভাবে করিতে পারেন নাই। এই সমস্ত সমিতি স্থাপিত হওয়ার পর তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র কিছু বাড়িল।—বলা বাহুল্য, প্রত্যেক সমিতির মধ্যেই অল্প-বিস্তর ইঁহাদের প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল।

'যুগান্তর' প্রভৃতি এক প্রকার প্রকাশ্যেই গুপ্তসমিতির প্রয়োজনীয়তার আভাষ দিয়া চলিয়াছিল। সকল আখড়ার মোড়লরাই সে সমস্ত পড়িত ও পড়াইত। এই ভাবেই নানা কেন্দ্রে, কোথাও সাহিত্যের ভিতর দিয়া, কোথাও প্রচারকের মারফতে বিপ্লবের পথ গড়িয়া উঠিল। সুতরাং সমিতি যখন বন্ধ হইয়া গেল তখনই সব বিপদ শেষ হইল না। সরকারও দেখিলেন বিপদ লোকচক্ষুর অন্তরালে পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নানাভাবের লোকসমাগম

টলষ্টয় তাঁহার Resurrection গ্রন্থে বিপ্লববাদীদের কয়েকটা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এই কয় শ্রেণীর লোকই নানা রকম উদ্দেশ্য লইয়া বিপ্লবানুষ্ঠানে যোগদান করেন। বিশ্লেষণ করিলে বাংলার বিপ্লববাদীদের মধ্যেও তেমন লোক দৃষ্ট হইবে মনে হয়। প্রথম শ্রেণীর লোক কতকটা দার্শনিক ভাবাপন্ন। বলা বাহুল্য, ইঁহারা জীবনটাকে অত্যন্ত উচ্চ আদর্শের দিক হইতে বিচার করিয়া দেখেন—বাস্তব-অবাস্তবের প্রশ্ন-উত্তরের অপেক্ষা তেমন রাখেন না। ইঁহারাই বিপ্লবের ভাবসম্পদের স্রষ্টা। ইঁহারা স্বভাবতই ত্যাগী। জগতের বৈষম্য ইঁহাদিগকে পীড়া দেয়, সেই পীড়িত হৃদয় লইয়াই ইঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কোমলে-কাঠিন্যে ইঁহারা গড়া। বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি·বাক্য ইঁহাদের প্রতি খাটে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক কতকটা উত্তেজনাপূর্ণ কর্ম্মানুষ্ঠান প্রয়াসী। বিপ্লবের মধ্যে যে 'রোমান্স' আছে তাহা তাহাদের কাছে প্রিয়তর। ইহারা স্বভাবত কতকটা নির্ভীক। অবশ্য এই শ্রেণীতেও দেশপ্রীতি যথেষ্ট থাকে।

আর একটি শ্রেণী বা তৃতীয় শ্রেণীও এই বিপ্লবানুষ্ঠানে যোগদান করে। ইহারা সাধারণতই কোন নিয়মের অধীনে থাকিতে চাহে না। 'স্বাধীনতা' বা উচ্ছৃঙ্খলতা তাহাদের প্রকৃতিতে অত্যধিক প্রবল। 'কাহাকেও তোয়াক্কা করি না' ভাবটাই তাহাদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। তোয়াক্কা করিতে চাহে না বটে কিন্তু অপরে তোয়াক্কা করুক, এটা তাহারা চাহে। প্রবৃত্তির অনুরূপ চলিবার অবসর খুব মিলিবে বলিয়াই ইহারা এ দলে যোগদান করে। পরে ইহারাই প্রভুত্ব লইয়া দলাদলি করে, ঝগড়া করে।

আর এক শ্রেণী আছে—চতুর্থ শ্রেণী, ইহারা শুধু স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিপ্লবানুষ্ঠানে যোগদান করে। বিপ্লবের শত্রুও আবার ইহারাই। বিপ্লবদলে কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক যোগ দিয়াছিল, তাহার একটা তালিকা আমাদের ধারণানুযায়ী আমরা এখানে দিলাম। বাংলার বিপ্লববাদীদের মধ্যে এই চারি শ্রেণীর লোকই ছিল। অবশ্য মুখ্য ভাবে বিপ্লব গড়িয়া তুলিয়াছে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ। তবে কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক ইহাতে আসিয়া কেমন করিয়া যোগ দান করে তাহাও ক্রমেই আমরা বুঝিব।

বলিয়াছি বাংলার 'মরা গাঙে বান' ডাকিয়াছিল, তরী আর কেহ ঘাটে স্থির রাখিতে পারে নাই। বাংলার যাহারা প্রাণ তাহারা সাড়া না দিয়া তিষ্ঠিতে পারে নাই। তখনো 'মধ্যপন্থী'-চরমপন্থা' সৃষ্ট হয় নাই। তখন একপন্থী—হয় দেশ না হয় সরকার। যাহারা দেশের নহে, তাহারা সরকারের সহায়।

বক্তৃতার তখন পূর্ণ যৌবন। বক্তৃতা, সঙ্গীত, লেখা অজস্রধারে জাতীয় ভাব পুষ্ট করিতে লাগিল। এমনি তখন দেশের অবস্থা যে তখন 'স্বদেশী' না হওয়াটাই একটা বিড়ম্বনা।

ঠিক এমনি অবস্থা যখন দেশের হয় অর্থাৎ যশঃ প্রার্থনা করিতে হইলেও এই এক পন্থা ভিন্ন আর উপায় নাই, তখন কাঞ্চনের সঙ্গে কাচও আসে। শুধু তাই নহে তখন মেকি আসিয়া খাঁটীকেই তাড়াইতে চাহে। অন্ততঃ মেকি আসিয়াই আসর জমকাইয়া বসে। কারণ মেকি ধরিবার কষ্টিপাথর তখনো ত জন্মায় নাই! কথা পর্য্যন্তই যখন লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে সক্ষম তখন ঐ সমস্ত যশঃ লাভেচ্ছু ব্যক্তিরা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়। এমন কি প্রকৃত কর্ম্মীরা তাহাদের ভিড়ে পিছনে থাকিতে বাধ্য হয়। আন্দোলনের ঠিক সূত্রপাতে ইহারা আসে না—কি জানি যদি ইহাতে মনোবাসনা সিদ্ধ না হয়; কিন্তু যেই দেখে যে এই ত যশঃ লাভের সময় তখন ইহারাই হয় অগ্রদূত।

বিপ্লববাদের কথা বলিতে গিয়া সেই স্বদেশী আন্দোলনের কথা আবার টানিয়া আনিলাম; তাহার কারণ, এখান হইতেও তাহার কতকটা উপকরণ আমাদের সংগ্রহ করিতে হইবে।

স্বদেশী আন্দোলন যখন একেবারে পুরা দমে চলিয়াছে, বাংলার প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ মনীষী ও হৃদয়বানই যখন ইহাতে যোগ দিয়াছেন, অথচ তখনও উদ্যত রাজরোষ পতিত হয় নাই, তখনকার একটা স্বদেশী সভার কথা বলি।—বক্তা প্রশ্ন করিলেন, স্বদেশের জন্য কে

জীবন ও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে! অমনি টেবিলের পাশ হইতে. তিনজন ভদ্রলোক দাঁড়াইলেন—চশমা চোখে, চমৎকার জামা গায়ে মাথায় টেরী—দেশের জন্য ইঁহারা জীবন দিবেন! ছোট সহর—হৈ চৈ পড়িয়া গেল। মা ও স্ত্রী ত কাঁদিয়া আকুল—'স্বদেশের জন্য সন্ন্যাসী হইল!' কিন্তু শেষে আর সর্ব্বস্ব ত্যাগের প্রয়োজন তাঁহাদের হয় নাই। আজও তাঁহারা আছেন। বেশ সুখেই আছেন—কেহ প্রোফেসার. কেহ উকিল, কেহ ব্যবসায়ী—অতীত স্মৃতি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। অথচ মনে পড়ে সরকারের ধর্ষণ নীতি আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, তাঁহারা কথার জোরেই নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। শেষকালে, বিপদ আসিয়াই অনেক সম্পদ আমাদিগকে দেখাইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের যে সময়টার কথা বলিতেছি তখন বক্তৃতা ও বয়কটই প্রধান কার্য্য। সে বয়কটে অনুনয়-বিনয় ছিল, হাতে-পায়ে ধরা ছিল, জোর-জবরদস্তিও ছিল। বয়কট দ্বারাই ইংরেজ সায়েস্তা হইবে, ইহাই ছিল প্রধান ভাব। সেই ভাব আশ্রয় করিয়াই বাংলা চালিত। সুতরাং দ্বেষহিংসা ছিল না বলিতে পারি না।

একদিকে বাঙালীর বিলাতী বর্জ্জনের উগ্র চেষ্টা. অপর দিকে লাট ফুলার প্রভৃতির লাঠির আগায় বিলাতী প্রচলনের প্রয়াস,—এই দুয়ের মধ্যে পড়িয়া 'স্বদেশী' আর টিঁকে না। (একদল লোক 'স্বদেশী'র অর্থ নূতন করিয়াই বুঝিতে চাহিল।—স্বদেশী অপেক্ষা 'স্বদেশী' লাঠিতে আস্থা যেন কিছু বেশী। "জুড়ে দে ঘরের তাঁত সাজা দোকান, বিদেশ না যায় ভাই গোলারি ধান" প্রভৃতি

উক্তি, বাঙালীর প্রাণে তখন আর ভাবের সাড়া তুলিতে পারিল না। কিন্তু 'আয় আজি আয় মরিবি কে' আহ্বানে বাঙালীর প্রাণে উন্মাদনা জাগাইল। মরণের কথায় কি রস আছে কে জানে, কিন্তু সেই মরণের ধ্বংসের রুদ্রতালে তরুণ বাঙালীর হৃদ্‌যন্ত্র নূতন ছন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল ; বাঙালী সেই ভাবাবেগে সৃষ্টিকে একেবারেই বাদ দিয়া চলিল, ধ্বংসকে বরণ করিয়া ধ্বংসের জন্যই শক্তিসংগ্রহে ব্যস্ত হইল।)

সরকার পক্ষ হইতে তখন ধর্ষণনীতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানগণ সরকারের সহায়। নেতাগণ passive resistance প্রভৃতি না বলিয়াছিলেন তাহা নহে—কিন্তু বর্জ্জন দ্বারা বঙ্গবিভাগ রদ হইবে, এ সমস্ত কথা তখন তরুণ বাঙালীকে আর বিশ্বাস করান যাইত না। 'স্বদেশী'র কল্যাণে, বিলাতী বর্জ্জনে ইংরেজ কাহিল হইয়া নেতাদের প্রার্থিত বস্তু দিতে বাধ্য হইবেন—সেই আশা শেষ হইল। সেই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করিয়া যে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল, স্বভাবত তাহার যবনিকা পাত হইল। শুধু কি তাহাই ? ক্রমে এই ধর্ষণের প্রতিষেধ প্রয়াসে একদল বাঙালী 'স্বদেশী'কে অবান্তর বিষয়ই করিয়া বসিল। তখন অন্য পন্থার সন্ধানেই তরুণ বাঙালী ব্যস্ত। সেই শ্রেণীর বাঙালী বঙ্গভঙ্গ রদ করাটাই আর বড় করিয়া দেখিল না। একেবারে বলিয়া বসিল 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়।' তখন ভাবের মুখে কেহ বা ভাবিয়াছে, এত সত্বর স্বাধীনতা মিলে না—দুর্ব্বল জাতি এত হঠাৎ সবল হয় না। যে

ব্যাপারে জনসাধারণের চেতনা নাই তাহা আকাশ হইতে কি জাতির কাছে আসে? তবু অসাধ্য সাধনের প্রয়াসই চলিবে—বিধাতার তাহাই ছিল ইচ্ছা। বিধাতা কোন্ চেতনাকে কেমন করিয়া সফল করেন কে জানে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিপ্লবের এক অঙ্ক শেষ হইল

১৯০৮ সালের ডিসেম্বরে যে আইন পাশ হয়, সে আইনের জোরেই ১৯০৯ সালের জানুয়ারীতে পূর্ব্ববঙ্গের কতকগুলি সমিতি বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ১৯০৮ সালের নভেম্বরে অশ্বিনী বাবু, কৃষ্ণকুমার বাবু, মনোরঞ্জন বা[illegible] [illegible]পালন [illegible]বোধ বা[illegible] প্রভৃতি নির্ব্বাসিত হন। বলা বাহুল্য, ইঁহাদের মধ্যে সকলেই বিপ্লববাদী ছিলেন না। যাহাই হউক এতদিন পর্য্যন্ত অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হইতে ১৯০৯ পর্য্যন্ত—সমিতিগুলি দাঁড়ানই ছিল। বিপ্লববাদীদের নানা কার্য্যকলাপ তখনই দেশে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে—তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া সাধারণ দেশবাসী এবং এই সমস্ত সমিতির সাধারণ সভ্যরা সহজেই বুঝিল, 'দেশে একটা কিছু হইতেছে।'

চারিদিকে যখন লাঠিখেলা, কুস্তি-ডন, স্বেচ্ছাসেবকের ড্রিল, কৃত্রিম যুদ্ধ চলিতে লাগিল এমনি সময়ে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এলেনের উপর গোয়ালন্দে পিস্তল ছুটে। এই ঘটনা ঘটে ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে। তাহার পর বোমাও দু' এক জায়গায় ফাটে। প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করিয়া ধরা দিবার দায় হইতে নিষ্কৃতি

পাইল, ক্ষুদিরাম হত্যাপরাধে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিল—ক্ষুদিরাম বালক, প্রফুল্লের বয়সও বেশী নহে।

যুগান্তর খোলাখুলিই লিখিত। কলিকাতার বোমার আড্ডায় পুলিস হানা দিল—বাছা বাছা কেহই বাঁচিল না—একে একে বোমার ও বিপ্লবের অগ্রদূতেরা (pioneer) প্রায়ই ধরা পড়িলেন। বিপ্লবনেতারা দেশবাসীকে গুপ্তসমিতির অস্তিত্বের কথা জানাইতে স্বীকার করিলেন! দেশবাসী ভাল মন্দ দুইই ভাবিল। যে সমস্ত বিপ্লববাদী তখনও বিভিন্ন স্থলে বাহিরে ছিলেন, তাঁহারা অনেকেই এই স্বীকার উক্তিকে ভাল চক্ষে দেখিলেন না। যাহাই হউক, মানুষগুলি যে জীবনটাকে কিছুই মনে করে না, কাঁচা মাথা দিতে যে একেবারেই গররাজী নহে—একথা দেশ বুঝিল। তাহার পর 'এপ্রুভার' নরেন গোসাই যখন ইংরেজেরই জেলের মধ্যে কানাই ও সত্যেন্দ্রের পিস্তলের গুলিতে ধরাশায়ী হয়, তখন দেশ ভাবিল, এরা দুর্জ্জয় সাহসীই শুধু নহে, এরা অদ্ভুত কৌশলী-ও। দুর্জ্ঞেয় রহস্যভেদের জন্য কত যে অদ্ভুত কাহিনী কল্পিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ফাঁসির হুকুমের পর কানাই ওজনে বৃদ্ধি পাইল। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তত্ত্বকথা বুঝা বা বুঝানো সহজ কথা নহে। কে জানে কিসে ধর্ম্মরক্ষা হয় আর কিসে ধর্ম্ম যায়। পাপ পুণ্য, হিংসা অহিংসা সকলেরই বিচারকর্ত্তা যিনি তাঁহার দৃষ্টিই অভ্রান্ত। যাহাই হউক, হত্যাকারী হইলেও কানাইকে দেশবাসী অধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য করে নাই—নিশ্চিত। ফাঁসির দড়ি যে গলায় দেয়, সেই সাহেব বলিল—এমন লোক দেখি নাই! কানায়ের মৃতদেহ

লইয়া শোভাযাত্রা হইল, কানায়ের ভস্ম পবিত্র বলিয়া অনেকে গৃহে স্থান দিল। সেই মৃত্যুবাসরে, বাঙালী কলিকাতার রাস্তায় কাব্যবিশারদের গানের পদটি পরিবর্ত্তন করিয়া গাহিল:—

আমায় ফাঁসি দিয়ে কি মা ভুলাবি
আমি কি মার সেই ছেলে?

এ সমস্ত মরণের কথায় এমন একটা উন্মাদনা তখন সৃষ্টি করিল যে, অনেক তরুণ যুবক জীবনকে তেমন মরণের জন্যই তৈরী করিতে পারিলে যেন কৃতার্থ হয়। জীবন যুদ্ধের আর কোথাও ইহারা জয়ী হইতে চাহিল না, একেবারে মরণ-যুদ্ধে জয়ী হইতে বদ্ধপরিকর হইল। ফলে তাহারা কতকটা সৃষ্টিছাড়া ও সংসারে অপটুই রহিয়া গেল। নেতারা কিন্তু এইসব সংসারে অনভিজ্ঞদের মধ্যেই 'ত্যাগের বস্তু' অধিক লক্ষ্য করিতেন। মরণের বীজ শুদ্ধ, শান্ত, সংসারানভিজ্ঞদের কানেই দিতেন আগে। রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথায় বলিতে চাহিলে, নেতারা বলিতেন, 'এ শুদ্ধ আধার।' লোভ নাই, নাম যশের খেয়াল নাই, সংসারের ভাল-মন্দ তেমন বুঝে না—কিন্তু মরণের জন্য নেতার ইঙ্গিতের অপেক্ষায় একপায়ে খাড়া। যেখানে মরিতেই হইবে, বাঁচিবার কোন উপায় নাই সেখানে এমন সব আধারই প্রেরিত হইত। কানায়ের মৃতদেহের শোভাযাত্রার পর সরকার সত্যেনের বেলায় সাবধান হইলেন। যাহাই হউক, এ সমস্ত মরণ ও মারণের ভঙ্গীতে এবং দুঃসাহসী ও সুশৃঙ্খল (organised) কয়টা রাজনৈতিক ডাকাতিতে যে একটা অভিনব ভাব-তরঙ্গ বাংলার বুকে বহিয়া

গেল তাহার 'রোমান্স' ও ভাবাবেগে স্বদেশভক্তদের যুগ যুগান্তর-নিরুদ্ধ ক্ষাত্রশক্তি যেন 'উঁকি' মারিয়া উঠিল। কেহ নেতাদের কাছে যুক্তি শুনিয়া কেহ বা স্বভাবেরই ঝোঁকে ঐ বৃত্তিটি অনুশীলনের সামান্য একটু বিকৃত অবসর পাইয়াই যেন মাতিয়া উঠিল। বলা বাহুল্য, নেতাদের ইচ্ছানুযায়ী খুব চমৎকার আধার সকলে না হইলেও এই মরণ-মারণের ভীষণ পথে লোক জুটিল। এই মরণপাগল মানুষগুলির কথা বলাও শক্ত, বুঝানও শক্ত!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গুপ্ত ধারা

গুপ্তব্যাপারে কল্পনার স্থান অনেকখানিই থাকে—ফলে যাহারা ভিতরের খবর রাখে না তাহারা বাহিরে থাকিয়া ইতিমধ্যেই গুপ্ত-সমিতিওয়ালাদের অসম্ভব শক্তির কথা, অসম্ভব সফলতার কথা প্রচার করিতে লাগিল।

আমাদের দেশ আধ্যাত্মিক দেশ; ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এক দৈব উপায়ে সুসিদ্ধ হইবে, দেশের কোন কোন উর্ব্বর মস্তিষ্কে ইহা লইয়া দস্তুর মত জল্পনা-কল্পনাও চলিত। স্বকর্ণে শুনিয়াছি, কেহ কেহ বলিয়াছেন, (অবশ্য ইঁহারা বিপ্লববাদী নহেন, কিন্তু গল্প করিতে বিপ্লববাদীর দাদা) সিপাহী বিদ্রোহের কুমারসিংহ তপস্যা করিতেছেন, দেবীর বর পাইলে তিনি আবার দেশোদ্ধারে বহির্গত হইবেন; তিনি সন্ন্যাসীবেশে এখনো দেশের জন্য মহাসাধনা করিতেছেন—অমানুষিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। বিপ্লববাদীরা সাধারণত একথা অবশ্যই বিশ্বাস করিত না। তবে দেশের লোক যে দৈব ব্যাপারে অনেকটা শ্রদ্ধাবান, একথা তাহারা জানিত; সুতরাং প্রয়োজনমত সন্ন্যাসীর ভোল তাহারাও সময় সময় গ্রহণ করিতে কসুর করে নাই।

যাহা হউক ১৯০৬ হইতে ১৯০৯ পর্য্যন্ত কতকগুলি খুন ও ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। এ সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ইহাতে অসম্ভব রং চড়াইয়া, সদ্য সদ্য স্বাধীনতালাভের জল্পনা-কল্পনা যুবক মহলে চলিত। ইতিমধ্যেই মজফরপুরের হত্যাকাণ্ডের পর আলিপুর বোমার মামলারও এক অধ্যায় অভিনীত হইয়া গেল। সুতরাং তাহা লইয়াও দেশে একটা আন্দোলন চলিতে বাধা থাকিল না। অনেকে এমনও ভাবিল, খুব সামান্য পিস্তল বন্দুকই ধরা পড়িয়াছে—রহিয়াছে অনেক।

এমনি যখন দেশের মনের অবস্থা, তখন সমিতিগুলি বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। কিন্তু যাহারা ভুল করিয়াই হউক বা প্রকৃতির প্রভাবেই হউক, ঐ সমিতির মধ্য দিয়াই দেশে কাজ করিবে ভাবিয়াছিল, তাহারা এই আইনকেই চরম বলিয়া মানিয়া নিল না। বাহিরে ইহার সঙ্গে দ্বন্দ্বে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া সমস্তখানি কর্ম্মই গুপ্তভাবে করিতে মনস্থ করিল।

আন্দোলনের ইহা নূতন ধারা। আগে প্রকাশ্য সমিতির অন্তরালে গুপ্ত কর্ম্মপন্থা চলিত—এখন সবখানিই গুপ্ত। এখন যাঁহারা কর্ম্মী ও প্রধান হইয়া রহিলেন—তাঁহাদের নিজের আত্মপ্রসাদ ভিন্ন কিছুই সান্ত্বনার রহিল না। স্বদেশী আন্দোলনের গোড়াকার সে সহানুভূতি, প্রশংসা নাই—(অন্তত প্রকাশ্যে ছিল না)—কাহারও ভাল বলার নাই, একেবারে 'একলা চল্‌রে।' যাঁহাদের কথায় কর্ম্মীরা কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন, তাঁহারা আর কথা কহেন না। এমনি ভাবে বিপ্লববাদীরা একলাই হইয়া পড়িল।

কেহ কেহ দুই দিন সখ করিয়া বিপ্লবদলের খবর লইতে ইচ্ছা করিতেন। তখন ভাবিয়াছিলেন, তেমন কিছু ভয় নাই। কিন্তু পরে বিপদ দেখিয়া তাঁহারাও অচেনা হইলেন। বিপ্লববাদীরা লোকচক্ষুর অন্তরালেই স্থান বাছিয়া লইল।

বিপ্লববাদীদের সেই আত্মগোপনে, সকল রাজনৈতিক কর্ম্ম-প্রচেষ্টা হইতে দূরে থাকার ফলে, বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে অনেক দিকেই আর যোগ্য লোকের আবির্ভাব সম্ভব হয় নাই। ইহার কারণ আছে।

কারণ, সাহিত্যক্ষেত্রেই হউক বা রাজনীতিক্ষেত্রেই হউক কোন একটা উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত না হইলে, একটা বৃহতের আকাঙ্ক্ষা ভিতরে না জাগিলে, কোন দিকেই বড়লোক জন্মায় না, সাহিত্যে বা রাজনীতিতে কোনও নূতন বাণী শুনা যায় না। বাংলা দেশে যখন সিভিলিয়ানদের বাংলাশিক্ষার যোগ্য করিয়া, সেই সীমাবদ্ধ আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া, গোড়ায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্য বাংলা পুস্তক প্রণীত হইতেছিল তখন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে না ছিল কোন নূতন বাণী, না ছিল কোন সত্য সৃষ্টি। রাজনীতিক্ষেত্রেও তেমনি যখন গতানুগতিক পদ্ধতিতে বড় বড় চাকুরী লাভের সুবিধাগুলি ভারত-বাসীর করায়ত্ব করিবার উদ্দেশ্যেই কংগ্রেস বছরের পর বছর রাজ-নৈতিক চর্চ্চা করিয়া যাইতেন, তখন তাহাতেও না ছিল কোন প্রতিভার বিকাশ, না ছিল কোন নূতন বাণী।

যাহাই হউক, তবু বাংলায় যাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলন করিতেন তাঁহারা একভাবে গড়িয়া উঠিয়াছেন; পরাধীন দেশে

তাঁহারা রাজনীতিক বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিলেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। তাঁহারা যতটুকু হইয়াছেন, ততটুকুই। আর কোন নূতন শক্তি বা নূতন ভাব এ ক্ষেত্রে কাজ করে নাই। এমন কি অন্য প্রদেশে তবু কতকটা তেজস্বী, যোগ্য লোকের আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে যোগ্য তেজস্বী লোকের একান্ত অভাব।

ইহার একটি প্রধান কারণ বাংলার বিপ্লবপ্রচেষ্টা। এ কথায় একটুও ভুল নাই, গুরুকে সোজা রাখে খাঁটি শিষ্য; নেতাকে নেতার যোগ্য করিয়া তোলে খাঁটা কর্ম্মী। নেতা যাহাদের উপর নেতৃত্ব করিবেন, তাহারা যদি খাপখোলা তরোয়ালের মত ধারালো ও আগুনের মত উজ্জ্বল হয়, তাহারা যদি তেজস্বী, ত্যাগী, সত্যকার কর্ম্মী ও উচ্চ ভাবাপন্ন বুদ্ধিমান হয়, তবে হয় নেতা দিন দিন যোগ্যতর হইয়া উঠিবেন নতুবা নেতৃত্বের আসন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবেন। / বাংলার যে সমস্ত যুবক রাজনীতিক মুক্তি চাহিত, যাহারা ত্যাগী, যাহারা কার্য্যত জীবনপণ করিয়া কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিতে চাহিত— তাহারা অধিকাংশই তখন এই বিপ্লবদলে যোগ দিয়াছিল। বাংলার যুবজন হয় এই বিপ্লবে যোগ দিয়াছিল, নতুবা রাজনীতি ছাড়িয়া অন্য দিকে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, বা কিছুই করে নাই। সুতরাং বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে নেতাদের যোগ্যতর হইবার প্রবল তাগিদ যেমন ছিল না, তেমনি এদিকে নূতন যোগ্য লোকের আবির্ভাবও হয় নাই। •বাংলার বিপ্লবপ্রচেষ্টা বাদ দিলে, বাংলার

রাজনীতিক্ষেত্রে এই জন্য তেমন তেজস্বী রাজনীতিবিদের সন্ধান মিলে না। কেবল 'খাড়া বড়ি থোড়, থোড় বড়ি খাড়া' অনুবৃত্তি করিয়া প্রথম আমলের দুই চার জনের নাম করা যায় মাত্র।

অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভাব আর এক নূতন অধ্যায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সমিতির দুর্দ্দিন

সমিতিগুলিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করার পূর্ব্বেই বিপ্লব-বাদীরা লোক সংগ্রহে মন দিয়াছিল। ইতিমধ্যেই অনেক বালক ও যুবক ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে, তাহারা সমর্পিত-প্রাণ। তাহাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমিতির জন্যই বিলাইয়া দিয়াছে। সমিতি বে-আইনী ঘোষণা হওয়ায় ইহারা কোথায় যায়? আড্ডা সবই উঠিয়া গিয়াছে; অন্নসংস্থানেরও কোন উপায় নাই! এতকাল ইহারা সমিতির কাজ করিয়াছে, খাওয়া-দাওয়া থাকা সমিতিতেই হইত। গড়া জিনিষ হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল, কর্ম্মীরা নিরুপায়। নেতাদের কেহ জেলে, কেহ নির্ব্বাসনে। সমিতির বড় বড় সভ্য, মুরুব্বি, সহায় যাঁহারা তাঁহারা অনেকেই অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া সরিয়া পড়িলেন। পরিচিত অনেকেই ভরসা করিয়া সংস্রব রাখে না। 'পদস্থ' ব্যক্তিদের দ্বারও বন্ধ হইল। একেবারে যাহারা অন্তরঙ্গ, যাহারা সব ছাড়িয়া আসিয়াছিল তাহারাই এ দুর্দ্দিনেও পরস্পর যুক্ত হইয়াই রহিল। অপর যাহারা অর্থাৎ যাহারা তেমন অন্তরঙ্গ নহে কিন্তু দলেই আছে, তাহারা মূল দল হইতে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হইল।

বিভিন্ন দলের যাঁহারা নেতা, অথচ ধরা পড়েন নাই, তাঁহারা নিজ বাটীতেই কোন প্রকারে আড্ডাগুলি রাখিলেন, অর্থাৎ পুরাতন বন্ধুগর্ণ সেইখানে যাওয়া-আসা করিত। কিন্তু যে সমস্ত দলে ঘরছাড়া লোকের সংখ্যা অধিক, তাহাদের হইল বিপদ। একটা স্থান ত চাই। পুলিশের ১০৯ ধারা হইতে রক্ষাও ত পাইতে হইবে। বাড়ী ফিরিতেও কেহ চাহে না, বাড়ী গেলেই আবদ্ধ হইতে হইবে। অনেকের বাড়ী ফেরাও সহজ ছিল না। সাজানো ঘরগুলি ত ভাঙ্গিয়াছেই, এখন সামান্য কাঠ খড়গুলিই ইহারা কতকটা ভবিষ্যতের আশার কৃপণের ধনের মতই বুকে করিয়া রহিল। এই ভাঙ্গা অবস্থার একটা দিক আমরা দেখাইতেছি।

কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, রংপুর প্রভৃতি স্থানের সমিতিগুলি বে-আইনা বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এক ঢাকা সমিতিতেই প্রায় ছয় শত শাখা সমিতি ছিল। সবই আজ উঠিয়া গিয়াছে।

এমনি ভাঙ্গা অবস্থায়, কলিকাতার একটি বাটিতে কয়েকটি যুবক থাকে। হাতে কিন্তু তাহাদের টাকা নাই। এই সমস্ত যুবকদের মধ্যে আবার ফেরারীও দুই চার জন আছে। কলেজের ছাত্রেরা বাড়ী হইতে নির্দ্দিষ্ট টাকা আনিয়া পড়ে। তাহাদের কাছ হইতে কিছু কিছু পায়। কতই বা আর হইবে, জল খাবার পয়সা বাঁচাইয়া ছাত্রেরা কিছু কিছু দেয়। আরো বাহিরের দুই একজন হয়ত সময় সময় সামান্য কিছু কিছু দেয়। এমনি ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। এক আধটা জামা হয়ত আছে, তাহাই প্রয়োজন হইলে সকলেই

ব্যবহার করে। পোষাক পরিচ্ছদের জন্য কোনও কষ্টই কাহারো হয় নাই, সেদিকের অভাব কেহ অনুভব করে নাই। কিন্তু অন্নাভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। একদিনের কথা, সেদিন হিসাবে দেখা গেল, মূলধন যাহা আছে তাহা ভাগ করিলে মাথা প্রতি দুই পয়সা মাত্র পড়ে। সাব্যস্ত হইল, 'আলু লইয়া আইস।'—শুধু আলু সিদ্ধ করিয়াই সেদিন খাওয়া হইল, ভাত আর জুটিল না। এমনি কষ্টের খাওয়া এক আধ দিন নহে, মাসের পর মাস চলিল।—ঐ সময়টায়ই অনেকে নানা প্রকার যোগ-ধ্যান আরম্ভ করেন। যোগের নানা নিয়ম অনুষ্ঠান প্রবলভাবে চলিতে লাগিল। পার্থিব জগতের অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক অবস্থা বেশ আশাপ্রদ!

এ অবস্থায়ও দল একটু একটু করিয়া বাড়িতে লাগিল! যাহারা নেশা পান করিয়াছিল, নেশাখোর খুঁজিয়া সহজেই বাহির করিল। অবশ্য যাহাদের নেশা স্বল্পকালস্থায়ী তাহারা নেশা ফুরাইয়া যাওয়ায় সুবোধ বালকের মত বাড়ীতে গিয়া 'যাহা পায় তাহাই খাইতে' লাগিল। সকলেই বোকা নহে, একটু ধাক্কা খাইয়া শিখিবার মত সেয়ানা লোক সংসারে আছে। তেমন সেয়ানারা সময় থাকিতেই সরিয়া পড়িল। বিপদের এ ত শুধু সূত্রপাত—একথা যাহারা সেয়ানা তাহারা ভাল করিয়াই বুঝিল।

কলিকাতার বোমার মামলায় অনেকের শাস্তি হইল। যাহারা ধরা পড়ে নাই—সংখ্যায় তাহারা খুবই কম—তাহাদেরও তেমনি দুঃখ-কষ্ট। এদিকে সেদিকে তাহারাও নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে

লাগিল…Terrorism আরম্ভ হইল। নন্দলাল, আশুতোষ, সামশুল প্রভৃতি পিস্তলের গুলিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। পুলিশ কলিকাতায় বোমার মামলা ও হাওড়া Gang case করিয়া পূর্ব্ব বাংলায় মনোনিবেশ করিল। সামশুল-আলমের হত্যার পর ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতার দিকের দলের আর বিশেষ কোন প্রচেষ্টা চলে নাই।

নবম পরিচ্ছেদ

মামলা

১৯১০ সালের প্রথম ভাগে পুলিন বাবু প্রভৃতি নির্ব্বাসন (Deportation) হইতে ফিরিয়া আসিলেন। পূর্ব্ব বাংলায় ইতিমধ্যেই আবার সমিতি (গুপ্তভাবে) কতকটা সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। খোঁজখবর রাখার বন্দোবস্ত হইয়াছে। জিনিষপত্র, বন্দুক, পিস্তল, টোটা ইত্যাদি যথাস্থানে রক্ষার সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। হঠাৎ যাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল ধীরে ধীরে তাহা জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল। সরকারও নূতন পন্থা অনুসরণ করিলেন।

পুলিশ যে এক বিরাট ষড়যন্ত্র মামলা বাধাইতে প্রবল ভাবে চেষ্টা করিতেছে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। 'অনুশীলনের' কাহাকেও আর বাদ দিবে না—ইহাই জানা গেল। পুলিন বাবুকে গা-ঢাকা দিতে অনেকেই বলিল, কিন্তু তিনি অস্বীকার করিলেন ; বলিলেন—ছেলেরা নিরুৎসাহ হইবে।

যাহা হউক, সমিতির কেন্দ্র স্থানান্তরিত হইল। মনে রাখিতে হইবে এখন হইতে সবখানিই গুপ্ত। যাহাকে পুলিশ সন্দেহ করে তাহার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলেই সন্দেহের পাত্র হয়। ফলে

বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন কেহই আর বন্ধুর, আত্মীয়ের সঙ্গ চাহেন না। রাস্তায় দেখা হইলে, আড়চোখে চাহেন। দেশের সাধারণ অবস্থা এই প্রকার।

আমরা তখন কলিকাতার মেসে থাকিয়া পড়ি। যাহারা পরবর্ত্তীকালে বিপ্লববাদী বলিয়া সর্ব্বজন গণ্য, তাঁহারা সে স্থানে পদার্পণ অবশ্যই করিতেন। তাঁহাদের অনেকের স্বভাবে অনেক দেখিবার ও শিখিবার জিনিষ ছিল। যথাস্থানে দুই একটি চরিত্র আমরা দেখাইব। সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলা চলে—বিপ্লববাদীদের ভিতরে ধর্ম্মভাব অর্থাৎ একটু ধ্যান-ধারণা বর্ত্তমান থাকিত। সাদাসিধা ভাব, আহারে-বিহারে সংযম তাঁহাদের মধ্যে খুবই দেখিয়াছি। মেসে যাঁহারা আসিতেন (বিপ্লববাদী) তাঁহাদের অনেকের ভিতরেই এই রকম একটা সাত্ত্বিকভাব দেখিয়াছি।

* * *

—দুইটা বাজিতেই মনটা কেমন হইল। চারিদিকে অনেকেই ধরা পড়িয়াছেন। ক্লাস হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। খবরের কাগজখানা হাতে লইয়া বাসায় ঢুকিতে যাইতেই দুইজন ভদ্রলোক নাম জিজ্ঞাসা করিলেন—হাতও ধরিয়া ফেলিলেন! সঙ্গে সঙ্গে এদিক সেদিক হইতে লালপাগড়ি আসিয়া জুটিল, গাড়ীতে উঠাইল। পরে সাহেবমুখে জ্ঞাত হইলাম ঢাকাই-পরোয়ানা বলে ধৃত হইয়াছি, 'ঢাকাই মাল' ঢাকায়ই যাইব। কলিকাতার পুলিশ বেশী সম্মান (অর্থাৎ military guard) দেখাইল না, একজন ব্রাহ্মণ চোরের সঙ্গে বাঁধিয়া লালবাজারের দিকে রওনা করিল!

সঙ্গে দুই চার জন পুলিশ। রাস্তায় একটি স্ত্রীলোক আমাদের দেখিয়া বলিল,—'বাঃ রে, ভদ্রলোকের কোমরে দড়ি!' মনে মনে ভাবিলাম, তবু গলায় দড়ি নয়। আমিই একা সেদিন ঢাকার ষড়যন্ত্রের মামলার জন্য লালবাজারে অপেক্ষা করিয়া আছি। নরক গুলজার করিয়া কতকগুলি চোর, মাতাল সেখানে হল্লা সুরু করিয়া দিয়াছে। সেখানেই এক পাশে বসিলাম—বুড়া মায়ের কথা মনে হইল! আমার সেই সঙ্গী ব্রাহ্মণ চোরটা (সে ইতিমধ্যেই কয়েক বার ব্রাহ্মণ বলিয়া আমার কাছে ও অপরের কাছে তাহার ন্যায্য দাবী জানাইয়াছে) আমার সঙ্গেই আছে। কলির এই কৃষ্ণের জীবটী পাঁচ ছয় বার এ বড়-বিদ্যার অনুশীলনে ধৃত হইয়াছে! —সুতরাং সে চোর।

এই সদ্ব্রাহ্মণটি গা ঘেঁসিয়া আলাপ আরম্ভ করিল।

—ভাই একটা সিগারেট দাও না।

আমি বিনীতভাবে বলিলাম—সিগারেট আমি খাই না।

—একটা বিড়ি।

—বিড়িও খাই না।

বেচারা কিন্তু বিশ্বাস করে নাই।

একটু পরে বলিল, ম্যাচিস্‌টা দাও না ভাই।

বলিলাম—আমার কাছে নাই।—বন্ধু এবার একেবারে হতাশ হইলেন।

ঘরের নানাদিকে নানা দল। মাতালেরা একটু হুসিয়ার হইয়াই নিজের বংশমর্য্যাদা জ্ঞাপন করিতেছে। সমাজের এতগুলি

'ধুরন্ধর' কখনো একত্র দেখি নাই—মনে একটা অসোয়াস্তির ভাব আসিল। একটু পরে—রাত্রি তখন প্রায় দুইটা হইবে সেই ব্রাহ্মণ চোরটী আমাকে বলিল, তোমার ঐ কাগজটা দাও ত ভাই।—মনে নাই, সঙ্গে আমার কি একখানা সংবাদপত্র ছিল।

প্রশ্ন করিলাম—কি ক'রবে?

—সিগারেট ধরাব।

বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—সিগারেট ধরাবে?

বুঝাইয়া বলায় বুঝিলাম,—উপরে যে গ্যাস-বাতি জ্বলিতেছে সেখান হইতে কাগজ মারফতে আগুন সংগ্রহ করা হইবে। কাগজের অংশ গ্রহণ করিয়া বারে বারে ব্যর্থ হইয়াও ব্রাহ্মণ অধ্যবসায়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। কাগজের অংশ পাকাইয়া লাঠি-গোছ করিয়া আগুন সংগৃহীত হইল। ভায়ারা কেহ থাকিলে গান চলিত,—'ও তোর বারে বারে জ্বাল্‌তে হবে, হয়ত বাতি জ্বল্‌বে না।' ব্রাহ্মণ তনয়ের মুখে আজ অগ্নি নাই—কিন্তু প্রাণে অধ্যবসায় আছে। সিগারেট ত ধরান হইল।—আর যায় কোথায়, -একটা ছোকরা, ব্রাহ্মণে টিপিয়া ধরিয়া মারে আর কি! 'শালা চোর, 'আমার পকেটমেরে বিঁড়ি নিয়েছে',—হৈ, চৈ, হল্লা। —এমনই সময় আবার এক বুড়া, চোখে দেখে না, চাৎকার করিয়া উঠিল 'আমি হাগবো।' হাগব বলিয়াই বসিতে উদ্যত। আবার চারিদিক হইতে গালাগালি। কেউ বলিল, 'ডানে যা' কেউ বলিল 'বাঁয়ে যা' আর সবাই হাসিতে লাগিল! আমার পাশে একটা ছোকরা বসিয়াছিল, বলিলাম, 'ওকে ধ'রে ঐদিকে

বসিয়ে দাও।’—বেচারী কথাটা শুনিল। রাতটা প্রভাত হইলে যে বাঁচি! বিচারের পূর্ব্বে হাজতের এ অপূর্ব্ব ব্যবস্থা দেখিয়া, শাস্তিলাভের পূর্ব্বে দোষী নির্দ্দোষীর অদ্ভুত শাস্তির নমুনা দেখিয়া মনে হইল, বিচারের অভিনয় করিতে গিয়া মানুষকে বুঝি বা ভগবানের বিচারশালায় হাজির হইতে হয়। যাহাই হউক শেষ রাত্রিতে ‘ঠাকুর’ ভাত ডাল দিয়া গেল—আমি লইলাম না। যে-ভঙ্গীতে আসিয়া প্রভু প্রসাদ গ্রহণ করিতে বলিলেন, তাহাতে হঠাৎ মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল, ‘খাব না।’—দ্বিতীয় বাক্য-ব্যয়ের প্রয়োজন হইল না।

*   *   *

ভোর হইতেই আর সকলকে লইয়া গেল, রহিলাম একা আমি। বড়ই ভাল লাগিল। শুইয়া পড়িলাম। একটু পরেই উঠিয়া দেখি সম্মুখের কামরায় আরও দুইজন ভদ্রলোক। ‘দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে’, চেহারায় বুঝিলাম—স্বদেশী! আলাপ হইল। ‘প্যামফ্লেটিং’এ ধৃত হইয়াছেন। ওঁরা জেলেই থাকেন। এখানে কি যেন প্রয়োজনে আনিয়াছে। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘হাঁ দাদা, জেলে থাকার জায়গা কেমন—এখানকার মত নয়ত?’—ওঁরা বলিলেন,—‘না, এক একটা ‘সেল’।’ এ সংবাদে হাতে যেন স্বর্গ পাইলাম! ভাবিলাম—শুইয়াও ত দিন কাটাইতে পারিব, না হয় আপন মনে গান গাহিব। বৈকালে মুড়ি দিয়া গেল, খুব খাইলাম। আজই ঢাকা জেলে যাইব—মন কতকটা প্রফুল্ল হইল।

বাক্স, পুস্তকও আমার সঙ্গে চলিল। ট্রেনে একটী বন্ধু রাস্তায় খাওয়ার জন্য পুলিসের হাতে টাকা দিয়া গেলেন। আর একজন সাধারণ লোক, বাবু-টাবু নহেন, 'স্বদেশী' শুনিয়া পুলিশ কর্ম্মচারীর দিকে বারে বারে দৃষ্টিপাত করিয়া খাবারের ঠোঙ্গা আনিয়া আমায় বলিলেন, কিছু খান।—খাইতে পারিলাম না, ধন্যবাদ দিলাম। খাইলাম না বটে, কিন্তু পুলকিত হইলাম। রাজনীতিক শিক্ষা নাই কিন্তু দেশবাসীর প্রাণ আছে। বুঝিয়া আঘাত করিতে পারিলে প্রাণের তার সুরে বাজে। বিপ্লববাদীরা কোথাও বড় সহানুভূতি পায় নাই; অথচ দেশবাসীর সহানুভূতিই মানুষকে উৎসাহিত করে, শক্ত করে। সাধারণ একজন লোকের এই সহানুভূতিতে সত্যই সেই দিন সেই সময় পুলকিত হইয়াছিলাম. পুলিশের অনুমতি লইয়া খাইতে প্রবৃত্তি হইল না—বেচারা কোন্ বিপদে পড়িবে তারই বা নিশ্চয়তা কি! কিন্তু এমন শ্রদ্ধার দান উপভোগ করায়ও অন্তর পরিশুদ্ধ হয়।

ষ্টীমারে পরিচিত লোক দেখিলাম। কথা কহে না! মনে হইল, 'যদি কেউ না কথা কয়, ওরে ও অভাগা।' আমাদের তেমন অবস্থায় দেখিয়া আত্মীয়-স্বজন, বিপ্লববাদী, বিপ্লববাদীর পরিচিতের পরিচিত, অথবা বুদ্ধিমান কেহ কাছে আসিত না—সরিয়া সরিয়া যাইত, পাছে পুলিশ নাম টুকিয়া লয়! কিন্তু কাছে আসিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইত, কথা জিজ্ঞাসা করিত হাবা-গঙ্গারাম দুই চার জন, আর বিপ্লবের নামগন্ধ জানে না যাহারা, তাহারা।

ঢাকায় একটা কি দেড়টায় গেলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠিতে যাওয়ার হুকুম হইল—গেলাম। চারিদিকে সঙ্গীন চড়াইয়া প্রহরীরা 'অভ্যর্থনা' করিল। সাহেব ঘুমাইয়াছেন, সুতরাং আমরা অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। সেখানে আরও একটী ভদ্রলোক অপেক্ষা করিতেছিলেন—একই গোয়ালে যাইব। দুইটা বাজে—তিনটাও বাজিয়া গেল দারোগার হাতে টাকাটা রহিয়া যায় দেখিয়া, কনষ্টেবলগুলি কতকটা সেই দুঃখেই যেন বলিল "আপনি খান না, খাবার খান।' খাবারের নামে আমার মাথা গরম হওয়ার যোগাড়। অগত্যা পশ্চিম দেশীয় দোস্তদের কথায় খাবার আসিল—ঢাকাই অমৃতি! একটু খাইয়া ফেলিয়া দিতে বাধ্য হইলাম। সহানুভূতিতে গুর্খা সিপাই পর্য্যন্ত ধমকাইল, 'বোকা বাবু, জেলে এ সমস্ত খাবার কোথায় পাবে ?'—যাক্, সাতটা বাজিলে সাহেবের সুখনিদ্রা ভাঙ্গিল! ডাক হইল, হাজির হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওয়া হইয়াছে ?—আমি উত্তরে 'না' বলার আগেই, দারোগাপুঙ্গব বলিলেন, 'হাঁ, আমি খাওয়াইয়াছি।' সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাত খাইয়াছে ?' খাই নাই, শুনিয়া জেলে লিখিয়া দিলেন—'ভাত দিবে।' ম্যাজিষ্ট্রেট এক-আধটু রসিকতাও করিলেন।

ঢাকা জেলে রওনা হইলাম, ক্রমেই পদবী বাড়িতে লাগিল! আটজন সিপাহী সঙ্গীন তুলিয়া লইয়া চলিল। হাঁটিয়া চলিলাম। —হুকুম হইল, হল্ট্। থামিলাম। জেলের ফটক ফাঁক হইল—ঢুকিলাম। স্বয়ং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিলেন। পায়ের জুতা, পরিধানের কাপড় খুলিয়া নিজ হস্তে দেখিলেন।

"অরণ্য আড়ালে রহি' কোনো মতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হ'তে,
বাহুটী বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে, ভূতলে।"

আমরাও তেমনি দরজার আড়ালে কোনও মতে থাকিয়া সাহেবের হস্তে পরিধেয় বস্ত্র ফেলিয়া দিলাম। নূতন নূতন তখনও লজ্জা ত্যাগ করিতে পারি নাই। পরে আর গাত্রতল্লাস দিতে সরমে মরিতাম না। যাহাই হউক, আইন মাফিক লেখালেখি হইল। আবার ফটক খুলিল। জন ত্রিশ গুর্খা খুকরী হাতে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে; মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলাম; হুকুম হইল, 'মার্চ্চ'। আমরাও উৎসাহেই চলিলাম। মনে হইল, ক্রমোন্নতি। ঢাকা জেলের ৪৫টী "সেলে"র একটাতে ঢুকিলাম। গৃহসজ্জা একটী চাটাই, একটী কম্বল! চমৎকার, এত আশা করি নাই! দরজায় তালা দিতে না দিতেই পাশের সেল হইতে ডাক 'কে—কোত্থেকে?' উত্তর শুনিয়া, আবার প্রশ্ন—'আর কে কে ক'লকাতায় ধরা পড়েছে?' উত্তর দিলাম। আবার দরজা খোলা হইল, 'ঠাকুর' ভাত ডাল দিয়া গেল। জল দেওয়ার সময়, আস্তে বলিল, পুলিন বাবু পাঠাইয়াছেন, নাম কি?—নাম বলিলাম। মনে হইল, দুঃ ছাই, এ যে বাড়ীর মত গো!—ভাবিয়াছিলাম সবটাই লালবাজার! দুঃখ সুখ তুলনামূলক! ঐ রাত্রির পচা ডাল ভাতও সুস্বাদু লাগিল, লালবাজারের স্মৃতি মনে ছিল কি না!

পাশের কুঠুরি হইতে আরো দুই একটা কথা হইতেই গুর্খার ধমক আসিল, 'হল্লা মৎ করো। বাৎচিৎ একদম মানা হ্যায়।'

ব্যাপার কিছু বুঝিলাম। চাটাই বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম, মাটী ঝাড়িবার ধৈর্য্যও আর ছিল না! যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন দেখি —দরজা খোলা।

দশম পরিচ্ছেদ

জেলের এক অধ্যায়

বিপ্লববাদীরা ফাঁসিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, গুলির আঘাতে মরিয়াছে ; সুদীর্ঘ, দুঃসহ কঠোর কারাবাসের ফলে কেহ প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কেহ রুগ্ন হইয়াছে, কেহ বা উন্মাদ হইয়াছে, কেহ সুস্থ অবস্থায়ও ফিরিয়াছে। বিপ্লববাদীরা নির্জ্জন কারাগৃহে সুদীর্ঘকাল রহিয়াছে ও গম ভাঙ্গিয়াছে, ঘানি টানিয়াছে, বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, হাত-বেড়ি পা-বেড়ি পরিয়াছে ; সাধারণ কয়েদীর খাদ্য খাইয়াই জীবনধারণ করিয়াছে, কিন্তু সাধারণ কয়েদীর মতও স্বচ্ছন্দে জেলবিহার করিতে পারে নাই। বিপ্লববাদীরা অন্তরীণে,—কেহ সুদূর পল্লীতে, কেহ সমুদ্রের বেলাভূমে, কেহ সুন্দরবনের জঙ্গলে স্থান পাইয়াছে,—বিপ্লববাদীরা 'দমদমা'য় কীড ষ্ট্রীটে, ডিষ্ট্রীক্ট জেলের হাজতে শক্তি ও ভক্তির পরীক্ষা দিয়াছে ; ভুল-ভ্রান্তি ও সত্যের যাচাই সেই কষ্টিপাথরে হইয়াছে। কোনও বিপ্লববাদীই তাহার সাধারণ কারাবাসকে দুঃখের রূপে ত দেখিতে পারে না ! তাহার শত শত সতীর্থ যে তিলে তিলে সুদীর্ঘকাল দুঃখে কষ্টে কঠোর কাঠিন্যের মধ্যে মনুষ্যত্বকে বজায় রাখিয়াছে। দুই এক বৎসরের জেলভোগ, চার পাঁচ বৎসরের

রাজবন্দী (State prisoner) রূপে জেলবাসের ব্যবস্থা যে সে কঠোরতার ব্যথার কাছে ম্লান হইয়া যায়। তুলনায় আমাদের দুঃখের কথা যে একেবারেই ছেলেখেলা। তাই জেলের কোন দুঃখের কথা গাহিবার আহাম্মকী আমাদের নাই। যে কয় বৎসর কারাবাসে ও রাজবন্দী অবস্থায় থাকিয়া নানা সঙ্গলাভে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, সেই কথাই বলিব। সে অভিজ্ঞতার কথায় বিপ্লববাদীদের সম্বন্ধে দেশবাসী যে কতকটা কথা জানিতে পারিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। জেলের কথা সামান্যভাবেই কিছু বলিব।

ঢাকার জেলেই আছি। মামলার ব্যাপার দেশবাসী জানেন, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। যাহারা সুধু 'সঙ্গে' আসিয়াছে, তাহারা জেলে আসিয়াই প্রথম আপসোষ করে—'ছাই এ সামান্য সম্পর্কটুকু না রাখিলেই ত হইত!' মোটকথা সে-বেচারা মনে প্রাণে কখনো বিপ্লববাদী নহে, কেবল 'সঙ্গে আসিয়াছে।' কিন্তু যখন ঠিক হইল যে, 'নিস্তার নাই' তখন সেও আর পিছনে থাকিতে চাহে না, দশ জনের মধ্যে এক জন হইতে চাহে। বলা বাহুল্য, ইহারা প্রকৃত বিপ্লবের মাথাও নয়, হাতও নয়, পা-ও নয়, ইহারা শুধু স্পর্শদোষে দুষ্ট!

যাহারা সমিতির লাঠিখেলার পরে সত্যই এমন ভীষণ অবস্থায় পড়িবেন ভাবেন নাই, অথবা হাতে যাহা পাইয়াছেন করিয়াছেন

কিন্তু এমন করিয়া জেলভোগের জন্য প্রস্তুত হন নাই, তাঁহারা প্রথমটায় একটু 'কেমন কেমন' হইয়া পড়েন, মনে হয়, সবটাই বড় নূতন! কিন্তু ইঁহাদের মধ্যেও যাঁহাদের প্রাণ থাকে, তাঁহারা দুই দিনেই সামলাইয়া উঠেন, কারাদুঃখ সহজেই অপর সকলের মতই বরণ করিয়া লন! হয়ত যে কথা আগে ভাবেন নাই, বুঝেন নাই, তাহাই এখন এত সব নূতন লোকের সঙ্গে পড়িয়া ভাবেন ও বুঝেন। সরকারের এই ভাবের ধর-পাকড়ের ফলে কেহ কেহ জেলে গিয়াই প্রকৃত বিপ্লববাদীদের সঙ্গ লাভ করিয়া বিপ্লব-পথে পা দেন।

অপর যাহারা, বিপ্লবে ঢুকিয়াছিল নিজের সুবিধার জন্য, যাহারা মনে মুখে এক নহে, স্বার্থে যাহারা শত স্থানে বাঁধা, তাহারা কিন্তু আসিয়াই খুঁজিল, পালাইবার সুন্দর পথ আছে কিনা। তাহাদের এই মানসিক ভাবনা যে মুখে প্রকাশ পাইত তাহা নহে। কারণ, ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে, চতুর ইহারা, ইচ্ছাকে গোপন রাখিতে জানিত। লোকচরিত্রজ্ঞ নেতা যিনি, তিনি হয়ত দুই দিনে ইহাদের চিনিয়া ফেলেন; কিন্তু সকলে সব সময় ইহাদের চিনিতে পারে না। সম্ভাবনা থাকিলে ইহারা বাহির হইবার পথ খোঁজে কিন্তু অসম্ভব হইলে ও ভয়ের কারণ থাকিলে, সুযোগ ও সুবিধার অপেক্ষায় থাকে। বলা বাহুল্য, দলের অত্যধিক প্রভাবে বা অন্য কোন কারণে 'সরকারী সাক্ষী' না হইতে পারিলেও কারাবাসকালে এবং জেলের বাহিরে আসিয়া তাহারা বিপ্লবের সুহৃদরূপে আর থাকে না। অপর পক্ষে যাঁহারা

ইহার অন্তরঙ্গ, যাঁহারা ইহার প্রকৃত স্রষ্টা, যাঁহারা বুঝিয়া শুনিয়া, জানিয়াই আসিয়াছেন,—যাঁহারা জেল-দ্বীপান্তর বা আর যা কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহারা জেলে আসিয়াও সে চিন্তায়, সে ভাবনায়ই কাল যাপন করেন। নিজেদের কথা, বাহির হইবার কথা ভাবেন না, ভাবেন কি করিয়া অভীষ্টলাভ হইবে। আর এক প্রকৃতির লোক জেলে দেখা যায়, যাঁহাদের যুক্তির পরিবর্ত্তন খুব সত্বর হইতে থাকে, অর্থাৎ যে যুক্তি দুই দিন আগে নিজেই দিয়াছেন, জেলবাসের সময় তাহার বিরুদ্ধেই যুক্তি দেন। চুপ করিয়া থাকার দরুণ অবসর পাইয়া, নিজেদের ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে পারিয়াই হউক বা সুদীর্ঘ দুঃখকষ্টের কথা স্মরণ করিয়াই হউক, ইঁহারা মুখ্য বিপ্লববাদীদের মতে আর মত মিলাইতে পারেন না, পূর্ব্বের পথের ভুল-ভ্রান্তি জেলে আসিয়া নূতন করিয়া দেখেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিপ্লববাদীদের মধ্যে ধর্ম্মভাব কিছু বেশী দেখা যাইত। অরবিন্দ বাবু হইতে আরম্ভ করিয়া, যিনিই যখন জেলে গিয়াছেন, তখনই এই ভাবটী খুব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিপ্লববাদীরা সাধারণত ত্যাগী। ভোগাকাঙ্ক্ষা একটু কম বলিয়া এবং জেলে আর কিছু করিবার নাই বলিয়া, সহজেই তাহারা ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে লিপ্ত ও আকৃষ্ট হইত। আলিপুর মামলা হইতে আরম্ভ করিয়া বিপ্লববাদীদের রাজবন্দী ও কারাবাস অবস্থায়ও ধ্যান-ধারণা করিতে দেখা গিয়াছে। এ 'ধর্ম্মের দেশ' বলিয়াই হউক, আর যে কারণেই হউক অনেক বিপ্লববাদী শেষকালে

'ধার্ম্মিক'ই হইয়াছেন, বিপ্লবপন্থাকে পথ মনে করেন নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস, ধর্ম্ম ভিন্ন ভারতের মুক্তি নাই। আবার কেহ এই সমস্ত ধ্যান-ধারণায় পরম আনন্দ লাভ করিয়া, অধ্যাত্মজীবনের রসাস্বাদনে ব্যাকুল হইয়া—গৃহ ত পূর্ব্বেই ছাড়িয়াছিলেন—একেবারে সমস্ত ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসও নিয়াছেন। কেহ কেহ সে পথে উন্নত অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছেন। বাংলার বিপ্লববাদীরা জাতীয়তাকে মানব জীবনের উচ্চ ভাবসম্পদের দিক দিয়াই বিচার করিয়াছিল। ভারতের জাতীয়তাকে ভারতের বিশিষ্ট সাধনা ও সভ্যতার দিক দিয়াই বুঝিতে চাহিয়াছিল। মনুষ্যত্বের পূর্ণতার প্রয়োজনের দিক দিয়াই স্বাধীনতাকে একান্ত জাতীয় প্রয়োজন বলিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে চাহিয়াছিল. আর কেহ কেহ 'রাজনীতি' যে ভারতের কথা নহে, ইহা বলিয়া, অধ্যাত্ম সম্পদের সঙ্গে ধর্ম্মের প্রয়োজন হিসাবে—ঠিক 'রাজনীতি' নহে,—দেশসেবাকে জুড়িয়া দিলেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যাত রাজনীতি বুঝিতে যতখানি দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয়, ততখানি রাষ্ট্র-বিজ্ঞান জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। ভারতের বিশিষ্টতার জন্যই হউক বা যে জন্যই হউক ইঁহারা দেশকে মুক্ত করিতে, ভারতের বিশিষ্ট অধ্যাত্মজীবন লাভ করিতেই ব্যস্ত হইলেন।

কিন্তু যাঁহাদের বিপ্লবে পাইয়া বসিয়াছিল, 'দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ' এ যাঁহারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা ধ্যান-ধারণা ব্যাপারেও যেন মাত্রা রাখিয়া চলিতেন। এমন কি, অনেক সময় যেন তাঁহারা শঙ্কিত

হইতেন, পাছে অধিক ধর্ম্মচর্চ্চায় এ পথ কেহ ছাড়িয়া দেয়, দেশের সেবাকেই একমাত্র ধর্ম্ম মনে না করে। যাঁহারা বেশী ধর্ম্মচর্চ্চায় লিপ্ত থাকিতেন, তাঁহারা 'বুঝি বা চলিয়া যায়—'বিপ্লব গৃহ' ছাড়িয়া বুঝি যায়'!—এ রকম ভাবনাও ভাবিতেন। যাহা হউক ভাল কি মন্দ আজও বলিতে পারি না, যাঁহারা জেলে ও রাজবন্দী অবস্থায় নিত্য নিয়মিত ধ্যান-ধারণায় অধিক সময় ব্যয় করিতেন, তাহারা অনেকে বাহিরে আসিয়া তেমনটা আর করেন না। অথবা অভাবের তাড়নায় বা নানা কর্ম্মপ্রসঙ্গে করিতে পারেন না।

সে যাক্, ষড়যন্ত্র মামলায় এখান সেখান হইতে ক্রমে অনেকেই আসিয়া হাজির হইলেন। ৪৫টী সেল্ পূর্ণ করিয়া আমরা রহিলাম। কেহ কেহ 'পায়ের মল' বাজাইয়া আসিল। ইহাদের নানা ধারায় পূর্ব্বেই শাস্তি দিয়াছে; আবার ঐ ষড়যন্ত্র মামলারও আসামী ইহারা। পায়ে ডাণ্ডা বেড়ি! কোন বিশেষ অপরাধের জন্য এই শাস্তি নহে—রাজনৈতিক বলিয়াই ইহারা dangerous 'সাঙ্ঘাতিক'। ইহাদের মধ্যে একটী ছিল বালক, বয়স ১৪।১৫, মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। হাসির প্রধান কারণ, কাছাকাছি, মুখোমুখি হইলেও মুখ খুলিবার হুকুম নাই। ইহারা কি সাধনা করিয়াছে জানি না—তবে এ বয়সে ২।৪ বছরের কঠোর কারাবাস আরো ৫।৭ বছর মাথার উপর ঝুলিতেছে; কিন্তু তবু গম পিষে, গান গায়; স্পেশাল diet নহে, একেবারে খাসা জেল diet রোজ খায়, বাড়ী হইতে কোন তদ্‌বির নাই; কিন্তু তবু মুখের হাসি, বুকের আনন্দ কমে নাই।

অনেকে কঠোর শাস্তির জন্যই প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিয়া আছেন, সুতরাং জেলের ভাত খারাপ, ডাল বিস্বাদ, বলিয়া কিছু মনে করিতেন না। যাঁহারা ধরা পড়িবার পূর্ব্বে সমিতির মধ্যেই খাইতেন তাঁহারা বলিতেনই, 'সমিতিতে ত শুধ্ নুন-ভাতও খাইয়াছি। সমিতির ব্যবস্থা হইতে এ ব্যবস্থা মন্দ নহে।' বিপ্লববাদীরা আহার লইয়া গোলমাল করিয়াছে রাজবন্দী অবস্থায়। তাহাও নানা কারণে, নতুবা জেলের খাওয়া যতই খারাপ হউক, সেজন্য কোন অভাব অভিযোগ জানায় নাই। কারণ এ যেন জানা কথাই।

ভোর হইলে না জাগিলেও দরজা খোলার শব্দেই জাগায়। মুখ হাত ধুইতে, পায়খানায় যাইতে একঘণ্টা বাহিরে রাখে, আবার 'সেলে'। বৈকালে এক ঘণ্টার জন্য বাহিরে নেয় আবার 'সেলে'।

কতকটা খোলা জায়গায় এক একজন গুর্খা রাখালের হেপাজতে এক একজন বিপ্লববাদীকে নির্দ্দিষ্ট কয় হাত জায়গার মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। কথা বলার হুকুম নাই। ভক্ত গুর্খা খুকরী খুলিয়া হুকুমের সেবা করে। সুতরাং গুর্খার সঙ্গে নিত্য ঝগড়া লাগিয়াই থাকিত। এত কাছে থাকিয়াও কথা বলা চলিবে না, এই শাস্তি, গম্ভীর প্রভৃতির লোক ভিন্ন ত সকলে সহ্য করিতে পারে না, তাই কথা বলিয়া ফেলে।

নেতৃস্থানীয়েরা সাব্যস্ত করিয়া দিলেন, কথা বলিও না।—তবে যদি একান্ত প্রয়োজন হয়, কথা বলিও—কিন্তু গুর্খা বা

সাহেবের সঙ্গে এ নিয়া তর্ক করিও না। এ জন্য যে শাস্তি দেয়, দিবে। সেজন্য প্রস্তুত হইয়াই কথা বলিও।

ফলে এই দাঁড়াইল:—প্রয়োজন হইলে (ব্যক্তিগত নহে সমষ্টিগত প্রয়োজনে) কথা বলা হইত। গুর্খা হয়ত আসিয়া মানা করিত, ধমকাইত, নালিশ করিবার ভয় দেখাইত। আর নালিশ করিলেই শাস্তি! কিন্তু যতক্ষণ প্রয়োজনীয় কাজ শেষ না হইত, ততক্ষণ 'বক আর ঝক কানে দিয়েছি তুলো' নীতি অবলম্বন করিয়া কথা চলিতই। অবশ্য নিষ্প্রয়োজনেও যে কথা না চলিত, তাহা নয়, তবে সেটা নেতৃস্থানীয়েরা করিতেন না। অপরে অভ্যাসবশত করিয়া ফেলিতেন। গুর্খার হস্তে ধরা পড়িবার ভয় তাঁহাদের একটুও ছিল না। ভয় ছিল, নেতাদের। যাহাই হউক ছয় মাস পর্য্যন্ত কথা বলা বন্ধ ছিল। শেষে আমাদের ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করিয়া হুকুম দেওয়া হইল, দুইজন করিয়া কথা বলিতে পার,—তাহাও ব্যারিষ্টারের যুক্তির প্রভাবে।

সাধারণ কয়েদীরা কথা বলিতে পারে, কিন্তু বিপ্লববাদীর বেলায় কর্ত্তৃপক্ষ মৌনব্রতের ব্যবস্থাই করিতেন। প্রত্যেক জেলে, এমন কি শেষকালে রাজবন্দী (state prisoner) ও অন্তরীণের সময় পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে বিপ্লববাদীদের যত গোলমাল হইয়াছে, তাহার অধিকাংশের মূলেই, এক দিকে এই কথা বন্ধ করিবার ও অপর দিকে কথা বলিবার চেষ্টা।

জেলে চল্যাফেরা সম্বন্ধে নিয়ম জানান হইল,—(সে নিয়ম জেলের নহে, আমাদের নিজের ঘরের) জেলে আসিয়া কিছু আশা করিও

না, চাহিও না, প্রত্যাখ্যানও করিও না। সকলই সহ্য করিতে হইবে। যদি কোন অন্যায় সহ্য করা একেবারেই অসম্ভব হয় তবে যাহা ইচ্ছা, ব্যক্তিগতভাবে করিও। কিন্তু অভিযোগ বা অভিযোগের প্রতিকারের দিকে ভরসা রাখিও না। তবে সকলই সহ্য করা যায়, কারণ 'সইতে হবে', তাইত জেল!—

একাদশ পরিচ্ছেদ

জেল

জেলের জীবন স্বভাবতই সংযত। তাহার মানে এই, জেলের নিয়মে তেমন অসংযমী হওয়ার সুবিধা নাই। তবু মধ্যে মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষের বিচারে আমাদের অসংযম নাকি প্রকাশিত হইয়া পড়িত! সে জন্য হাত-কড়ি পা-বেড়ি প্রভৃতিও চলিতে লাগিল। একদিন কথাবার্ত্তা লইয়াই গোলযোগ বাধিল। বেড়াইবার সময় কি একটা ব্যাপারে গুর্খাদের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি চলিতেছিল। এমন সময় পঁয়তাল্লিশজন আসামীর যে যেখানে ছিল একটি ইঙ্গিতে, কথাটিমাত্র না বলিয়া নিজ নিজ সেলে গিয়া গম্ভীর হইয়া বসিল; —ইহাই নাকি ভয়ানক ভয়ের কথা। সকলগুলি লোক, একটা লোকের কথায় গুর্খা সিপাহীদের সঙ্গে ঝগড়া পর্য্যন্ত না করিয়া ইঙ্গিতমাত্রে বেড়ান বন্ধ করিয়া সেলে গিয়া ঢুকে! তাইত!— অমনি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গেল খবর। তিনি পত্রপাঠ আসিয়া হাজির। তিনি সকলকে বাহির করিয়া বেত দেওয়ার জায়গায় নিলেন। সকলেই ভাবিল বেত মারা হইবে। মারা হইলও বটে, তবে আমাদের অঙ্গে নহে—একটা নির্জ্জীব বালিশের উপর। সাহেব ইঙ্গিতে বুঝাইলেন সাবধান, যদি দুষ্টামি কর, এই রকম করিয়া

বেত মারা হইবে—সহিতে পারিবে না।—বেত মারার অধিকার যে বিচারাধীন (under trial) অবস্থায়ও তাঁহাদের অক্ষুণ্ণই আছে, ইহা জেলকোড পড়িয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাদের শিখাইলেন, কিন্তু হইলে কি হয়, যে সংযম কোথাও শিখি নাই তাহা সাহেবদের ইচ্ছায় দুইদিনে শিখা যাইবে কেন? পায়খানায় গেলে আর সংযম রক্ষা (সংযম মানেই এখানে বাক্‌সংযম) করা যাইত না। কারণ ওস্থানেই পাশাপাশি বসিয়া "কথাবার্ত্তা" চলিত। সেই দুর্গন্ধপূর্ণ নরকে বসিয়া থাকা কিন্তু সহজ নহে। যেমন 'ধন্য' আমরা তেমনি 'ধন্য' প্রভুভক্ত গুর্খা। ঐ পায়খানার কাছে নাকে কাপড় দিয়া, খুকরী হাতে গুর্খা দাঁড়াইয়া থকিত, মুখে বলিত, 'জলদি কর।' ভায়ারা গুর্খার কথার উত্তর ত আর পায়খানায় বসিয়া দিতে পারে না, এ যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য—তাই মুখ টিপিয়া হাসে। গুর্খা ত চটিয়া লাল। দুই চার জন গুর্খা আবার এমনিই ছিল যেন জন্মের দিন হইতে চটিয়াই আছে—জীবনে কখনও হাসে নাই; চোখ লাল করিয়াই আছে। ধ্যান-ধারণা, জপ তপ প্রার্থনার মধ্যেও তাহারা বাধা দিতে আসিত।

গুর্খাই ইংরাজের সব চাইতে বিশ্বাসী ভৃত্য। জেলে বিপ্লব-বাদীদের প্রতি ইহারা যেমন নিষ্প্রয়োজনে 'প্রীতি' দেখাইয়াছে এমন আর কেহ দেখায় নাই।

যাহাই হউক এমন অবস্থায় ঢাকার মোকদ্দমা চলিল। সে দুঃখের মধ্যেও অনেকের ত্যাগ ও নির্ভীকতা দেখিয়াছি। কিন্তু কেহ কেহ, মুখে না বলিলেও খালাস হইতে পারিলে যেন বাঁচে।

আবার অনেককে দেখিয়াছি, নিজে মুক্তি চাহে না, নিজের জেল হউক, তবু যদি কোন উপায়ে বিশেষ কোন কর্ম্মীর খালাস হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

ভোগ করার ত সেখানে কিছুই নাই, তবু কেহ কেহ হয়ত তাহারই মধ্যে সামান্য প্রয়োজনীয় জিনিষটুকুই একটু আরামদায়ক করিয়া লইয়াছে। আবার কেহ কেহ ঐ সামান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মধ্য হইতেও অনেকখানিই বাদ দিয়া চলিয়াছেন—কারণ সংযম ও কঠোরতা পুরা মাত্রায় চাই। অনেকেই জানিতেন, কঠোর শাস্তি হইবে। কেহ কেহ হয় ত হাল ছাড়িয়াছিলেন। অনেকেই শরীরটা বেশ সবল করিয়াই রাখিতে চাহিতেন—কারণ সুদীর্ঘ মেয়াদ খাটিতে, গম ভাঙ্গিতে ঘানি টানিতে শরীরই ত প্রধান সহায়। মনের অবস্থা তখনও সকলের বুঝা যায় নাই, বুঝা সহজও নহে। মানুষ নিজের মনের কথাও সকল সময় বুঝে না।

যাহা হউক, সুখে দুঃখে ঢাকা জেলের জেল-জীবন কাটিতে লাগিল। ও দিকে মামলা চলিল। তবে মামলার দিকে আসামীদের মধ্যে দুই জন বৃদ্ধ ও একজন মুরুব্বি ভিন্ন আর বড় কাহারো লক্ষ্য নাই। যাহা হইবার হইবে—ভাবটা যেন এই গোছেরই। কৌন্সেল মিঃ সি. আর. দাস, শ্রীশ বাবু উকিল প্রভৃতি যখন হাকিমকে মামলা বুঝাইতে ব্যস্ত—তখন 'ডকে' আসামীরা হয়ত রুটির ময়দা ছানিয়া গাথ সাহেবের মুখ গড়িতে লাগিয়া গিয়াছে। যে সাহেবের মুখ যত বিশ্রী, তাহার মুখ গড়া হয় তত সহজে ও শীঘ্র। মধ্যে মধ্যে হৈ চৈ ব্যাপারে, হাকিম বিরক্ত

হন। মুরুব্বিরা বলেন 'চুপ চুপ'! একদিন কোর্টে মিঃ আপটন ও মিঃ গার্থের মূর্ত্তি (মুখ) একেবারে চমৎকার করিয়া গড়া হইল। শ্রীশ বাবু লইয়া গিয়া সাহেবদের দেখাইলেন; সাহেবেরা একটু হাসিল বটে, কিন্তু মনে করিল হয়ত ঠাট্টা করিয়াছে! শ্রীশবাবু আস্তে আস্তে বলিয়া গেলেন ওদের যেমন মুখ গড়িয়াছ তেমনি মিঃ দাসেরও মুখ গড়িয়া দেও—তবেই ওরা কিছু মনে করিবে না। চেষ্টাও হইল—কিন্তু শিল্পী বলিলেন, 'সুন্দর মুখ গড়িতে পারি না। কোথাও একটু বিশ্রী খুঁত না থাকিলে লক্ষ্য ঠিক করিয়া গড়া যায় না!' এমনি ভাবে আদালতে দিন কাটিত।

* * *

জেলে গিয়া কেহ কেহ বেশ ধ্যান-ধারণা আরম্ভ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে দুই একজন সত্যই পরে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস নিয়াছেন। অক্ষয়, ডাক নাম লোহা বা Iron ত্যাগে, চরিত্র-মাধুর্য্যে, সাধনায়, জেলে থাকিতেই ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস দিলেন। সেই মৌন-ব্রতধারীকে অনেক বিরক্ত করা হইত, কিন্তু মৌনীই শেষে জয়ী হইলেন, বিরক্ত করা সম্ভব হইল না। তাঁহার ব্রত সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি এখন সর্ব্বত্যাগী—সাধু।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্মের দেশ বলিয়াই হউক বা অন্য কারণেই হউক বিপ্লববাদীরা সাধারণত জেলে গিয়া একটু সাধন ভজন করিত। এ অবস্থায় যাহারা প্রাণায়াম প্রভৃতির মাত্রা হঠাৎ চড়াইয়া দিলেন, তাঁহারা কেহ উপযুক্ত দীক্ষার অভাবে হইলেন অসুস্থ, কেহ বা বিপ্লব পথ ছাড়িলেন। সুদীর্ঘ কাল জেলে একটা প্রকোষ্ঠে সময় কাটাইতে

হইবে এই নিমিত্ত (মনে রাখিতে হইবে লেখাপড়া করিয়া সময় কাটাইবারও সম্ভাবনা ছিল না) এবং ভবিষ্যৎ জীবনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও প্রকার নিশ্চয়তা না থাকায় স্বভাবতই যুবকদের মধ্যেও ভগবদ্‌ভক্তি দেখা দিত, একটা শরণাগতির ভাব আসিত। মানুষ যেখানে নিরুপায় শরণাগতি সেখানে সহজেই আসে। তাহার উপর সংসারের বন্ধন কাহারও বড় একটা ছিল না। সকলেই ভাবিত যাক ভগবৎ চিন্তা করিয়াই জীবন কাটাইব, দুঃখ কি, ভগবৎ চিন্তার মস্ত অবসর পাইলাম! অবশ্য সুদীর্ঘ কারাবাসের মধ্যে তেমন নিষ্ঠার সহিত এই ভাবটীকে সকলেই বরাবর বজায় রাখিতে পারেন নাই। দুঃখ কষ্ট অনেককে পীড়িত করিয়াছে; আবার অনেককে যে কিছুই করিতে পারে নাই তাহাও দেখিয়াছি। সেই জেল-দ্বীপান্তরের মধ্যেও তাহাদের মুক্ত-জীবন একটুও ম্লান হয় নাই। আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া সোণা খাঁটি হইয়াছে, আরো উজ্জ্বল হইয়াছে!

ষড়যন্ত্রের মামলায় প্রায়ই একজন এপ্রুভার দাঁড়ায়, সেই হয় সরকারের প্রধান অবলম্বন। ঢাকার এই মামলায় সরকার কোন এপ্রুভার পায় নাই। তবে প্রাণায়াম প্রভৃতি অশুদ্ধ উপায়ে সাধন করিয়া একজন বিকৃত মস্তিষ্ক হয়, সে-ই মোকদ্দমা শেষ হইলে অসংলগ্ন কতকগুলি কথা বলিয়া ফেলে। তাহা অবশ্যই আদালতে গ্রাহ্য হয় নাই। এক কারণ, তখন মোকদ্দমা শেষ হইয়াছে, দ্বিতীয় কারণ আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হওয়ায় জেল কর্তৃপক্ষ তাহাকে উন্মাদ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মামলায় ফল হইল না

গবর্ণমেণ্ট দুইদিনেই দেখিলেন, ষড়যন্ত্র মামলা করিয়াও বিপ্লব-বাদীদের বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই। কয়েক জনের শাস্তি হইল বটে, কিন্তু দেশে বিপ্লবানুষ্ঠান চলিতেই লাগিল। ঢাকার মোকর্দ্দমার সময়েই ইন্‌স্পেক্টরের উপর গুলি চলে, মুন্সিগঞ্জে বোমা ফাটে, বিক্রমপুরে কয়েকটা খুন হয়, অনেকগুলি অস্ত্র-শস্ত্র ধরা পড়ে, অনেকগুলি রাজনৈতিক ডাকাতি হয়। নেতাদের গ্রেপ্তারেও যে বিপ্লবানুষ্ঠান বন্ধ করা গেল না, ইহা সরকার সহজেই বুঝিলেন।

এত সব ধর-পাকড়ের পরেও বিপ্লববাদীরা গুপ্ত সমিতি ত্যাগ করিতে পারিল না। মোট কথা বাংলায় তখন আবেদন নিবেদনে যাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, তাঁহারা এই সমস্ত বিপ্লববাদীদের উপর কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারেন নাই। তাহারা একই কালে মডারেট, এক্‌ষ্ট্রীমিষ্ট সকলকেই বাদ দিয়া চলিল। দেশের কাজ তাহারা শুধুই বিপ্লবের দিক দিয়া বিচার করিয়া, ধ্বংসের শ্মশানেই সৃষ্টির মঙ্গলঘট স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হইল। আবেদন নিবেদন বা অপেক্ষা করিবার ধৈর্য্য তাহাদের একটুও ছিল না। তবে তাহাদের পথ কি, কোথায় যাইতেছে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা যে

বিপ্লববাদীদের প্রথম হইতেই ছিল, তাহা বলা যায় না। তাহা নানা অবস্থার উদ্ভব ও পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

বিপ্লববাদীদের উগ্র কর্ম্মে ও ত্যাগে দেশে তখন এমনি একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করিল, যাহাতে আইনসঙ্গত রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা ও তাহাদের প্রচেষ্টা ম্লান হইয়া গেল। সেদিকে আর কোন আকর্ষণ রহিল না। অন্তত ভাবপ্রবণ তরুণ বাংলার কাছে ঐ পথ যেমনি অকেজো তেমনি নিরর্থক বলিয়াই বিবেচিত হইল। যাহাই হউক, দেশের অন্য কোন পন্থীর সঙ্গে কোথাও একটু বিরোধ না করিয়া এবং যতটুকু সম্ভব প্রত্যেকের কাছ হইতে তাঁহাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সাহায্য লইয়া বিপ্লববাদীরা তাহাদের পূর্ব্ব পন্থাতেই যুক্ত রহিল, উহা ত্যাগ করিল না।

নেতারা জেলে গেলেন, কেহ কেহ সরিয়া পড়িলেন, কিন্তু দেশে এই স্রোত বাড়িয়াই চলিল। বাংলার যুবগণের আশা আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা প্রচেষ্টা, সবই বিপ্লবমুখী হইয়া পড়িতে লাগিল। কেমন করিয়া এই বিপ্লব সত্যই একদিন সম্ভব হইবে সে কথা সাধারণ সভ্য কিম্বা অনেক প্রধানের পক্ষেও কল্পনা করা হয়ত খুবই শক্ত ছিল। কিন্তু তবু ঐ বিপ্লবের নামে, এই জটিল, বন্ধুর, সীমাহীন পথেই সকলে পা ফেলিতে লাগিল। এত বাধা সত্ত্বেও নূতন কর্ম্মীর অভাব হইতেছিল না। নানা অযোগ্য লোক যেমন বাহির হইতেছিল, যোগ্য লোকও তেমনি বাহির হইতেছিল। বড় বড় দলপতিরা সরিয়া গেলে স্থলে স্থলে দলবৃদ্ধি পাইতেই লাগিল।

সব শেষ হইল না। দলবৃদ্ধি ভাল না হউক, কিন্তু এ পথের পথিক যে জুটিত, তাহাই লক্ষ্যের বিষয়।

ইহারও একটা হেতু আছে। (বাংলার বিপ্লববাদ কোন ব্যক্তি-বিশেষকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। জাতির স্বতঃস্ফূর্ত দেশাত্মবোধ নানা ভাবসংঘাতে রূপান্তরিত হইয়া বিপ্লব-আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।) কোন ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া যদি বাংলার ঐ জাগরণ সূচিত হইত, তবে নেতাদের অবর্ত্তমানে বা 'অন্তর্দ্ধানে' তাহাতে স্বভাবতই যবনিকা পড়িত। কিন্তু কতকগুলি কর্ম্মী সকল-নিরপেক্ষ হইয়াই উক্ত প্রেরণা, আপন অন্তরের মণিকোঠা হইতেই লাভ করিয়াছিল। মানুষ যখন অন্তর দেবতার আদেশে কোন বস্তুকে লাভ করিতে ব্যস্ত হয়, তখন তাহার দ্যোতকরূপে বাহিরের কোন 'বাণী', কোন মহাপুরুষের 'আদেশ' বা অপর কোন বিদ্বেষ বর্ত্তমান না থাকিলেও চলে। সহায় সম্বলহীন বিপ্লববাদীরা নিজেদের ভাবকে নিজেরাই সৃষ্টি করিয়াছে, নিজেরাই পুষ্ট করিয়াছে। কাহারো বিয়োগে, কাহারো অভাবে তাহাদের পথ রুদ্ধ করিতে পারে নাই। ভারতের প্রায় সব জাগরণই নেতার অভাবে, একজন শ্রেষ্ঠ লোকের অভাবে একেবারে অসহায়ভাবে নিঃশেষ হইয়াছে। ভারতের ইতিহাসের পাতায় পাতায় ব্যক্তিবিশেষ নেতার অদ্ভুত কর্ম্ম, আর উক্ত নেতার অভাবে ঐ নেতারই শিষ্যদের অদ্ভুত অবসাদের কথা লিপিবদ্ধ আছে। একের অভাবেই যেন সকলেরই অভাব হইয়া পড়ে। কিন্তু বাংলার বিপ্লববাদের অবস্থা ছিল অন্য প্রকার। (বাংলার

যুবজন এই আন্দোলনকে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। তাহারা সকলেই (ব্যক্তিবিশেষ নহে) প্রাণ দিয়া ইহার সত্য মিথ্যা ভুল ভ্রান্তি বাচাই করিয়াছে। নেতার আদেশে তাহারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছে বটে, কিন্তু নেতার আসন দেশের অনেক নীচেই রাখিয়াছিল। দেশ যেন তাহাদের সমগ্র হৃদয় দখল করিয়া বসিয়াছে, নেতার আসন সেখানে দেশের উপরে জয়ী হইতে পারে নাই। বাংলার যুবজন বিপ্লববাদের ভিতর দিয়া একটা নূতন ভাব দেশে আনিয়া দেয়—তাহা জনশক্তির প্রভাব, তাহা সাধারণতন্ত্র, ব্যক্তিতন্ত্র নহে। ব্যক্তির দেশসেবার মাপকাটিতে সেখানে নিত্য বিচার হইত।)

নিজের জীবনে, সর্ব্বস্ব বিনিময়ে সত্যকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা বিপ্লববাদীদের মধ্যে দুই একজনের নহে, অনেকেরই ছিল। সুতরাং তেমন সব ব্যক্তি আদর্শকে লাভ করিতে অপর কাহারও অপেক্ষা না করিয়া নিজের অন্তরের জোরেই একেবারে বে-পরোয়া হইয়া চলিতে ইতস্তত করিত না।

গড়িয়া তোলার একটা গৌরব আছে,—অনুসরণ করার আছে অগৌরব। একটায় মানুষকে মানুষ করে, তাহার জীবনকে সচল যৌবনধর্ম্মে তেজীয়ান্ করে, অপরটি মানুষকে পীড়িত করে,—সৃষ্টির আবেগের একান্ত অভাব হেতু একটা পঙ্গুতা আসিয়া তাহার সত্যকার জীবনধর্ম্মকে দীন হীন করিয়া দেয়।

বাংলার সেই জাগরণ যেন বাঙালীর নিজস্ব। তাহার ভুল ভ্রান্তি, ভাল-মন্দ সবই বাঙালীর গড়া। তাহাতে বাঙালীর

একটা প্রভুবুদ্ধিই কার্য্য করিয়াছে—কোন দাস-বুদ্ধি নহে। অনুকরণের দৈন্য নাই,—সৃজনের গৌরব আছে।

এই সমস্ত নানা কারণেই বাংলার বিপ্লব আয়োজন বাধা বিপত্তিতে, নেতার অভাবে থামে নাই। নিত্য নিত্য নব নব কর্ম্মী আসিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। বরং গোড়াকার নেতাদের (পাইওনিয়ার) অপেক্ষা পরবর্ত্তী কর্ম্মীরা বিপত্তি ঠেলিয়াছে বেশী। একটা প্রেরণা যেন বাঙালী বিপ্লববাদীদের পথনির্দ্দেশ করিয়া চলিয়াছিল, নেতার আদেশের অভাবে তাই তাহারা অসহায় হইয়া বসিয়া পড়ে নাই। ইহার ভুল-ভ্রান্তি দোষ-গুণ সবই তাহাদের একেবারে নিজস্ব বলিয়াই বাংলার কর্ম্মীরা আত্মবিশ্বাসেও দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছিল। বাংলার যুবকেরা এই প্রভু-বুদ্ধির ফলে কতকটা গোড়া ও একগুঁয়ে হয়ত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার ফলেই যে তাহারা একটা জীবন্ত সঙ্ঘে পরিণত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও কর্ম্মীর পর কর্ম্মী জুটিতেছিল। দেশের বুকের মাঝখান হইতে যেন কর্ম্মীরা দেশের বাণীকে গ্রহণ করিতেছিল, দরদ দিয়াই যেন দেশের বুকের ব্যথা টের পাইতেছিল। পথই তাহাদের পথে টানিতেছিল—পথপ্রদর্শক যেন অবান্তর।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মতভেদ

স্বদেশীর সূত্রপাত হইতে বিপ্লববাদীদের সমিতির মধ্যে নানা শ্রেণীর লোক আসে। গোড়ায় যে সমস্ত সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে খাঁটি বিপ্লববাদী ছাড়া অন্য লোকও ঢুকে। প্রথম অবস্থায় পদে পদে বিপদকে বরণ করিতে হইত না বরং একটা প্রতিপত্তি লাভের অবসর ছিল বলিয়া খুব সাধারণ শ্রেণীর লোকও দলে ঢুকিয়াছিল। 'মধুরে বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে' মনে করিয়াও অনেকে ইহাতে লিপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, গোড়ায় বাহবার একটুও অভাব ছিল না। তাহার উপর, একটা দল বাঁধিয়া চলিতে পারিলে যে প্রতিপত্তিলাভ হয়, তাহার আকর্ষণেও এক শ্রেণীর লোক ইহাতে ঢুকে। ইহাঁরা সমিতির প্রকাশ্য ব্যাপার পর্য্যন্তই যে কেবল ক্ষান্ত ছিল তাহা নহে গুপ্ত ব্যাপারেও কিছু কিছু লিপ্ত হইয়াছিল। তবে সে গুপ্ত ব্যাপারের সত্যকার নির্য্যাতনের দিকটা তখনও আরম্ভ হয় নাই বলিয়া পরীক্ষা তাহাদের পরে হইয়াছে। যাহাই হউক এ সমস্ত ধর-পাকড় ও কঠোর মেয়াদ প্রভৃতির পর, বিপ্লববাদীদের কর্ম্মপন্থা একেবারেই উল্টাইল এবং কর্ম্মীদের যোগ্যতার মাপকাটি স্বভাবতই বদলাইতে লাগিল।

১৯১০ সাল হইতেই নাম যশ বা অন্তপ্রকারের কোন প্রতিপত্তি-লাভ অথবা কোন সুখ বা সুবিধার আকর্ষণ আর রহিল না ; যাহা রহিল, তাহা মোটেই লোভনীয় নহে। যাঁহারা বুঝিয়া শুনিয়া আসিলেন বা রহিলেন, তাঁহারা নির্য্যাতন, দুঃখ, নিন্দা, দারিদ্র্য প্রভৃতিকে বরণ করিলেন। অবশ্য বুঝে নাই, কেবল 'সঙ্গে আছে' এমন লোকও কেহ না ছিল তাহা নহে, তবে পূর্ব্বকার 'সুবিধা-পন্থী', 'বাহবা-লোভী' বা প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তিকামীদের কোন স্থান সেখানে আর রহিল না, তাহারা আপনা হইতেই সরিয়া পড়িল। আর এক শ্রেণীর লোকও পরে সরিয়া পড়েন, তাঁহাদের কথাই এখানে বলিব।

১৯১০ সালের পর হইতে বিপ্লববাদীদের মধ্যে কতকটা মতভেদের সৃষ্টি হইতে থাকে। আদর্শ লইয়া একটা বুঝাপড়া চলিতে লাগিল। পথ লইয়াও মতান্তর দেখা দিল। পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে সর্ব্বত্রই এই ভাব অল্পাধিক ছিল। যাঁহারা কিছু ভুগিয়াছেন, অথচ আর ভুগিতে রাজী নহেন, তাঁহারা দুর্ভোগ ভুগিবার দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে এ পথ ছাড়িলেন। কেহ বা, এ পথে কিছুই হইবে না, এই বিশ্বাসে বিপ্লবপন্থা ছাড়িতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, স্ত্রীশিক্ষা ভিন্ন এদেশ উঠিবে না, কারণ 'না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না!' কেহ কেহ বলিলেন, জাতিভেদ না উঠিলে, কিছু হইবে না। কেহ বলিলেন, শিক্ষাই নাই, আমাদের ভাব বুঝিবে কে, শিক্ষাবিস্তার ভিন্ন কিছুই হইবে না।—কেহ বলিলেন, এদেশ ধর্ম্মের দেশ ধর্ম্ম ভিন্ন এদেশ

কিছু বুঝে না—ধর্ম্মেই এদেশ উদ্ধার হইবে।—এই রকমের নানা কথায় অনেকে সে সময়কার বিপ্লববাদীদের দল ছাড়িলেন। দুই একজন ছাড়া, তাঁহারা সকলেই যে স্ত্রীশিক্ষা, সমাজসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার ও ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবন কাটাইতেছেন এরূপ বলা যায় না। তবে বিপ্লববাদীরা মনে করিত, তাহারা ছাড়িয়া যাইবে, ইহাই প্রধান কথা।

যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা, সমাজসংস্কার করিবার কথা বলিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে, মতের দিক দিয়া, যাহারা তখনও বিপ্লবানুষ্ঠান করিতে চাহে তাহাদের কোন মতবিরোধ ছিল না। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্ম ভিন্ন কিছু হইবে না বলিলেন—তাঁহাদের সঙ্গেই বিপ্লববাদীদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একটা মতবিরোধ দেখা দিল। কারণ তাঁহারা ধর্ম্মের কথা, ভারতের আদর্শের কথা বলিয়াই বিপ্লববাদীদের কর্ম্ম-পন্থাকে আক্রমণ করিতেন। বিপ্লববাদীদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার পিছনে একটা উচ্চ আদর্শ ছিল। নানা বিরুদ্ধ মন্তব্যের মুখে তাহারা সেই দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিয়াই দলের কর্ম্মীদের টিঁকাইয়া রাখিত। আদর্শ যে তাহাদের অক্ষুণ্ণ আছে, তাহা তাহারাও সাব্যস্ত করিত। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মের কথা বলিয়া বিপ্লবপন্থা ছাড়িলেন তাঁহারা বিপ্লবকে আক্রমণ করিতে ধর্ম্মের উচ্চতত্ত্বের দোহাই দিয়াই এই পন্থাকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। মোট কথা মানুষ ভাল মন্দ যাহাই করুক নৈতিক যুক্তির অভাব হয় না। যাহারা বিপ্লবপন্থা ছাড়িল তাহারা যেমন আধ্যাত্মিক দোহাই দিত, যাহারা বিপ্লবপন্থায় যুক্ত হইয়া

রহিল তাহারাও ভিন্ন মতাবলম্বীদের যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিত।

অবস্থা দাঁড়াইল এই,—রাজশক্তি ইহাদের পিষিয়া মারিতে সচেষ্ট, বাহিরে তাহারা দাঁড়াইতে পারে না, এদিকে ঘরেও নহে। দেশবাসীর জ্ঞানের বাহিরে গিয়াই তাহাদের দাঁড়াইতে হইবে।—কিন্তু এমনই সময়ে আবার তাহাদের পথকে যাহারা এতদিন পথ ভাবিয়াছিল, তাহারাও বিপথ বলিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল; কেহ নীরবে গেল, কেহ বিরুদ্ধতা করিতে করিতেই গেলেন।

এদিকে দেশের কোথাও তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি নাই; তাহাদের দুঃখ কষ্টকে সহানুভূতি বা প্রশংসার দৃষ্টিতে ঘরের বা বাহিরের মা বোন, বাপ ভাই কেহই দেখিবার সুযোগ বা সময় পান নাই। পেটে যিনি ধরিয়াছেন, মা, তিনি হয়ত কাঁদেন, তাহাও নীরবে; ছেলে যে কি করিয়াছে তাহা ত' তিনিও জানেন না। 'বড় গলায়' ছেলের দুঃখের কথা ত' তিনি বলিতে পারেন না। পাড়ার অমুকে অমুকে বলিতেছে ছেলে 'ডাকাতি' করিয়াছে। মায়ের সান্ত্বনারও কিছু নাই। এ কথাটা, ব্যথার মন লইয়া বুঝিতে চাহিলে বুঝিবে বিপ্লববাদীদের মায়ের দুঃখও কেমন অসহনীয়। মা জানেন, ছেলে তাঁহার অনিন্দনীয় কিন্তু তাহাও নীরবে জানেন, নীরবে বুঝেন—বলিবার নহে। কোন পরিবারের পুরুষেরা হয়ত মাকে সান্ত্বনা দেয়; ছেলের ভালর দিকটা দেখায়; আবার অনেক পরিবারের পুরুষেরাও হয়ত মাকে ছেলের অন্যায়ের কথাই বলে, প্রশংসা একটুও নাই। মায়ের ব্যথা অবর্ণনীয়। এস্থলে বিপ্লব-

বাদীর ব্যথাও বুঝিতে হয়। বিপ্লববাদীর দুঃসহ কারাবাসে, মায়ের সান্ত্বনা ব্যাপারেও সে নিশ্চিন্ত নহে। কারণ দেশবাসী গিয়া মাকে ত' বলিবে না যে,—ছেলে তোমার দেশের জন্য দুঃখ সহিতেছে, তোমার আনন্দের দিন।* সে জানে, ছেলের দুঃখকে মায়ের গৌরবের বস্তু কেহ করিবে না। বরং 'খুনে' 'ডাকাত' বলিয়া কেহ কেহ গ্রাম্য-শত্রুতাও সাধন করিয়াছে, ব্যথা দিয়াছে। বিপ্লববাদীদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মায়েরাও দুঃখ কম সহে নাই। তবে অনেক বিপ্লববাদীর জননী, ছেলের দুঃখ-কষ্টকে নীরবেই গৌরবের বস্তু ভাবিয়াছেন। ছেলেকে ফিরিয়া পাইয়া ধরিয়া রাখিতেও চাহেন নাই, আবার যখন সে বিপ্লবপথেই যাত্রা করিয়াছে, তখনও মা, যাত্রার মঙ্গল আশীর্ব্বাদই করিয়াছেন। অবশ্য তেমন শক্ত মায়ের সংখ্যা খুবই বেশী নহে। যাহাই হউক ঘরে বাহিরের এই অবস্থা লইয়া বিপ্লববাদীরা তখন নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতেছে।

বিপ্লববাদীরা তাহাদের দলকে খাড়া রাখিতে এক প্রকার বদ্ধ-পরিকরই হইল। সশস্ত্র বিদ্রোহ, আজ হউক, কাল হউক করিতে হইবে, একথা বুঝিয়াই তাহারা দলকে অব্যাহত রাখিতে উদ্যত হইল। এই সম্পর্কে অর্থের প্রয়োজন হইলে ডাকাতি করিয়াছে, প্রকাশের সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য খুন করিয়াছে। কিন্তু সেই প্রকাশ্য বিপ্লবের দিন যে কবে আসিবে তাহা তাহারা ঠিক জানিত না। তবু একটা আশা তাহাদের ছিলই। কেমন করিয়া কি হইবে,

* যে সময়কার কথা বলিতেছি তখন এমনই ছিল দেশের অবস্থা।

নির্দ্দিষ্ট করিয়া না বলিতে পারিলেও একটা কিছু যে তাহারা করিবে, ইহাতে বিপ্লববাদীদের সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সকলে এই পথে বিপ্লব সম্ভাবনা স্বীকার করিতেন না। সেই জন্য ডাকাতি ও খুন প্রভৃতি তাঁহারা অনর্থক মনে করিতে লাগিলেন এবং স্বভাবতই কার্যাত কোন বিপ্লবচেষ্টা করেন নাই। ১৯১৪ সালে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর যে ভাবে বাংলার সকল বিপ্লবদলই কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছিল, সে ভাবে যদি পূর্ব্ব হইতেই কার্য্যক্ষেত্রে নামিত তবে অবস্থা যে আরও গুরুতর হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। একথা বলিয়া বিপ্লববাদীরাও শেষে আপশোষ করিয়াছে। যাহাই হউক এই মতভেদের সময়, বাংলার কোন কোন দল, বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও, তখনকার কার্য্যপ্রণালীকে অনুসরণ বা সমর্থন করিতে চাহে নাই। কিন্তু অনুশীলন সমিতি পূর্ব্ব পথেই চলিতে লাগিল। তবে তাহার নিজের কোন কোন বিশিষ্ট কর্ম্মীও মতভেদ হেতু দল ছাড়িলেন এবং পরে তাঁহারা বিপ্লবপন্থাকেই ছাড়িয়া দিলেন।

কিন্তু এই মতভেদ সত্ত্বেও বিপ্লববাদীরা সকলে পথ ত্যাগ করে নাই। শেষ পর্য্যন্তও তাহারা নিজেদের মত মতই পথ করিয়া লইয়াছে, পাহাড় প্রমাণ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াছে। আর যাঁহারা মত মিলাইতে পারেন নাই বলিয়া দূরে গেলেন—তাঁহারা হয় মত পরিবর্ত্তন করিয়া আবার ফিরিলেন নতুবা একেবারেই দূরে সরিয়া গেলেন। ঘরের এই মতভেদ সত্ত্বেও বিপ্লববাদীরা ঘর গুছাইতেই লাগিল। বাংলার তরুণ সম্প্রদায় বিপ্লববাদীদের দিকেই

আকৃষ্ট হইল। ইহার একটা প্রধান কারণ বিপ্লববাদীদের যুক্তি নহে, কিন্তু কর্ম্মপ্রবণতা ও ত্যাগ। অপর পক্ষের তেমন কর্ম্মপ্রবণতা ছিল না বলিয়াই দেশের যুবক, যাহারা একটা কিছু করিতে চাহে, তাহাদের কথায় আকৃষ্ট হইত না। বিপ্লববাদীরাই দেশের যুবকদের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া রাখিল। ক্রমে তাহাদের যুক্তি প্রভৃতি বাংলার যুবক সম্প্রদায়ের কাছে অপ্রতিহত হইয়া উঠিল। বলিয়াছি ইহার একমাত্র কারণ তাহাদের একান্ত আন্তরিকতা;—ভুল ভ্রান্তি সত্ত্বেও তাহাদের জীবন্ত সচল ভঙ্গী। সেই জীবন্ত চেষ্টা ছিল বলিয়াই দেশের লোক বিপ্লববাদীদের কর্ম্মশক্তিতে বিশ্বাস হারায় নাই।

বিপ্লববাদকে যুবকদের কাছে অপ্রতিহত করিতে তাহারাও চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। দেশের যাহা সম্পদ তাহা বিপ্লববাদীরা নিজেদেরই মনে করিত। প্রত্যেক বস্তুকেই তাহারা নিজের প্রয়োজনে খাটাইতে চেষ্টা করিত। কোন্ দিন কোন্ কথা, কোন্ গাথা কে কোন্ উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছে কে জানে, তবে বিপ্লববাদীরা সেই গাথাকেই নিজেদের প্রয়োজনে খাটাইয়াছে। যে কথায় তাহার মনে জোর বাঁধিবে, যে কথায় তাহার কার্য্য সমর্থন করিবে তাহা সে দেশ বিদেশের ধর্ম্মগ্রন্থ, ইতিহাস, কাব্য হইতে গ্রহণ করিয়াছে। বিপ্লব অনুষ্ঠানকে, তাহাদের প্রত্যেক কর্ম্মকে যুক্তিসহ করিতেও তাহারা ত্রুটি করে নাই—সে যুক্তি বাহিরের কাহারও কাছে দিতে না হইলেও নিজেদের মধ্যে সর্ব্বদাই দিতে হইত।

রবীন্দ্রনাথের অনেক গান বিপ্লববাদীরা তাহাদের কাজে লাগাইয়াছে। যখন দেশশুদ্ধ লোক একটা পথে চলিতেছে, তখন

যদি কেহ লক্ষ লোকের সভায় গাহে—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল্‌রে।' তবে তাহা উপভোগ্য যতই হউক, ইহার সত্য সৌন্দর্য্যটুকু ফুটিয়া উঠে না। কিন্তু বিপ্লববাদী যখন দুই চার জন বন্ধুর সঙ্গে কোনও নির্জ্জনে বসিয়া নিজেকে সত্যই একলা মনে করিয়া প্রাণের আবেগে গাহিত—গাহিতে শোনা গিয়াছে—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল্‌রে' তখন শ্রোতারা ভাবিত, কবি বুঝি এ সত্যকথা সাধনায় পাইয়াছিলেন,—আজ এ ক্ষেত্রে তাহা মূর্ত্ত দেখিলাম। তাহার পর, কোথাও স্থান পায় না, পরিচিত দ্বার রুদ্ধ, বন্ধু আজ রাষ্ট্রবিপ্লবে বা রাজদ্বারে দাঁড়াইতে প্রস্তুত নহে; যাহারা বল ভরসা, যাহারা বাহুর শক্তি, যাহারা সুদিনের দুর্দ্দিনের বন্ধু, তাহারা আজ মুখ ফিরাইয়াছে, দেশবাসী হতাশার অন্ধকারে আলো ধরে না - এই ভাবে হৃদয় পূর্ণ করিয়া যখন বিপ্লববাদী গাহিত—

> "যদি কেউ আলো না ধরে,
> ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
> দুয়ার দেয় ঘরে,
> তবে বজ্রানলে, আপন বুকের পাঁজর
> জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বল্‌রে।"

তখন বিপ্লববাদী নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিত। তাহার সেই অশ্রুজল, শ্রোতার চোখেও ধারা বহাইত। সেই ত্যাগ ও দুঃখের প্রভাবে শ্রোতা প্রভাবান্বিত হইত। সাহসী কর্ম্মী ও ত্যাগীর

চোখের জল বড় দুঃখের—সহানুভূতিতে শ্রোতার হৃদয় নূতন ভঙ্গীতে নাচিয়া উঠিত।

কবি যে উদ্দেশ্যেই লিখুন, বিপ্লববাদী তাহার খোঁজ রাখিত না। সে তাহার নিজ প্রয়োজনেই তাহা ব্যবহার করিত।

যখন একে একে অনেকেই দল ছাড়িল, বিপ্লববাদীরা তখন গাহিত—

"যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
আমি তোমায় ছাড়ব না মা।"

এমন করিয়াই বিপ্লববাদীরা বল পাইয়াছে, ভরসা পাইয়াছে। বাহির হইতে কোন বল কেহ দেয় নাই, তাই এমন করিয়াই সে কাব্য গাথা, সাহিত্য ধর্ম্ম হইতে নিজেদের সান্ত্বনা, সহায়, শক্তি গ্রহণ করিয়াছে।

যখন তাহার কোনও কিছু বলিবার সাধ্য নাই, কোথাও দাঁড়াইয়া নিজকে সমর্থন করিবার উপায় নাই তখন সে সান্ত্বনাস্বরূপে ভাবিয়াছে,—

"তোরা নেই বা কথা বল্লি,
দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যিখানে
নেই জাগালি পল্লী।
না হয় চুপে চাপেই চল্লি।"

সেই 'চুপে চাপের' পথেই বিপ্লববাদীরা চলিতে লাগিল, সহকর্ম্মীদের বিচ্ছেদেও ভরসা ছাড়িল না। কবির কথাই মনে করিল, —'আপন জনে ছাড়বে তোরে, তা ব'লে ভাবনা করা চল্‌বে না।'

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সমাজ ও সাহিত্যে বিশেষত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়াছি যে ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি বিপ্লববাদীদের কাছে একটা স্বতন্ত্ররূপে দেখা দিয়াছিল। এখানে আমরা সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া পরের পরিচ্ছেদে বিপ্লববাদীদের কার্য্যাবলীর পরিচয় দিব।

সকল দেশেই এমন কতগুলি লোক জন্মায় যাহারা দেশের ধূলিকণাকে সত্যই সোণার কণা মনে করে। দেশের আকাশ বাতাস, চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ তারা,—দেশের বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী, পাহাড় নদী তাহাদের প্রাণে আনন্দের ঢেউ তোলে; দেশের প্রতি বস্তু যেন ইহাদের বুকের রক্ত। দেশের আচার ব্যবহার, বেশ ভূষা, ভাষা ইহাদের বড় আদরের ও দরদের। দেশের কোনও জিনিষের উপরই, তাহা যেমনই হউক, কোন অনাদর কোন অশ্রদ্ধা ইহারা সহিতে পারে না। যাহার মূল্য কাণাকড়িও নহে তাহাও শুধু দেশের বস্তু বলিয়াই অমূল্য—তাহার প্রতি অনাদর করিতে বুকে ব্যথা বাজে। এই প্রকৃতির লোক আমাদের দেশেও ছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তার উদ্বোধন ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দের ভাব-প্রভাব যে অনেকখানি

ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। সেই নব জাতীয়তার প্রভাবে, জাতির আচার, ব্যবহার, সমাজ, ধর্ম্ম সকলের উপরই একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠে।

ইংরাজী শিক্ষা, সভ্যতা ও স্বাধীনতার প্রভাবে পূর্ব্বে দেশের অনেক জিনিষকেই যাহারা ভাল চক্ষে দেখে নাই, এখন 'স্বদেশী'র প্রভাবে দেশের সকল জিনিষকেই তাহারা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিল। অবশ্য সেই নব অনুরাগে বাড়াবাড়িও কিছু ছিল। এদিকে স্বদেশীর সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রচলিত ধর্ম্মে শ্রদ্ধা করাও স্বদেশধর্ম্ম বলিয়াই গণ্য হইল। তাই আমরা দেখি, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে তেমন বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁহারাও স্বদেশী আন্দোলনের পর হিন্দু বলিয়াই পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ সত্যই আচার-ব্যবহারেও হিন্দু হইলেন; কেহ আবার সাধারণ হিন্দু হইতেও বেশী গোঁড়া হইলেন! এই ধর্ম্মভাবের সঙ্গে যে অনেকটা স্বাদেশিকতা জড়িত ছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। 'যে ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার আমার দেশের কোটি কোটি লোক স্বীকার করিয়া লইয়াছে, আমিও তাহাকে স্বীকার করিব', ইহাই যেন তাঁহাদের ভাব। স্বদেশীযুগের অনেক নেতা জাতীয়তাকে ধর্ম্মের সঙ্গে অভেদ্য করিয়া বুঝিলেন ও বুঝাইলেন। এই সমস্ত ভাবের প্রভাবে বিপ্লব-বাদীদের মধ্যেও কতকটা ধর্ম্মভাব প্রবেশ করিয়াছিল। তবে বিপ্লববাদীদের ধর্ম্মবোধের সঙ্গে দেশের প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের বিস্তর তফাৎ ছিল। বিপ্লববাদীরা স্বাদেশিকতার খাতিরে যেমন কতকটা গোঁড়া ছিলেন তেমনি দেশের একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া তাঁহারা

অনুদারতাকেও সর্ব্বদাই বর্জ্জন করিয়াছেন। দেশের হিতের জন্ম তাঁহারা ব্যক্তিগত আভিজাত্য বা বংশের সংস্কার, ব্যক্তিগত সামাজিক সুখ-সুবিধা, অনায়াসে বর্জ্জন করিয়া চলিয়াছেন। সেই জন্মই তাঁহাদের চালচলনের সঙ্গে একদিকে যেমন গোঁড়া হিন্দুর খাপ খাইত না, তেমনি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গেও খাপ খাইত না। যে বিপ্লববাদী মাথায় টিকি রাখিয়াছে,—নিরামিষভোজী, সে-ই আবার অবিচলিত চিত্তে, (ব্রাহ্মণ হইয়াও) হিন্দুসমাজ যাহাদের অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের অন্ন গ্রহণ করিয়াছে। প্রয়োজন হইলে যে-কোনও জাতের যে-কোন রান্না খাইয়াছে, সেজন্ম আপশোষও করে নাই, প্রায়শ্চিত্তও করে নাই। অথচ মজা এই, তাহারা হিন্দুসমাজের বুকের উপরে এ সকল কাজ করিলেও হিন্দুরা তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ তেমন করে নাই, বরং যুবকেরা সেই ভাবে কতকটা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। ইহাদের একান্ত দেশপ্রীতিতে দেশের লোকের বিশ্বাস ছিল। দেশবাসী তাহাদের আপন জন মনে করিত বলিয়াই তাহারা সমাজের প্রচলিত নিয়মকে অনেক সময়ে উপেক্ষা করিয়া চলিলেও তাহাদের সঙ্গে দেশবাসীর বড় বিরোধ বাধে নাই। তাহার কারণ দেশের সমগ্র জিনিষের উপর তাহাদের অকৃত্রিম ভালবাসাকে কেহই সন্দেহ করিত না।

হিন্দুর ছুঁৎমার্গ বা জাতিভেদ বিপ্লববাদীদের কাছে আমল পাইত না। তবে সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্য লইয়া বা সমাজকে, 'অন্ধকার হইতে আলোকে' টানিয়া আনিবার জন্ম তাহারা জাতিভেদ বা ছুঁৎমার্গ পরিহার করে নাই। বিপ্লব-জীবনের প্রয়োজনে

ও দেশাত্মবোধের স্বাভাবিক গতিতে যেখানে যাহা প্রয়োজন তাহারা করিয়া গিয়াছে। একান্ত স্বাদেশিকতার ফলে তাহারা যেমন গোঁড়া ছিল, আবার ভারতবর্ষকে দুনিয়ার সঙ্গে সমান তালে চলিবার যোগ্য করিয়া তুলিতে তেমনি অসম্ভব রকম উদার ছিল। সেক্ষেত্রে কোনও শাস্ত্রের দোহাই, ধর্ম্মের দোহাই তাহাদের বিন্দুমাত্রও দমাইতে পারে নাই।

মানুষ যাহা মনে প্রাণে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাকে নিরাপদ করিতে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর অবিরোধী করিতে সে ব্যস্ত হয় ধর্ম্মই বল, সাহিত্যই বল, আর সমাজই বপ্লববাদীরাও তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত বিপ্লবের রোধী করিয়াই তাহা বুঝিতে ও বুঝাইতে চাহিত। গীতা, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত বিপ্লববাদীরা একটু অন্যভাবেই বুঝিয়াছে। মহাভারতের আপদ্ধর্ম্ম, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয় রামকে আহ্বান, তাহাদের কাছে নূতন ধর্ম্মের ইঙ্গিত দিত। রবীন্দ্রনাথের একটি গান আছে,—'লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া!' কবি কি উদ্দেশ্যে গানটি লিখিয়াছেন কবিই বলিতে পারেন, কিন্তু বিপ্লববাদীরা সেই গানের মধ্যেও তাহাদের কথাই শুনিল; অনেকে হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, কিন্তু কোন কোন বিপ্লববাদীর মুখে ব্যাখ্যা শুনিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথ গানটি লিখিয়াছিলেন নবীন বাংলার এই নূতন পথের যাত্রাকে লক্ষ্য করিয়া।

এমনটা দেশে আর হয় নাই, একেবারেই নূতন, তাই কবি লিখিয়াছেন, 'দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।'

তরুণ বাংলার এই নব অভিযানে কবিও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। এ নব ভাব, কোথা হইতে কোন্ সুদূর সাগর পার হইতে কে আনিল—কবিরও ইচ্ছা যায়, কূল ছাড়িয়া এই নব অভিযানে যোগ দিতে।—

"কোন্ সাগরের পার হ'তে আনে
কোন্ সুদূরের ধন।
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া।"

তরুণ বাংলার উপর বড় বিপদ, রুদ্র রাজশক্তির গর্জ্জন ও নিপীড়ন.—বিপদ-মেঘ আসিয়া সব ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; তবে ভরসা, তরুণ বাংলা মরে না, মধ্যে মধ্যে তাহার জীবনীশক্তি প্রকাশ পাইতেছে।—

"পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল
গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।"

কবি আজ ভাবিতেছেন, কোন্ বিধাতা তরুণ বাংলাকে কোন্ পথে লইয়া যাইবে, কোন্ সুরে আজ যন্ত্র বাঁধিয়া তাঁহাকে কোন নূতন সুরে গান গাওয়াইবে?

"ওগো কাণ্ডারী, কেগো তুমি, কার
হাসিকান্নার ধন।
ভেবে মরে মোর মন
কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র
কি মন্ত্র হবে গাওয়া ॥"

দেশের কাব্য, সাহিত্য, সকলই তাহারা তাহাদের বিপ্লবের দিক হইতেই বুঝিতে চাহিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানের বিকৃত অর্থ দেখিয়া হয়ত হাসিবেন, কিন্তু বিপ্লববাদীরা তাহাদের প্রয়োজনে এমন করিয়াই অনেক জিনিষ বুঝিয়াছে।—কেইবা এমন করিয়া না বুঝে?—একই ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে বিরুদ্ধবাদী উভয়েই উভয়ের যুক্তিই খণ্ডন করে না কি?

বিবেকানন্দ, ভূদেব ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনায় তাহারা জাতীয়তার সন্ধান বিশেষ করিয়া পাইত। যে বিপ্লববাদী লেখা-পড়া তেমন জানে না—সেও দেশের অনেকখানি ইতিহাস, দেশের অনেকখানি সাধনার কথা ও বিদেশের অনেক বিপ্লবের খবর রাখিত। বিপ্লববাদীদের চিন্তাধারার সহিত তাহারা সাহিত্য ও আলোচনার ভিতর দিয়া যুক্ত হইয়াছিল। এ সব বিষয়ে তাহাদের শিক্ষা সাধারণ শিক্ষিত লোক হইতে বেশী ছিল। তবে পল্লবগ্রাহিতা প্রভৃতি দোষ যে ছিল না তাহা নহে। সাধারণ বিপ্লববাদীর পুস্তকসংগ্রহ-ব্যাপারে সাধারণত দেশ বিদেশের ইতিহাস, বিপ্লববাদীদের জীবনী, বিপ্লব-সাহিত্য, জাতীয় ভাবোদ্দীপক গ্রন্থ, যে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণী সংক্রান্ত পুস্তক,

কর্ম্মী ও ত্যাগীদের জীবনী, প্রচুর ধর্ম্মগ্রন্থ স্থান পাইত। একপাশে গীতা উপনিষৎ অপর পাশে রুষ-বিপ্লবের ইতিহাস!—উপন্যাস, গল্পের বই, কবিতাপুস্তক খুবই কম থাকিত। তবে যে উপন্যাসে দেশের জন্য লড়াইয়ের কথা থাকিত তাহার কথা আলাদা। প্রেমকাহিনীমূলক উপন্যাস 'আর্ট' হিসাবে মূল্যবান হইলেও সাধারণ বিপ্লববাদীরা তাহার কোন মূল্য দিত না।

মানুষ যখন স্বার্থত্যাগ করে,—ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, নাম-যশ, ভয়-ভাবনা যখন মানুষ ত্যাগ করিতে পারে তখন সমাজ-বিষয়ে, ধর্ম্ম-বিষয়ে ও রাষ্ট্র-ব্যাপারে তাহার সিদ্ধান্ত অনেকটা অভ্রান্ত হয়। মানুষ অনেক সময় সত্য যে কি তাহা বুঝে,—সমাজের নিয়মপ্রণালী কেমন হওয়া সঙ্গত তাহাও বুঝে—কিন্তু স্বার্থ ও সংস্কারের খাতিরে যাহা বুঝে তাহা করে না। ধর্ম্ম-ব্যাপারেও তাই।—'জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।' নির্ম্মমভাবে সকল ছাড়িয়া একেবারে সর্ব্বপ্রকারে রিক্ত হইয়াই তবে মানুষ সত্যকে পায়। রাজনীতি নিয়া যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহারাও এমন একটা জায়গায় আসেন—যখন সত্যকে অদূরে দেখিয়াও প্রভাব-প্রতিপত্তি, বাধা-বিপত্তি, নাম-যশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে একেবারে নির্ম্মমভাবে ছাড়িয়া সত্যকে স্বীকার করিতে পারেন না। কেহ নীরবে থাকেন, আবার তাঁহার কাছেই সকলকে ফিরাইয়া আনিতে চাহেন। সমাজেও কত লোক কত উদারতার কথা বলেন, কিন্তু তাঁহারাও এমন একটা জায়গায় আসিয়া

পড়েন যখন, উদারতাকে সত্যকে মানিয়া নিলে পূর্ব্ব অভ্যস্ত অনেক সুখ-সুবিধা ছাড়িয়া অনেকখানি দুঃখকে স্বীকার করিতে হয়। তাই সত্যকে ছোট করিয়া খণ্ড করিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে চাহেন। তখন বুদ্ধি দিয়া অন্তরের ফাঁকিকে ঢাকিয়া রাখিয়া বিবেককে তখনকার মত ধামাচাপা দেন। ধর্ম্ম-ব্যাপারেও তাই সত্যস্বরূপকে ভরসা করিয়া অনেকেই বুঝিতে চাহেন না—কারণ সেক্ষেত্রে অনেক পাওনা ছাড়িতে হয়—দুঃখের অনেক দেনা মাথায় করিতে হয়। 'জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই ছাড়িতে গেলে ব্যথা বাজে!' ব্যথা বাজে না কার?—যে খাপখোলা তলোয়ার, তার! বিপ্লববাদীদের মধ্যে এমনি ধারার খাপ-খোলা তলোয়ার কতটি ছিল বলিয়াই রাজনীতি ও সমাজ-ব্যাপারে অনেকখানি সত্যকথা তাহারা বলিয়াছে ও বুঝিয়াছে। কোনও রকম স্বার্থের খাতিরে সত্যকে তাহারা খণ্ড করিয়া দেখিতে বাধ্য হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সনাতন ধর্ম্মের উদ্ধারের কথা গোড়ায় কোন কোন বিপ্লববাদীর মুখে শুনিয়াছি। সনাতন ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের কথাও শুনা গিয়াছে। এমন কি স্বদেশী আন্দোলনের সময় অনেক গোঁড়া 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত' এই সনাতন ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের কথায় এই বিপ্লবের সংবাদে উৎফুল্ল হইয়াছেন। সনাতন ধর্ম্মের সঙ্গে গোটা ভারতের জাতীয়তাকে কেমন করিয়া খাপ খাওয়ান যায় বুঝি না। তবে এমনি ধারার কতকটা অস্পষ্ট জাতীয়তার কথা বিপ্লব-বাদীদের কাহার কাহার মুখে সময় সময় শুনা গিয়াছে।

চরিত্রটি নির্ম্মল রাখা বিপ্লববাদীদের কাছে অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য ছিল। কাহারও চরিত্রদোষ প্রমাণিত হইলে বিপ্লবদলে সে স্থান পাইত না। এমন কি নৈতিক পতনের জন্ম বিপ্লববাদীরা তাহাদের দলের লোকের উপর সাংঘাতিক শাস্তিবিধান করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই। "In January 1917, a revolutionary, was murdered by his comrades at Serajgunj......on a charge of immorality."—Sedition Committees Report. অর্থ—'১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাসে সিরাজগঞ্জে একজন বিপ্লববাদীকে দুর্নীতির অপরাধে তাহার সহকর্ম্মীরা হত্যা করে।'—সিডিশন কমিটির রিপোর্ট।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কাজের পরিচয়

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বিপ্লববাদীদের মতভেদের কথা বলিয়াছি। অনেকে যে ছাড়িয়া গেল, সে সকল কথাও বলিয়াছি। যাহারা রহিল তাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইল। ক্রমে গোপনতার বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। শুধু পুলিশ নহে, যাহারা পুরাতন বন্ধু, কিন্তু ছাড়িয়া গিয়াছে—তাহাদের কাছ হইতেও বিপ্লববাদীরা সব গোপন করিয়াই চলিতে লাগিল। বিশেষ ব্যক্তির উপর বিশেষ ভার অর্পিত হইল। দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। যে জেলায় যে ভারপ্রাপ্ত সেই ঐ জেলার জন্য দায়ী। অবশ্য কোনও গুরুতর কার্য্য সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্রের অনুমতি না হইলে চলিত না; যাহার যাহা ইচ্ছা করিবার উপায় নাই, মীমাংসা প্রধান কেন্দ্রেই হইত। কোন কোন দলে হয়ত একজন নেতা আছেন, তিনি উপযুক্ত সভ্যদের ডাকিয়া কর্ত্তব্য মীমাংসা করেন। আবার এমন দলও ছিল—যথা অনুশীলন—যেখানে একজন কোন ব্যক্তি নেতৃত্ব করিত না। ১৯১০ সাল হইতে কোন ব্যক্তিবিশেষ সেখানে নেতা ছিলেন না। কোন কমিটিও সেখানে ছিল না। কিন্তু বিশিষ্ট কর্ম্মীদের মধ্যে এমনি একটা জমাট ভাব ছিল যে, কে নেতা

এ প্রশ্ন কখনও উঠে নাই—প্রত্যেকটী সমস্যা নিজেরা পরামর্শ করিয়া—ভোটের দ্বারা নহে—মীমাংসা করিয়া ফেলিয়াছে। কর্ম্মীদের যোগ্যতাই সেখানে স্বভাবত নেতৃত্ব করিয়াছে—কোন ধরা বাঁধা নিয়ম সেখানে কাজ করে নাই। স্বার্থলেশহীন, নাম যশ আকাঙ্ক্ষা-হীন এই সমস্ত বিশিষ্ট কর্ম্মীদের কে যে কোন্ বিষয়ে যোগ্যতর তাহা কোন নেতার মীমাংসার উপর নির্ভর করিত না—প্রত্যেকেই নিজের মনেই তাহা বুঝিতে পারিত। পরস্পরের প্রতি সে বিশ্বাস ও ভালবাসা এমনি অদ্ভুত ছিল যে, কোন দিন মতভেদও হয় নাই. প্রভুত্বের কল্পনাও কাহারও মনে আসে নাই। কে বড়. কে ছোট, এ ভাব কর্ম্মীদের মনেও স্থান পায় নাই—সমস্ত কাজের ভার জন কয়েক বিশিষ্ট কর্ম্মীর মধ্যেই স্বভাবত আসিয়াছিল; কবে কোন্ দিন কোন্ সভায় কোন্ ভোটের জোরে ইহারা এই নেতৃত্বের বা গুরুতর দায়িত্বের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিল—কেহ জানে না। অথচ ডিসিপ্লিন ছিল যথেষ্ট।

১৯১১ সালের কথা বলিতেছি। বিপ্লববাদীরা তাহাদের কার্য্যপ্রণালীকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে চাহে। একদিনের কথা বলি। রাত্রি অধিক হইয়াছে। একটা নির্জ্জন মাঠে দুটী লোক বসিয়া আছে। নিঃশব্দে আর একজন একটু এদিক ওদিক চাহিয়া আসিল। মিনিট পাঁচ সাতের মধ্যে প্রায় দশ জন লোক সেখানে আসিয়া জড় হইল। সকলেই পরিচিত। বাহিরের লোকের প্রতি দৃষ্টি

রাখিবার জন্য দুই জন রহিল। ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা লইয়া আলোচনা চলিল। কাহাকে কোন্ ভার দিতে হইবে তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইল। কোথায় কে বসিবে, আর কোথায় কাহার দ্বারা কোন্ সহায়তা মিলিবে, তাহার আলোচনা চলিল। কে ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে, কাহাকে ঘর ছাড়ান যায় তাহারও আলোচনা হইল। কোন্ কোন্ কর্ম্মীর দ্বারা কোন্ কোন কাজ হইতে পারে, কাহার কি ক্ষমতা, কাহার উপর কতখানি ত্যাগের আশা করা যায়—সকলই আলোচিত হইল। বাংলার কোন্ গ্রামের কোন্ স্কুলের কোন্ ছেলেটী কেমন ধারার সে খবরও তাহারা লইল। তর্ক-বিতর্ক নাই, সকলেই সকলকে চিনে, বুঝে—সকলের ত্যাগেই সকলের দৃঢ় বিশ্বাস, প্রত্যেকে প্রত্যেককে জানে ত্যাগী, নির্ভীক, আদর্শলাভে বদ্ধপরিকর —প্রার্থিত বস্তুর জন্য যে-কোন দুঃখ গ্রহণে সম্মত—যে-কোন কর্ম্মে তৎপর। সকলেই সকলকে ভালবাসে। ভাই আত্মীয়-স্বজন কেহই তেমন প্রিয় নহে—এরা সকলেই পরস্পরের প্রিয়তম সুহৃদ, কাহাকেও কিছু অদেয় নাই—একান্তই বন্ধু। কিন্তু তবু একটুও অস্বাভাবিক আকর্ষণ নাই। এত যে বন্ধু, এত যে প্রিয়, সেও যদি ঐপথ ছাড়ে, বা একটু চরিত্রে দাগ লাগে, একটু লোভ, একটু স্বার্থের পরিচয় মিলে তখে প্রিয়তমের উপর প্রীতি চলিয়া যায়, কোমল হৃদয়গুলি তখনই বজ্রের মত কঠোর হয়। এক মুহূর্ত্তে বন্ধুকে ছাড়িয়া দেয়—কিন্তু তবু আপশোষ করে না, আশাহত হয় না,—একান্ত আত্মবিশ্বাসে আবার চলিতে থাকে। এমন দৃঢ় বিশ্বাসী, কর্ম্মী ত্যাগী কতকগুলি লোকই বিপ্লব-দলকে নানা

বাধাবিঘ্ন, বিরুদ্ধতার হাত হইতে বাঁচাইয়া একেবারে শেষ সময় পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

যাহাই হউক এমনি নির্জ্জনে কর্ম্মী-সম্মিলনে কোথাও নূতন কর্ম্মীকে প্রতিশ্রুতি করান হইত। সে প্রতিশ্রুতির মর্ম্ম মাত্র আমরা লিপিবদ্ধ করিলাম।—

> সমিতি হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইব না। চরিত্র নির্ম্মলও পবিত্র রাখিব। যতদিন পর্য্যন্ত দেশ মুক্ত না হয়, ততদিন সুখভোগ হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখিব। দেশের জন্য সর্ব্বপ্রকারের ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইব। মাদকদ্রব্য সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিব। দেবতার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিব না—ত্যাগ করিতে পশ্চাৎপদ হইব না। ঘৃণা, লজ্জা, ভয় ত্যাগ করিয়া সমিতির মঙ্গলের জন্য কাজ করিব।—

সর্ব্বত্র একই রকমের প্রতিজ্ঞাপত্র ছিল না। প্রথম অবস্থার প্রকাশ্যে যে প্রতিজ্ঞা করান হইত পরে সময় সময় তাহা হইতে ভিন্নতর প্রতিজ্ঞাও করান হইয়াছে—তবে মূলত ভাব প্রায় একই। এই ভাবের প্রতিজ্ঞা করার সার্থকতা সম্বন্ধে বিপ্লব-বাদীদের মধ্যেও ভিন্ন মত বর্ত্তমান ছিল। কেহ কেহ প্রতিজ্ঞা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন না। আবার কেহ কেহ প্রতিজ্ঞা একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার মনে করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে যে জমকাল প্রতিজ্ঞার নমুনা দেখাইয়াছেন, বিপ্লব-বাদীরাও যে প্রতিজ্ঞা-ব্যাপারে তাহারই কতকটা অনুকরণ করিয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। তাহা এই—গোড়ায় বিপ্লববাদীদের চেষ্টাকে ঠিক বিপ্লবপ্রচেষ্টা (revolution) বলা যায় না। তখন একটা ভাব ছিল, 'any how to render the Government impossible.' অর্থাৎ 'যে প্রকারেই হউক গবর্ণমেণ্ট অসম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে।' একদল লোক যেমন বয়কট প্রভৃতি দ্বারা সে চেষ্টা করিত, তেমনি বিপ্লববাদীরা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি দ্বারা সে চেষ্টা করিত। এই সমস্ত ভাব হইতেই লাটসাহেবের ট্রেণ উড়ান ও বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীর জীবনের উপর ষড়যন্ত্র চলিত। একটা ভীতিসঞ্চারও যেমন উদ্দেশ্য ছিল, দেশবাসীর মধ্যে রাজশক্তিকে উপেক্ষার প্রবৃত্তি আনাও তেমনই অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কোথাও বা অপর কোন বিশেষ উদ্দেশ্য থাকিত। যাহাই হউক, এ ভাব স্থায়ী হইল না। যাহারা দেশকে মুক্ত করিবে বলিয়া ঘর ছাড়িয়াছে, তাহারা কেবল মানুষ মারিয়া বা সেই চেষ্টায় ঘুরিয়া ত আনন্দ পায় না। তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে ইহা যে মোটেই সহায়ক নহে তাহা দুই দিনেই তাহারা বুঝিল। একজনকে মারিলে দশজন সেখানে যাইবে। এ পন্থায় তাহাদের অভীষ্টলাভ হইবে না, ইহা বুঝিতে তাহাদের বিলম্ব হয় নাই। তবু কোথাও কোথাও বাহিরে এ সমস্ত demonstration চলিয়াছে এই জন্য যে বিপ্লববাদীদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেন সাধারণ দেশবাসীর সন্দেহ না জন্মে। কেবল অরাজকতা সৃষ্টি দ্বারা যে সফলকাম হওয়া যাইবে না, বিপ্লববাদীরা একথা বুঝিয়া আরও কতকটা দায়িত্বের দিক্ হইতে বিপ্লব-কথা ভাবিতে আরম্ভ করিল।

এই পথের বিঘ্নস্বরূপ যদি কেহ দাঁড়ায় তবেই তাহাকে সরাইতে হইবে, নতুবা নহে—ইহাই তাহাদের শেষ সিদ্ধান্ত। কিন্তু প্রবল, সঙ্ঘবদ্ধ রাজশক্তির প্রতিবন্ধকতায় বিপ্লববাদীরা কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট পন্থা ধরিয়া বরাবর চলিতে পারে নাই—নানা অবস্থায় পড়িয়া তাহা পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে। তবে তাহাদের এই পথের বিঘ্ন দূর করিতেই বিপ্লববাদীরা প্রায় সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়াছে। আত্মরক্ষার জন্য একটা অনুষ্ঠান করিয়া এমন ভাবেই জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিয়াছে যে সে আত্মরক্ষা আরও জটিল ও আরও গুরুতর হইয়াছে। এমনি আত্মরক্ষার পর আত্মরক্ষা করিয়াই খুনের জন্য ডাকাতি ও ডাকাতির জন্য খুন করিতে হইয়াছে। যাহাই হউক, 'আত্মরক্ষার' ব্যাপারেও হিসাব নিকাশের ব্যবস্থা হইল। অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজন না হইলে, এ সমস্ত ব্যাপারে হাত না দেওয়াই সাব্যস্ত হইল।

এই সময় হইতেই anarchism অরাজকতা ছাড়িয়া বিপ্লববাদীরা খাঁটা বিপ্লববাদী হইয়া পড়িয়াছিল। কেমন করিয়া বিপ্লবানুষ্ঠান দ্বারা রাজশক্তির পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিবে, সে সমস্ত বিষয়ে, কেবল আলোচনা নহে, কার্য্যত চেষ্টা চলিতে লাগিল। বিপ্লববাদীরা যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহাতে একটা অরাজকতা দেশে আনা যায় মাত্র, কিন্তু তাহা যে প্রবল প্রতাপান্বিত সুসংবদ্ধ ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তির কাছে ছেলেখেলা—তাহা তাহারা বুঝিয়াছিল। তাহাদের ভরসা এক দেশীয় সৈন্য আর বিদেশের সাহায্য। তখনও যুদ্ধ বাধিয়া উঠে নাই।

সুতরাং বিদেশের সাহায্য অর্থাৎ জার্ম্মেণীর সাহায্য যেমন শেষে হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছিল তেমন তখন হয় নাই। তবে বিদেশে কিছু করিবার চেষ্টা তখন হইতেই বাঙালী বিপ্লবীদের মনে ছিল। বিদেশে বাংলার বিপ্লবদলের লোক প্রেরিত হইতেছিল। অবশ্য ইতিপূর্ব্বেও বিদেশে ভারতীয় বিপ্লববাদীরা ছিল। কিন্তু তাহারা দেশের সঙ্গে যুক্ত না থাকার ফলে এবং বিদেশে স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে থাকায় দেশের প্রকৃত অবস্থা কিছু বুঝিত না। যাহাই হউক, ভারতের যে সকল জাতি হইতে প্রধানত দেশীয় সৈন্য সংগৃহীত হয় তাহাদের দিকে বাংলার বিপ্লববাদীদের দৃষ্টি গেল। এই দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লববাদীরা কতটা কাজ করিয়াছিল তাহা পরে জানা যাইবে। ১৯১৪ সালে দেশীয় সৈন্য ও বিদেশী সাহায্য তাহারা কি ভাবে লাভ করে তাহা যথাস্থানে আমরা বলিব। এখানে শুধু এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বিপ্লববাদীরা এখন হইতেই সেদিকে নজর রাখিল। আর নিজেরা দলের প্রভাব বৃদ্ধি করিতে men, money and ammunition—মানুষ, টাকা ও হাতিয়ার সংগ্রহে মন দিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাহাদের দলের demonstration দ্বারা বা বাহিরের কার্য্য দ্বারা দেশের লোকের মন এমন করিয়া তোলা যে, যদি প্রয়োজন হয়, বিপ্লবের মুখে তাহারা যেন দাঁড়াইতে পারে। বিপ্লববাদীরা এই বিশ্বাসও করিত যে, সে সময় অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করিয়া হাতে দিতে পারিলে অনেক সাধারণ লোকও বিপ্লবে যোগ দিবে। তবে বিপ্লবকে আস্তে আস্তে গড়িয়া তুলিতে যে কার্য্যকুশলতা, ত্যাগ ও তিলে

তিলে দুঃখভোগের দরকার, তাহা কতটি লোকের থাকা চাই —বিপ্লববাদীরা সাধারণত তেমন লোক সংগ্রহেই মন দিয়াছিল; তেমন দল গড়িতে যে অর্থের প্রয়োজন, তেমন অর্থ, যে-ভাবেই হউক সংগ্রহ করিতেছিল। সেই পথে যাহারা অন্তরায় হইত, তাহাদের নির্ম্মমভাবে সরাইয়া দিয়াছে।

স্বর্গীয়া তরলা সুন্দরী বসুর
স্মৃতি সম্মানার্থ
পুস্তক সংগ্রহ
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বসু।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

গোপন ও অখ্যাত জীবন

১৯১১ সাল হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত বিপ্লববাদীরা দলবৃদ্ধি, অর্থ-সংগ্রহ ও যথাসম্ভব অস্ত্রসংগ্রহ করিয়া গিয়াছে। ডাকাতি ও খুনের ব্যাপারেও ক্রমেই বিপ্লববাদীদের সাহসিকতা প্রকাশ পাইতেছিল। পুলিশের চক্ষু এড়াইয়া কাজ করিতে হইত বলিয়া এই সময়টায় অনেক বিপ্লববাদীই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িতেছিল। যে আজই মাত্র জেল খাটিয়া মুক্ত হইল সেও অমনি বাহির হইয়াই আত্মগোপন করিয়া চলিতে লাগিল।

ঘর-বাড়ীর মায়া অনেকেরই ছিল না। কোন দিকের কোন হিসাবই ইহারা রাখিতে চাহিত না। জেল খাটিয়া বাহির হইয়াছে—বাড়ী ঘরে, বন্ধু বান্ধব মা বাপের কাছে দুই দিন থাকা খুবই স্বাভাবিক—কিন্তু ইহারা ছিল কতকটা সৃষ্টিছাড়া। একটা দৃষ্টান্ত দিব। দুই জন বিপ্লববাদী কয় বৎসর জেল খাটিয়া আজ বাহির হইল। জেলের ফটক খুলিয়া গেল। তাহারা বাহির হইয়া একটু এদিক ওদিক চাহিয়া সোজা হাঁটিতে লাগল। বলা বাহুল্য, কোন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, বা জনসাধারণ সেখানে উপস্থিত ছিল না। দুইজনে গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে চলিল।

"কোথায় যাবে হে ?"

"যাব কোথায় ? হ— বাবুর বাসায় যাব না, জায়গা দেবে না। বি—দের মেসেও যাব না, অনর্থক ছেলেগুলো 'দাগী' হবে।"

"তা' একবার কোথাও উঠে, খোঁজ-খবরটা নিতে হবে ত। চল স—দের বাসায় যাওয়া যাক্, সেখানে গেলেই খোঁজ-খবর কিছু পাওয়া যাবে, আর ওখানে পুলিশের তেমন ভয়ও নাই।"—তাহাই হইল।

* * *

সহরের কোন এক বাটির এক প্রকোষ্ঠে এই দুইজন জেল-মুক্ত বিপ্লববাদী আরও দুই তিন জন বিপ্লববাদীর সঙ্গে আলাপ করিতেছে। ইতিমধ্যেই তাহাদের ভবিষ্যতের কাজ ঠিক হইয়া গেল। ইহার মধ্যে একজন আর বাড়ী যাইতে চাহে না। সে বলিল, "আমি বাড়ী গেলে সুবিধে হবে না, বাড়ীরলোক বড় অস্থির ক'রবে, বিয়ের চাপও হয়ত দেবে। কোথাও যেতেও দেবে না। আর পুলিশও চোখে চোখে রাখবে। আমার ইচ্ছা এখান থেকেই গা-ঢাকা দিই, এই কিন্তু অবসর। কারণ, আজও দেখলাম পুলিশ পেছনে লাগে নাই। ভেবেছে, বাড়ী ত যাবেই সেখান থেকে খোঁজ নেওয়া আরম্ভ করা যাবে। আর দেশের যা অবস্থা হয়েছে, তাতে প্রকাশ্যে থেকে কোনও কাজ করা ত' এক রকম অসম্ভবই।"

বন্ধুরা বলিলেন—না, একবার বাড়ী যাও। (বুড়া মা যে আছেন, তাহা ইঙ্গিতে বলা হইল।)

সদ্য জেল-মুক্ত ব্যক্তি হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা মার সঙ্গে দেখা এক সময় হবে।' পরে তাহাই ঠিক হইল। অপর ব্যক্তি আপাতত বাড়ীতেই গেল। প্রকাশ্যে থাকিয়াই গুপ্ত পন্থার পথিকদের সঙ্গী হইয়া রহিল।

যে সময়কার কথা বলিতেছি তখন বিপ্লববাদীদের মধ্যে এ রকম বাড়ী ঘর ছাড়িয়া একেবারে ভিন্ন নামে চলাফেরা করিয়া অনেকে থাকিত। যাহারা পুলিশের পরিচিত তাহারা ও যাহারা কোন মামলার absconder (ফেরারী) তাহারাও আত্মগোপন করিত। আবার বিশেষভাবে কাজের সুবিধা হইবে বলিয়া একেবারে পুলিশের নজরে পড়ে নাই, এমন নূতন লোককেও ঘর হইতে বাহির করা হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তখন বিপ্লববাদ একেবারেই গুপ্ত ধারায় চলিয়াছিল। সুতরাং এ সমস্ত 'অচিহ্নিত' (unmarked) লোকই কাজের হইত বেশী। কারণ দাগীদের বেশী বাহিরে আসিতে হইলে বিপদের সম্ভাবনা; ইহাদের পক্ষে সে সম্ভাবনা কম। প্রকৃত-পক্ষে এই ঘর-ছাড়া লোকগুলিই ছিল বিপ্লববাদীদের কর্ম্মী—আর যাহারা ঘরে, জানা শুনা ভাবে থাকিত, তাহারা ছিল সহায়। বিপ্লববাদীরা সাধারণের প্রশংসা চাহিত না বলিয়া নিন্দাকেও গ্রাহ্য করে নাই। গোপনতাকেই আঁকড়াইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু বিপ্লববাদীদের মধ্যে ডাকাতি করা লইয়া সংশয় জাগিয়া উঠিল। দেশের অর্থ এমন করিয়া কাড়িয়া লওয়া যে অন্যায়, ঘোরতর অন্যায় এ বোধ কোথাও কোথাও দেখা দিল। এ বড় দুঃখ! এ বড় অপবাদ! সর্ব্বস্ব পণ করিয়া এত দুঃখ,

নির্য্যাতন মাথায় করিয়া শেষে এই ঘৃণিত কাজ! পরের ধন জোর করিয়া গ্রহণ! অন্তরাত্মা একেবারে সঙ্কুচিত হয় যে! মানুষ ডাকাত বলে। না হয়, জোর স্বদেশী ডাকাত বলিবে। সে যে আরও দুঃখ। এমনই একটা সংশয় কোথাও কোথাও দেখা দিল। এ সমস্যার মীমাংসায় বাদানুবাদ প্রভৃতি চলিল। কেহ এই দোষ দর্শাইয়াই বিপ্লব-পন্থা ছাড়িতে উদ্যত হইল। যাহারা ইহাকে তখনও সমর্থন করিতেছিল, তাহাদের মুস্কিল কম নহে। বিপ্লব-বাদীদের মধ্যে ত্যাগী ছেলের অভাব ছিল না—নীতির কথা, তাহাদের বড় বেশী বিচলিত করিত। সুতরাং ঐ পথের পুথিকেরা নানা যুক্তি-তর্কে তাহাদের নীতিজ্ঞানকে তুষ্ট করিতে লাগিল—নানা নূতন নীতি 'পুরাতন' নীতি হইতেই সংগৃহীত হইল। সেই সমস্যার মুখে তাহাদের যুক্তি-তর্কের ধারাগুলি কম রহস্যজনক নহে;—তাহাও আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

যাঁহারা বেশ ভাল লোক, দেশের সেবা করিতে চাহেন বা করেন—তাঁহারাও চাহেন দেশবাসী কাগজে-পত্রে, সভা-সমিতিতে প্রকাশ্যে তাঁহাদের প্রশংসা করুক। অন্তত প্রশংসা যে করিতেছে এই কথা জানিতে পারিলে তাঁহারা আনন্দ পান, কর্ম্মে তাঁহাদের স্ফূর্ত্তি আসে। মানুষের ইহাই স্বভাব। বিপ্লববাদীরা যে পথে যাত্রা সুরু করিয়াছে, তাহাতে কেহ প্রশংসা করিতে পারে না, অন্তত প্রকাশ্যে সে সম্ভাবনা একেবারেই নাই, অথচ এই লোক-গুলির মধ্যেও এমন চরিত্র ছিল যাহা, বস্তুতই প্রশংসার্হ। বিপ্লব-বাদের যাঁহারা ছিলেন কর্ত্তা তাঁহাদের সকল সময়ই খেয়াল থাকিত

যাহাতে তাঁহাদের নূতন কর্ম্মীরা কেহ প্রশংসার লোভে লুব্ধ না হয়—কারণ তাহা হইলে, তাহারা প্রকাশ্যেই দেশের অন্যান্য জনহিতকর অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিবে, বিপ্লবের দুর্গম, নিষ্ঠুর, নির্জ্জন গুপ্ত ধারায় আসিবে না।

এ সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দিলেই বুঝা যাইবে। সেবার যখন বর্দ্ধমানে বন্যা হয় তখন বাংলার যুবকগণ সেখানে দলবদ্ধ হইয়াই গিয়াছিল। বিপ্লববাদীদের বিভিন্ন দল হইতে সেখানে অনেকেই গিয়াছিল। আর সেখানকার সে মনুষ্যোচিত কর্ম্মের কৃতিত্ব ইহাদের কম ছিল না। সেখানে বিপ্লববাদীদের সঙ্গে তাহাদের অনুগত ছেলেরাও (ইহারাই তাহাদের ভবিষ্যতের আশা) গিয়াছিল। তাহাদের কষ্টসহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, সংঘবদ্ধভাব প্রভৃতি দেখিয়া শুধু দেশের লোক নহে স্বয়ং লাট সাহেব পর্য্যন্ত কর্ম্মীদের ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। এই ধন্যবাদ, এবং সংবাদপত্রে নানা প্রশংসাবাদ যখন চলিতে লাগিল তখন কোনও একজন বিশিষ্ট বিপ্লববাদী বলিলেন—ছেলেগুলিকে বন্যাস্থল হইতে লইয়া আইস। কারণ, যোগী যেমন ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াই ঐশ্বর্য্যে আটকাইয়া যায়, শুদ্ধ ভগবানকে পায় না—এ সমস্ত কর্ম্মীরাও এই প্রশংসা ও বাহবারূপ ঐশ্বর্য্যেই আটকাইয়া যাইবে—যাহাতে এমনই দেশব্যাপী প্রশংসা আছে তেমন কাজেই লাগিয়া থাকিতে চাহিবে—তাহাতেই আকৃষ্ট হইবে—ইহার উল্টা পথে যাইতে চাহিবে না। ভাবিবে, এ চমৎকার কাজ। কতকটা অজ্ঞাতসারে এই প্রশংসার লোভেই ভাল ভাল কর্ম্মীও এই সমস্ত কর্ম্মেই লিপ্ত থাকিতে চাহিবে।

আমাদের অখ্যাত, অজ্ঞাত বর্ত্তমানে নিন্দিত গুপ্ত ধারায় ইহারা আসিতে চাহিবে না। কিন্তু অখ্যাত, অজ্ঞাত ভাবের সঙ্গেই আমাদের অভ্যস্ত হইতে হইবে—ঐ সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আর ছেলেদের পাঠান ভাল নহে। ভবিষ্যতে খুব বিশিষ্ট দুই চার জন বিপ্লববাদী এ সমস্ত কাজে যাইতে পারে—কিন্তু সাধারণ ছেলেদের ওদিকে, ঐ প্রলোভনের মধ্যে নেওয়া ঠিক নহে—ইহাই সাব্যস্ত হইল।

এ পন্থার প্রশংসা নাই—নিন্দাই পাইতে হইবে, প্রকাশ নাই—গোপনেই আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে হইবে—ইহা জানিয়াই, ছেলেরাও যাহাতে এই গুপ্ত-ধারায়ই অভ্যস্ত হয়, প্রকাশের কোন আকর্ষণে আকৃষ্ট না হয়—সে জন্য এমনই সব যুক্তির কথা ছেলেদের শুনাইতে হইত ও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইত। ডাকাতি প্রভৃতি ব্যাপারেও কেমন করিয়া সতর্কতা অবলম্বন করা হইত তাহাও দেখিতে হইবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ডাকাতির কথা

পূর্ব্বে বলিয়াছি বিপ্লববাদীদের মধ্যে ডাকাতি করা লইয়া একটা সংশয় জাগিয়াছিল। সাধারণ লোকও সাধারণ নীতিজ্ঞানের দিক হইতে সহজেই বুঝে পরস্বাপহরণ দূষ্য। সমাজে যাহারা চুরি-ডাকাতি করে, তাহারা যে হীনচরিত্রের লোক, এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিন্তু বাংলার বিপ্লববাদীরাও সেই নিন্দনীয় পথে পা দিল! কর্ম্মীদের মধ্যে, কাহারও নিজ অন্তর হইতে, কাহারও বা বাহিরের নিন্দা-চর্চ্চা শুনিয়া এই পন্থার উপরে একটা সংশয় আসিয়া দেখা দিল। যাহারা সত্যই দেশের হিত করিতেই বাহির হইয়াছে, তাহারা স্বদেশবাসীর অর্থ জোরপূর্ব্বক লুণ্ঠন করিবে, একথা অনেকেরই অপছন্দ হইতে লাগিল।

এই সময়েই কেহ কেহ ধর্ম্মান্দোলনে যোগ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কতকটা বিপ্লববাদ ছাড়িবার ইচ্ছায়, আর কতকটা বিপ্লববাদীদের ডাকাতি প্রভৃতিতে দোষারোপ করিয়া তাঁহারা দলছাড়া হইলেন। বলা বাহুল্য যাঁহারা তদানীন্তন দল ছাড়া হইলেন, তাঁহারাও নিজেদের দলবৃদ্ধি করিতে, ডাকাতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করিলেন, সে প্রচার অবশ্য প্রকাশ্যে নহে।

কিন্তু যাহারা তখনও বিপ্লববাদকে ধরিয়াই রহিল, তাহারা তাহাদের বিপ্লব-সমিতিকে খাড়া রাখিতে, অন্যায় জানিয়াও, ডাকাতি প্রভৃতি ত্যাগ করিতে পারিল না। তাহাদের সেই সময়কার মানসিক অবস্থা ও যুক্তিগুলি আমরা একটু আলোচনা করিতেছি।

এখানে বলিয়া রাখি, যাঁহারা ডাকাতি প্রভৃতি ছাড়িলেন, তাঁহারা কার্য্যত বিপ্লবপন্থাকেই এক রকম ত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং যাহাদের মনে সংশয় উঠিত, তাহাদের বিপ্লববাদীরা সহজেই একথা বুঝাইতে লাগিল যে, বিপ্লবদল বা Revolutionary party খাড়া রাখিতে হইলে এ সমস্ত এখন ত্যাগ করিলে চলিবে না। 'দেখিতেছ ত, যাহারা এ সমস্ত কার্য্যের দোষ দেখাইয়া আমাদের ছাড়িয়াছে, তাহারা কার্য্যত বিপ্লবপন্থাকেই ছাড়িয়াছে; যদি কাজ করিতে না চাও, সে আলাদা কথা, কিন্তু কাজ করিতে চাহিলে, বল ত অর্থলাভের আর কোনও পথ আছে কি?'—এই প্রকার নানা ভাবের যুক্তি প্রদর্শিত হইত। কিন্তু বিপ্লববাদীদের কাছে আর-একটা মস্ত সমস্যা দেখা দিল, তাহা দেশবাসীর বিরাগ। ডাকাতির উপর দেশবাসীর অসন্তুষ্টি বিপ্লববাদীরা লক্ষ্য করিল। বিপ্লবের পক্ষে সে অসন্তুষ্টি নিশ্চিতই মারাত্মক। অবশ্য বিপ্লববাদীরা নিজেরাই বলিয়াছে ও বুঝিয়াছে যে, এ সমস্ত টাকা তাহাদের জমিতে পারে নাই, মোকদ্দমার খরচ যোগাইতে ও ফেরারীদের রক্ষা এবং 'অরগ্যানিজেসন' প্রভৃতিতে ব্যয় হইয়াছে। অন্য ভাবেও টাকা নষ্ট হইয়াছে।

বিশেষ করিয়া শেষের দিক দিয়া নষ্ট হইয়াছে, কারণ তখন শৃঙ্খলা ছিল না—তহবিল-রক্ষার যোগ্য লোকেরও অভাব হইয়াছিল। বিপ্লব অনুষ্ঠানের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, তাহা অন্য দিক হইতে লাভ করিবার চেষ্টা চলিল। সে কথা যথাস্থানে উঠিবে। বিপ্লববাদীরা এই ব্যাপারে যে সমস্ত যুক্তি দিত এবং সে যুক্তিতে যে সমস্ত কর্ম্মী বিশ্বাস করিয়া কাজে অগ্রসর হইত—তাহাতে বুঝা যাইবে, এই কাজটা যতই দূষণীয় হউক যাহারা ইহার অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কত বড় একটা ত্যাগের ভাব বর্ত্তমান ছিল।

'ক' নামক একজন বিশিষ্ট বিপ্লববাদী 'খ' নামক একজন কর্ম্মীকে যুক্তি দিতেছেন। 'খ' ধনীর সন্তান, কলেজের ছাত্র। 'ক' ইহাকে কোন একটি ডাকাতিতে পাঠাইতে চাহেন। ডাকাতি করার জন্য তাহার তেমন প্রয়োজন ছিল না, অর্থাৎ সে না হইলেও চলিত কিন্তু তাহার আজ ডাক পড়িয়াছে, ডাকাতি যে খারাপ. তাহার এই সংস্কারটি ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য।

'খ' বিপ্লবানুষ্ঠানের অপর যে-কোন ভার গ্রহণ করিতে সম্মত অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ আনা-নেওয়া রাখা, এমন কি প্রয়োজন হইলে খুন করিতেও সে পশ্চাৎপদ নহে! কিন্তু ডাকাতিতে সে নারাজ।

'ক' তাহাকে বুঝাইলেন যে 'খ' এ কাজ তাহার নিজের জন্য করিতেছে না। আর ইহাও তাহাকে জানাইয়া দিলেন যে, সে যে ডাকাতিতে নারাজ তাহার কারণ আর কিছুই নহে শুধু তাহার অভিমান। সে এখনও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে নাই নাম যশের আকাঙ্ক্ষা তাহার এখনও আছে। অন্য কোন কাজ

করিয়া ধৃত হইলে দেশবাসী বলিবে, দেশের জন্য কাজ করিয়াছে। আর ডাকাতি করিয়া ধরা পড়িলে অনেকে হয়ত বলিবে—'ডাকাত,' কেহ হয়ত বিশ্বাস করিবে যে সে অর্থের লোভেই ডাকাতি করিয়াছে; প্রতিবাদ করারও সাধ্য নাই।—তাহার পর বলিলেন,—'কিন্তু ইহা স্থির জানিও, যে-কর্ম্মী নিঃস্বার্থ এবং নিষ্কামভাবে নিন্দাচর্চ্চা ও ডাকাতির গ্লানির পশরা মাথায় লইবে, সেই আদর্শ কর্ম্মী। দেশের কাজ করিলেও দেশবাসী তাহা না জানিয়া হীন চক্ষেই হয়ত তাহাকে দেখিবে—কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যে পিছপাও হইবে না—তাহার শক্তি অনেক বেশী, তাহার ত্যাগই যথার্থ ত্যাগ!'

শুধু ইহাতেই যুক্তি শেষ হইত না, পাপ-পুণ্যের প্রশ্নও উঠিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিপ্লববাদীদের মধ্যে ত্যাগী, চরিত্রবান, সুতরাং স্বভাবত কতকটা ধর্ম্মভাবাপন্ন যুবক থাকিত। তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞানে যেখানে বাধিত সেইখানে বিশিষ্ট কর্ম্মীরা যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের ধর্ম্মভাবকে তুষ্ট রাখিতেন। ফলে তাহাদের ধর্ম্মবোধটাও বিপ্লবের অবিরোধীই হইত—সাধারণ মানুষের ধর্ম্মজ্ঞান, নীতিজ্ঞানের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য ছিল না।

'খ' এখনও ডাকাতি করাটাকে বরদাস্ত করিতে পারিতেছে না, আজন্মের সংস্কারে বাধিতেছে। তবে 'ক' বিশিষ্ট কর্ম্মী সর্ব্বত্যাগী চরিত্রবান,—দুঃখ কষ্টকেই সানন্দে বরণ করিয়া নিয়াছেন—কোনও প্রকার ভোগবাসনা যে তাঁহার নাই ইহা সে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে; সুতরাং তাঁহার যুক্তির মধ্যে

তাঁহার চরিত্রটি প্রভাব বিস্তার করিয়া যুক্তিটাকে ক্রমেই অপ্রতিহত করিয়া তুলিতে লাগিল। ব্যাপার দাঁড়ায় এই,—যাঁহাকে দেখি আমার অপেক্ষা চরিত্রে, ত্যাগে উন্নত, তিনি যখন কিছু একটা করিতে থাকেন, আর বলেন ইহা করা কর্ত্তব্য, তখন আমি যদি সে কাজটি করিতে না পারি, বা আমার সংস্কারে আটকায় তবে, স্বতই মনে হয়, দোষ বুঝি আমারই, আমিই বুঝি তেমন শক্তিশালী নহি!

পাপ-পুণ্য সুতরাং স্বর্গ-নরকের কথা উঠিবামাত্র 'ক' 'খ'কে 'ভক্তমালের' একটি উপাখ্যান শুনাইতে লাগিলেন।—'জান ত, শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য তেমন যে ভক্ত, সে সানন্দে চুরি করিয়া ঠাকুরের সেবার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিল। ভগবানের জন্য যদি ধর্ম্মই ত্যাগ করিতে না পার, তবে ত্যাগ করিলে কি? দেশসেবা যে ভগবৎসেবা।' এবার 'খ'এর চিত্ত নরম হইতে লাগিল। 'ক' বিশিষ্ট কর্ম্মী, তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাসের কাছে 'খ' নিজেকে যেন স্থির রাখিতে পারিতেছে না। তারপর 'ক' আরও বলিতে লাগিলেন,—'জান, এক ভক্ত যখনই শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করিতেন, তখনই পূর্ব্বে তাহা খাইয়া দিতেন। একজন বিবেচক ব্যক্তি বলিল, ও কি করিতেছ, ঠাকুরের ভোগ, যাহার উপর শ্বাস ফেলিতে নাই, দৃষ্টিও দিতে নাই, সেই পবিত্র বস্তু তুমি আগে খাইয়া উচ্ছিষ্ট করিতেছ,—তোমার যে নরকেও স্থান হইবে না।'—ভক্তটি উত্তর করিল, 'আহা, তবু আমার ঠাকুর ত ভাল জিনিষ খাইলেন, আমি নরক স্বর্গ চাহি না, আমি চাই আমার ঠাকুরের সেবা। আমি না

খাইলে, কেমন করিয়া জানিব—যদি ঠাকুরের মুখে খারাপ ভোগ যায়। আমাকে নরকে কি করিবে, ঠাকুরের ভোগ হইলেই হইল।' ইহার পর আর কথা চলে না! 'খ'রও চলিল না—এ পথে ত ছিলই, এই যুক্তিই সার করিল,—এই বিশ্বাসেই এ পন্থায় পা দিল। সত্যই ভাবিল 'তাই ত আমার অহঙ্কারই ত আমায় বাধা দিতেছে।' বিশিষ্ট কর্ম্মীরা এই ভাবের যুক্তি দিতেন, অনেকের চরিত্রও তেমন নিষ্কামই ছিল। আর কর্ম্মীরাও এত বড় একটা অন্যায় নিন্দা ও পাপকে এমন করিয়াই গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং এ মহা অন্যায় বা ভুলের মধ্যেও উহাদের যে একটা নাম-যশহীন ত্যাগের ভাব ছিল, ইহা না মানিয়া উপায় নাই। তবে এখানে সাথে সাথে আর একটা কথা জানিতে হইবে। যে বয়সের ছেলেরা এ সমস্ত যুক্তি শুনিত তাহাদের বয়সই ভাব-প্রবণতার বয়স, সুতরাং ধর্ম্মের এ সমস্ত উচ্চাঙ্গের কথা শুনিয়া আর এ সমস্ত সাহসিকতার কর্ম্ম বলিয়া এ ব্যাপারে সহজেই মাতিয়া উঠিত। পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বয়স বা শক্তি অনেকের ছিল না। ইহার বিপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি আছে, ঐ উচ্চাঙ্গের কথা সাধকের কোন্ সময় যে প্রযুজ্য, সাধারণ কর্ম্মীর মধ্যে সে সময়টা উপস্থিত হইয়াছিল কি না, তাহা অনেকেই ভাবে নাই; ভাবে নাই বলিয়া এদিকে অনেক ত্রুটি, এমন কি ব্যাভিচারও শেষে ঘটিয়াছে! যেমন গোপী-প্রেমের ঐকান্তিক অভাবে মানুষ কামকেই সেবা করে, ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ তেমনই পাপপুণ্যত্যাগরূপ বড় বড় কথা আওড়াইয়া নিজের মধ্যে যে স্বার্থলিপ্সা ছিল তাহার চরিতার্থতা করিয়াছে।

এমনও জানা গিয়াছে, স্বার্থসিদ্ধির জন্যই বিপ্লবপন্থা ছাড়িয়াও, শেষে দুই চার জন ডাকাতি করিয়াছে; বলা বাহুল্য, প্রথম ডাকাতি করিবার ভরসা যখন তাহারা পাইয়াছিল তখন খুব বড় নীতি ও তত্ত্ব কথাই আওড়াইয়াছে; আর পরে যখন স্বার্থের জন্য করিয়াছে, তখন যদিও বিবেকে বাধিত তবু নিজের মনে বা সঙ্গীদের কাছে, পূর্ব্বশ্রুত তত্ত্বকথা আওড়াইবার কোন বাধা হয় নাই।

তবে বিপ্লববাদীরা ইহার অপর দিকটা তখনই দেখিতেছিল। সেজন্য বিশিষ্ট কর্ম্মীদের বলিতে শুনা যাইত, 'এ সমস্ত ডাকাতি প্রভৃতি তাহারাই করিতে অধিকারী অর্থাৎ তাহাদেরই নৈতিক অবনতি ঘটিবে না যাহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে, নিজের সবই আগে দিয়াছে।' পরীক্ষার জন্য কোন কোন কর্ম্মীকে বলাও হইত, 'তুমি, তোমাদের বাড়ী হইতে ডাকাতি করিয়া আনিতে পার কি না? যে না পারে সে ইহার অধিকারী নহে'—আবার ইহাও বলা হইত, 'এপথে আমরা একটি সূত্রের উপর দাঁড়াইয়া আছি। সূত্রটুকু ছিন্ন হইয়া গেলে একেবারে পাতালপুরীতে পড়িয়া যাইব! যদি ছিন্ন না হয়, সূত্ররূপ নীতি অব্যাহত থাকে—ঠিক দাঁড়াইয়া থাকিব', ইত্যাদি ইত্যাদি। মোট কথা, এ সমস্ত কথা সত্য সত্য বিশ্বাস করিয়া অনেকে এ সমস্ত কাজ করিয়াছে—স্বার্থের নামগন্ধও তাহাতে ছিল না। সেই জন্যই বিপ্লববাদীদের যুক্তির ধারা ও মনের দিকটা দেখান হইল। ডাকাতি অন্যায় নিশ্চয়, সমর্থন একেবারেই অসম্ভব; তবে যাহারা পরস্বাপহরণ করিয়াছে ও যাহারা

দেশের নিন্দার্হ হইয়াছে, তাহাদের মনটী না জানা থাকিলে, তাহাদের উপর একটু অবিচার করা হইবে না কি?

* * *

বাংলায় বিপ্লববাদের সূত্রপাত হওয়ার কয়দিন পর হইতেই ডাকাতি অনুষ্ঠিত হইতেছিল। ১৯০৬ হইতে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত কখনও প্রবলভাবে কখনও বা মন্দগতিতে ইহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে কিন্তু বন্ধ হয় নাই। সাধারণত স্থলপথে ও জলপথেই ডাকাতি অনুষ্ঠিত হইত। তবে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মোটর সংযোগে কলিকাতার গার্ডেনরিচ ও বেলিয়াঘাটা প্রভৃতি স্থানে যে ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয় তাহা একটা নূতন অধ্যায়।

* * *

বিপ্লববাদীদের অনুষ্ঠিত অনেক ডাকাতিতেই আশ্চর্য্য রকম সুশৃঙ্খলা ও কৌশল প্রকাশ পাইয়াছে। ১৯০৬ সাল হইতে ১৯১৭ সালের অনুষ্ঠিত ডাকাতিগুলি বিশ্লেষণ করিলে তাহাদের কষ্টসহিষ্ণুতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, ক্ষিপ্রকারিতা, নির্ভীকতা, লোভশূন্য মনোবৃত্তি প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তির পরিচয়ও পাওয়া যায়। এই ব্যাপারে যে নির্ম্মম নিষ্ঠুরতা ও কোমল মনোবৃত্তি একই সঙ্গে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

* * *

ডাকাতি করার পর বিপ্লববাদীরা সকলেরই গাত্রতল্লাস লইত। বহু লোক একত্র হইয়া ডাকাতি করিত। নূতন লোকও হয় ত সময় সময় থাকিত। সুতরাং একেবারে বিশ্বাস

করিয়া বা শৈথিল্য করিয়া বসিয়া থাকিত না। কড়াক্রান্তি হিসাব না করিলে শৈথিল্য হইতে ক্রমে অর্থ আত্মসাৎও কেহ করিতে পারে। প্রত্যেককে পরীক্ষা করিবার অবসরও হয় ত পূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই। তাই ডাকাতি করিতে গিয়া বিপ্লববাদীরা সতর্কতা অবলম্বন করিতে ত্রুটি করে নাই। ডাকাতি যাহারা করিতে যাইত তাহারা সকলেই অর্থসংগ্রহ করিত না, সেজন্য নির্দ্দিষ্ট লোক থাকিত। ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। অর্থ একত্র করা হইয়াছে। যে সেদিনকার নেতা সেই প্রথম একজনকে ডাকিয়া তাহার গাত্রতল্লাস করিতে বলিল। তল্লাস হইল। পরে প্রত্যেকের গাত্র তল্লাস করিয়া দেখা গেল, কাহারও কাছে কোন অর্থ নাই। এই ভাবে তল্লাস লওয়ার দস্তর হইয়াছিল। নিয়ম বলিয়াই সকলে ইহা মানিত। সাধারণ লোকের কু-প্রবৃত্তি সুযোগ পাইলে বৃদ্ধি পায়, এই কথা মনে রাখিয়া বিপ্লববাদীরা সাবধান হইত।

* * *

বিপ্লববাদীরা স্ত্রীলোকদের গায়ে কখনও হাত দেয় নাই। একবার একস্থানে ডাকাতি হইতেছে। অর্থসংগ্রহ চলিতেছে। যে বাড়ীতে ডাকাতি হইতেছিল সেই বাড়ীর একজন স্ত্রীলোকের গলায় একছড়া হার ছিল। একজন রমণীটিকে দেখিয়া হার ছড়া লইতে যেই হাত বাড়াইয়াছে অমনই তাহার গণ্ডদেশে এক প্রচণ্ড চড় পড়িল। ঐ আঘাতে বিপ্লববাদী ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। যে বিপ্লববাদী তাহাকে চড় মারিয়াছিল, সে পিস্তল উঠাইয়া বলিল, 'খুন ক'রে ফেলব, তোমাকে হার কেড়ে নিতে কে বলেছে?' ঐ

লোকটার ঐ প্রবৃত্তি দেখিয়া বিপ্লববাদীরা তাহাকে হেয় মনে করিতে লাগিল। শাসন ত চলিলই। তাহার উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার আদেশ হইল। যে তাহাকে পাঠাইয়াছে, তাহার কৈফিয়ৎ চাওয়া হইল।

* * *

এক স্থানে ডাকাতির অনুষ্ঠান হইতেছে। বাড়ীর বাহিরে গ্রামের লোক জড় হইয়াছে, ভিতরে যে যাহার নির্দ্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে। সময় অধিক নাই, অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত কাজ সারিতে হইবে।

অগণিত অর্থের সন্ধান সেখানে মিলিয়াছে। বিশিষ্ট কর্ম্মীরা ভাবিতেছে, আর এ সমস্ত কাজ করিবার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু হঠাৎ গুড়ুম্ করিয়া আওয়াজ হইল। কিসের একটা আঘাত লাগিয়া জনৈক বিপ্লববাদীর হাতের পিস্তল ছুটিয়া গেল,—আর তাহা আঘাত করিয়া বসিল অপর বিপ্লববাদীকে। আঘাত সাংঘাতিক! অর্থ সবই হাতে আসিয়াছে; কিন্তু যাঁহার হাতে সেদিনকার এ অনুষ্ঠানের ভার তিনি প্রমাদ গণিলেন। অজস্র রক্ত পড়িতেছে। আহত ব্যক্তিকে বহন করিয়া এতদূর লইয়া যাওয়া এক মস্ত সমস্যা। এ অগণিত টাকা, আর এ মানুষ, কেমন করিয়া রক্ষা করা যায়? আহত বিপ্লববাদী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, —'এক মুহূর্ত্তও দেরী ক'র না। এত অর্থসংগ্রহ ক'রতে অনেক বেগ পেতে হবে—আমার মাথাটা কেটে নিয়ে যাও—শীঘ্র কর।' যাহা করার কয় সেকেণ্ডেই ঠিক করিতে হইবে। আহত বিপ্লব-

বাদী অবিচলিত চিত্তে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল—'ভাববার সময় নেই—টাকাগুলোই নিয়ে যাও—তবে চেহারা দেখলে চিনতে পারবে—মাথাটা কেটে ফেল।' কিন্তু মীমাংসার ভার যাঁহার মাথায় ছিল, তিনি কাজ বন্ধ করিবার বাঁশী বাজাইলেন। সকলেই হাত গুটাইল। যে টাকার তোড়া ধরিয়াছিল, সে ছাড়িয়া উঠিল। আদেশ হইল 'টাকা নয়, মানুষ;—কাঁধে তোল।' ব্যাণ্ডেজ করিয়া নিঃশব্দে আহত বিপ্লববাদীকে বহন করিয়া সকলে চলিল। অর্থের কথা কেহ ভাবিল না। রাস্তায় নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আসিয়া সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত, সুনিপুণ গোপনতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইল। যন্ত্রবৎ অর্থসংগ্রহ করিতে যাহারা ছুটিয়াছিল তাহারা যন্ত্রবৎই একটী ইঙ্গিতে অর্থসংগ্রহ ত্যাগ করিয়া ছুটিল। বিপ্লববাদীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অনেক ডাকাতিতেই সুশৃঙ্খলা প্রকাশ পাইয়াছে। এ সমস্ত ডাকাতির মধ্যে যে একটা ক্ষীণ ক্ষাত্রভাব লুক্কায়িত ছিল তাহাতেও অনেক যুবককে আকৃষ্ট করিয়াছে। জাতির মধ্যে একটা লুপ্তপ্রায় ক্ষাত্রভাব ছিল। যে শ্রেণীর মধ্যে এই ভাব প্রচুর থাকে, তাহারা সব সময় খুব বুদ্ধিজীবী নাও হইতে পারে। তাহাদের পরিচালকদের বিদ্ধাবুদ্ধিতে নির্ভর করিয়া তাহারা, নেতার আদেশে 'এক পায়ে খাড়া' হইতেই কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। ডাকাতিতে যে দলবদ্ধ হইয়া যাত্রা করিতে হইত, সুদীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে একজনের নেতৃত্বাধীনে একটা বিপদের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইত, আদেশমতই পরিচালিত হইতে হইত—এ সমস্ত ব্যাপার,

যুবকদের এই ভীষণ পথের সহযাত্রী হইতে উৎসাহিত করিয়াছে। ইহা নিছক প্রয়োজনীয় ব্যাপার হিসাবেই কেবল নহে, ইহার মধ্যে যে একটা রোমান্সের ভাব ছিল তাহাও ইহাদের কতককে আকৃষ্ট করিয়াছে ; অবশ্য প্রয়োজন বোধ ত একটা ছিলই।

* * *

১৯০৮ সালের বারহা ডাকাতিতেই সর্ব্বপ্রথম বিপ্লববাদীদের ডাকাতির বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠে। সে ডাকাতির সংবাদে বাংলা-দেশের যুবকদের বিপ্লবমুখী মনকে আনন্দমঠের ডাকাতির রঙে রঙাইয়া তোলে। অতগুলি লোক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সুদীর্ঘ পথ নৌকায় অতিক্রম করিয়া আসিল। তাহাদের অনুসরণ-কারী অসংখ্য গ্রামবাসীর ও পুলিশ প্রহরীদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া শত মাইল জলপথ অতিক্রম করিয়া কোথায় কে লুকাইল কেহই জানিতে পারিল না বটে, কিন্তু সাধারণ লোককে কল্পনার অবসর তাহাতে যথেষ্ট দিয়া গেল। তাহারা রঙ চড়াইয়া অদ্ভুত কৌশলের কথা প্রকাশ করিতে লাগিল। বুদ্ধিমান লোকেরাও অসম্ভব কার্য্যকুশলতার বাহবা দিতে লাগিলেন। তরুণ যুবকেরা এ সমস্ত রহস্যাবৃত বলিয়া এই অজানাকে জানিবার প্রলোভনেই প্রলুব্ধ হইল। ইহারা ডাকাতিকে 'ডাকাতি'র দুর্নাম হইতে ভিন্ন করিয়া বিপ্লবের সঙ্গেই যুক্ত করিয়া দেখিল। ইহাতে কষ্ট-সহিষ্ণুতাও যথেষ্ট অভ্যাস করিতে হইয়াছে। জলপথে, স্থলপথে সর্ব্বত্রই সেই কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নির্দ্দিষ্ট নদীর তীরে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোক আসিয়া নীরবে নৌকায় উঠিল। মাঝিমাল্লা সবই ঠিক। নৌকা চলিল—একদিন নহে, দুইদিন নহে, ৭।৮।১০ দিন আঁকিয়া বাঁকিয়া নদী হইতে খালে আবার খাল হইতে ঘুরিয়া নদীতে পড়িতে লাগিল। স্থানে স্থানে পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ মত দুই চার জন নৌকায় উঠিতে লাগিল। এমনই করিয়া কখনও সোজা, কখনও বক্রগতিতে অবিশ্রান্তভাবে মাঝি নৌকা বাহিয়া চলিল। বলা বাহুল্য, মাঝিমাল্লারা সকলেই বিপ্লববাদী। ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি কথার ভঙ্গী মাঝিমাল্লাদেরই মত। জীবনে যে তামাক খায় না, সেও নৌকার মাঝি হইয়া সাধারণ মাঝিদের মতই তামাক খাওয়ার নিপুণ অভিনয় করিতেছে। স্থানে স্থানে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর মাঝিমাল্লারাই দিতেছে। উত্তরদাতা ও প্রশ্নকর্ত্তা পূর্ব্বাহ্নেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। বলা বাহুল্য বিপ্লব-বাদীদের মধ্যেই কয়জন আরোহী হইয়া বসিয়াছে। নদীতে জল-পুলিশ রহিয়াছে মোড়ে মোড়ে নৌকায় তাহাদের আড্ডা। এখানে সেখানে পুলিশের লঞ্চ—নিয়ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিদর্শন করিতেছে। মোড়ে মোড়ে নৌকার তল্লাস হইতেছে। নৌকায় স্ত্রীলোক থাকিলেও রেহাই নাই। তারপর কোন নৌকা মোড়ে না আসিয়া অপর দিক দিয়া যাইতেছে দেখিলে তাহা থামান হইত, তল্লাস করা হইত, নাম ধাম লেখা হইত। এই সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অস্ত্রশস্ত্র সমেত, আট দশ দিনে (কখন তাহা হইতেও বেশী) ঐ নৌকাপথেই গন্তব্য স্থলে গিয়া পৌছিত। বিপ্লববাদীরা অনেকে

নৌকাপরিচালনায় সুদক্ষ মাঝির মতই ছিল। অবশ্য ইহা রীতিমত অভ্যাস করিতে হইয়াছে। আর সাধারণ বিপ্লববাদী সকলেই রৌদ্র-বৃষ্টি সহ্য করিতে অভ্যস্ত ছিল। অনেক সময় গন্তব্য স্থানে নানা বিঘ্নবিপত্তির মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে পৌঁছিতে হইবে, তাই তীরবেগে নৌকাচালনা করিতে হইত, সময়ের অভাবে খাওয়ার হুকুমও মিলিত না। অনেকের বর্ণ রৌদ্র-বৃষ্টি ও সেই পরিশ্রমে একেবারে কাল বিবর্ণ হইয়া যাইত। দেখিলে মনে হইত সত্যই বুঝি কোন 'স্থান বিশেষের' মাঝি। কিন্তু বাধা দিত এক বয়স। অনেকেই যুবক, কাজেই একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার মনে হইত। সেই দিকেও সাবধানতার ত্রুটি ছিল না। যাহাই হউক, ডাকাতি করিতে যাওয়ার মুখে বরং কষ্ট ছিল কম, কিন্তু ফিরিবার মুখে কষ্ট সহিতে হইত অধিক। কারণ তখন একদিকে যাইত অর্থ, একদিকে যাইত অস্ত্র, আর নদীপথে যাইত বিপ্লববাদীরা। বলা বাহুল্য ডাকাতি করার পর, চারিদিকে সতর্ক জল-পুলিশ ও স্থল-পুলিশ থাকিত। তাহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র ও মানুষ নির্বিঘ্নে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আনিতে অনেক কৌশল, অনেক শৃঙ্খলার প্রয়োজন হইত। ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া কাজ করার মত কাজ না করিলে, প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট কাজ সে না করিলে, ধরা পড়িবার সম্ভাবনা খুবই ছিল।

একবার স্থলপথের এক ডাকাতির পর বিশিষ্ট একজন বিপ্লববাদী ধৃত হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনাকে এড়াইবার জন্য হঠাৎ গতি ফিরাইয়া দেয়। দুই পয়সার ছোলাভাজা পকেটে ফেলিয়া

৮০ মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া এক বন্ধুর বাড়ীতে, রাত্রি-শেষে উপস্থিত হইয়া নীরবে বহির্বাটিতে এক ভৃত্যের পাশে শয়ন করিয়া থাকে। ভৃত্য প্রভাতে নিদ্রামগ্ন ভদ্রলোককে দেখিয়া অবাক। এ আবার কে? গোলমাল হইতে বন্ধুর মা আসিয়া দেখেন শ্রীমান—। জানা-শুনা খুবই ছিল। কোথা হইতে আসিয়াছে না জানিলেও বুঝিলেন, বহু দূর হইতে কোনও একটা ব্যাপার উপলক্ষেই আসিয়াছে। বিপ্লববাদীদের মা-বোনেরা (সকলেই অবশ্য নহে) গোপন-ব্যাপারে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরে গিয়া উপস্থিত হইলেও জিজ্ঞাসা করিতেন না, 'কোথা হইতে আসিলে?' পুত্রাধিক স্নেহে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া শুধু যত্নই করিতেন; কিন্তু কোথা হইতে কেন আসিতেছে, কোথায় কবে যাইবে, ইহা জিজ্ঞাসা করিতেন না। জানিতেন, অদ্ভুত অস্বাভাবিকই ইহাদের জীবন। কি করিতেছে ইহারা, তাহা হয় ত কাহারও কাহারও মা জানিতেন, অনেকেই জানিতেন না;—তবে এটুকু জানিতেন দেশের জন্যই ইহারা সব কিছু করিতেছে!

মা ডাকিলেন, 'এস, ভিতরে এস; অম্‌নি ক'রে শোয়? পাগল, একবার ডাকনি কেন?' বিপ্লববাদী হাসিয়া বলিল, 'একটু জল গরম করুন।' জল গরম হইলে পায়ে একটু সেঁক দেওয়া হইল—মায়ের দেওয়া ভাতও জুটিল। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর আবার রাস্তায় বাহির হইতে হইল।

একজন বিশিষ্ট বাঙালী বলিয়াছিলেন, বিপ্লববাদীরা 'were driven to dacoities';—কথাটা সত্য। বড় বড় ব্যারিষ্টারের

ফি যোগাইতে তাহাদের অনেক বেগ পাইতে হইয়াছে। শেষ দিক দিয়া তাহারা আর অর্থব্যয় করিয়া জমকাল মোকদ্দমা করিতে চাহে নাই—করেও নাই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

খুন

বিপ্লববাদীরা ১৯১৪ সালের শেষ ভাগ হইতে কি ভাবে অস্ত্র-শস্ত্র ও সৈন্যসংগ্রহ করিয়া বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করে তাহা বলিবার পূর্ব্বে আমরা তাহাদের ডাকাতির কথা কিছু বলিলাম। এবার খুনের কথাও কিছু বলিব।

বিপ্লববাদীদের যাহারা ক্ষতি করিয়াছে, তাহাদের পেছন তাহারা সহজে ছাড়ে নাই। ১৯০৮ সালের জের ১৯১৩-১৪ সাল পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে। কোন কোন পুলিশ কর্ম্মচারী বলিয়াছেন, এই দলের খাতায় নাম উঠিলে, একদিন না একদিন চিত্রগুপ্তের খাতায় আর একটি অঙ্ক বসাইয়া দিবে। ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে না হউক, সমষ্টিগত হিসাবে এই সমস্ত খুনের মধ্যে কতকটা প্রতিহিংসা চরিতার্থের ভাব যে ছিল না —একথা জোর করিয়া বলা যায় না। যে সমস্ত লোক বিপ্লববাদীদের অনেক ক্ষতি করিয়াছে, যাহারা বিপ্লববাদীদের মতে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাহাদের শাস্তি দিবার একটা প্রবৃত্তি বিপ্লববাদীদের মধ্যে প্রবলভাবে দেখা দিত। আত্মরক্ষার জন্যও বটে, ইহারা বাঁচিয়া না থাকিলে আর ক্ষতি করিতে পারিবে

না, এই জন্তও বটে, আবার কঠোর শাস্তি দিয়া একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেও বটে, বিপ্লববাদীরা এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। ব্যক্তিগত হিসাবে কোন বিপ্লববাদী কোন শত্রুর উপরে এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে পারে নাই। দলের হিসাবে গ্রাহ্য না হইলে ব্যক্তির কথা উঠান সম্ভব ছিল না। 'আমাকে অমুক পুলিশ কর্ম্মচারী কষ্ট দিয়াছে সুতরাং একটা কিছু করিতে হইবে' একথা বলার প্রবৃত্তি বা সাধ্য ছিল না। Personal ব্যাপারটাকে দলে কেহ টানিয়া আনিত না।

শিক্ষা দেওয়ার ভাব হইতে অনেক সময় তাহারা এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে। এত ক্ষতি করিয়া সরিয়া গেল, বিপ্লববাদীরা কিছু করিতে পারিল না—এই ভাবটা দেশে প্রচারিত না হয়, বিপ্লববাদীদের সেদিকে তীব্র দৃষ্টি থাকিত। তাহারা বুঝিয়াছিল, একদল দেশবাসীকে দেশাত্মবোধের কথায় দলে রাখিতে হইবে, অন্য একদল লোককে, ভয় দেখাইয়া দলের বিরুদ্ধে যাহাতে না যায় সে ব্যবস্থা করিতে হইবে। একদল যে সরকারের সহায়তা করিবেই তাহা তাহারা জানিত, তবে এই রকম ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থায় অনেকে ইচ্ছা থাকিলেও, সরকারের সাহায্য করিবে না —ইহা তাহারা মনে করিত। তাহাদের এই প্রচেষ্টায় সরকার লোক পান নাই, তাহা নহে, তবে অনেক ক্ষেত্রে সরকারকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছে। সাধারণ লোক সরকারকে যেমন ঘাঁটাইতে চাহে নাই, বিপ্লববাদীদেরও তেমনই ঘাঁটাইতে চাহে নাই। কারণ জাতিহিসাবে আমরা কতকটা ভীরু—সুতরাং

যেদিক হইতেই হউক, ভয়ের কারণ থাকিলে, আমরা ভাল-মানুষের মত চুপ করিয়া থাকি। দলের ক্ষতি করিয়াও কেহ বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছে—ইহা যেন বিপ্লববাদীরা তাহাদের কলঙ্ক বলিয়াই মনে করিত। তাই দেখা যায়, এই বিষয়ে তাহারা দলের গণ্ডী ছাড়িয়া গিয়াছে। কোন এক ব্যক্তি ভিন্ন একটি দলের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছে, অথচ তাহার কিছুই এখনও হইল না, ইহার প্রতিকারের জন্যই অপর দল সেই ব্যক্তিকে নিঃশেষ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। আট বছর পূর্ব্বে যে ব্যক্তি ক্ষতি করিয়াছিল, যে এখন আর বিশেষ কোনও ক্ষতি করে না, তাহারও নিস্তার নাই, তাহারও শাস্তি দিতে হইবে, কারণ, তাহা হইলেই সাধারণ লোক বিরুদ্ধে যাইতে ভয় পাইবে, ইহাই ছিল তাহাদের ভাব। বিপ্লববাদীদের এই ব্যবস্থায়, পরিণামে একটা অরাজকতা সৃষ্টিরই সহায়তা করিয়াছিল, কিন্তু সরকারের লোকের অভাব হয় নাই,—বিপ্লববাদীরা সেকথা নিশ্চিতই বুঝিয়াছিল। রাষ্ট্রশক্তিকে পরিবর্ত্তিত করিবার পক্ষে ইহা যে মোটেই কার্য্যকরী নহে তাহা বুঝিতে তাহাদের দেরী হয় নাই।

বিপ্লববাদীরা ব্যক্তিগত স্বার্থকে কোন সময়ে প্রশ্রয় দেয় নাই। দলের মধ্যে কাহারও সেদিকে ঝোঁক থাকিলে, তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখা হইত। কিন্তু তাহারা সাধারণত ক্ষমাধর্ম্মী বশিষ্ঠ বা অহিংস প্রেমাবতার কোন অতিমানুষের মন্ত্রশিষ্য বা ভক্ত ছিল না; প্রতিহিংসার ভাব তাহাদের মধ্যে জগতের সাধারণ লোকের মতই ছিল।

এই 'শাস্তি' দেওয়া সম্বন্ধে একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, এই যে খুন, ইহাকেই বিপ্লববাদীরা মনে করিত, তাহারা শত্রুর উপর শাস্তিবিধান করিতেছে। সময় সময় এই প্রশ্ন উঠিয়াছে,—যাহারা দলের ক্ষতি করে তাহাদের সকলের অপরাধই সমান নহে, কিন্তু তাহাদের উপরও এই একই ব্যবস্থা কেন? বিপ্লববাদীদের ক্ষতির দিকটা বিবেচনা করিলে, মিঃ গর্ডন হয়ত কোনই ক্ষতি করে নাই। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা হয় কেন? পুলিশ কর্ম্মচারী বা অপর কোন ব্যক্তিও এই হিসাবে কম বেশী ক্ষতি করিয়াছে। কিন্তু ব্যবস্থা ঐ এক। এই ব্যবস্থাকে কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী বিপ্লববাদী নিজেদের অক্ষমতা ও দুর্ব্বলতা মনে করিয়াছে। জীবনে না মারিয়া ক্ষতির অনুপাতে অন্য ব্যবস্থা যে তাহারা করিতে পারে নাই, তাহাও বিপ্লববাদীরা তলাইয়া দেখিয়াছে। যে রকম সুসম্বদ্ধ বিরাট শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান থাকিলে, ছোট বড় নানা প্রকার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা বিপ্লববাদীদের ছিল না। তাহাদের পক্ষে শত্রুকে মারিয়া ফেলা সোজা, কিন্তু দুই ঘা মারিয়া ছাড়িয়া দেওয়া ভয়ের কারণ।

১৯০৮-০৯ সালে যে ব্যক্তি কোন এক মামলায় পুলিশের সাহায্য করিয়াছিল, তাহাকে মারিয়া ফেলিবার ইচ্ছা বিপ্লববাদীদের ১৯১৪ সাল পর্য্যন্তও সমভাবেই ছিল। এতদিন পুলিশের নানা সাহায্যে সে ব্যক্তি কতকটা নির্ভয়ে ছিল। সে যাহাদের ক্ষতি করিয়াছে তাহারা প্রায় সকলেই এখন জেলে, কেহ বা পরলোকে

—তাহাকে ঠিক চিনিবার লোকও হয়ত বেশী নাই। সুতরাং উক্ত ব্যক্তি কতকটা নিশ্চিন্তই; কিন্তু বিপ্লববাদীরা নিশ্চিন্ত নহে —চট্টগ্রামে তাহার সন্ধান পাইয়াছে। তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া আর একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতে বিপ্লববাদীদের প্রচেষ্টা চলিল। Sedition Committee Report হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—"The murder in Chittagong was effected in the public street, the victim was one who was suspected of giving information to an officer of the Criminal Investigation Department. A person who narrowly escaped murder and was in company of the victim had been a witness in the Dacca conspiracy case."—অর্থাৎ চট্টগ্রামে প্রকাশ্য রাজপথেই হত্যা করা হয়। যাহাকে হত্যা করা হয়, সে পুলিশে সংবাদ দেয় বলিয়া বিপ্লববাদীদের সন্দেহ উদ্রেক করে। এই মৃত ব্যক্তির সঙ্গের অপর জন অল্পের জন্য মৃত্যু এড়ায়—এই ব্যক্তি ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিল।—১৯১৪ সালে এই চেষ্টা হয়।

অন্যত্র Sedition Committee Reportএ আছে—"Deputy Superintendent Basanta Chatterjee was murdered in the year 1916 in broad daylight in Calcutta." অর্থাৎ ১৯১৬ সালে ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বসন্ত চাটার্জ্জীকে কলিকাতায় দিনে দুপুরে হত্যা করা হয়।

পুলিশের এই সুযোগ্য কর্ম্মচারীকে বিপ্লববাদীরা ১৯১৬ সালে পিস্তলের গুলিতে খুন করিয়াছে। কিন্তু এই তাহাদের প্রথম চেষ্টা নহে। রামদাস গোড়ায় বিপ্লববাদী ছিল, পরে বসন্ত বাবুর সহায়তা করিয়া বিপ্লবদলের ধ্বংসকার্য্যে লিপ্ত হয়। ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে তাহাকে ঢাকায় জনাকীর্ণ স্থানে মারিয়া ফেলা হয়। বসন্ত বাবু সেখানে ছিলেন—সে যাত্রা তিনি রক্ষা পান। এই বৎসরই নভেম্বর মাসে বিপ্লববাদীরা বোমা পিস্তলে সুসজ্জিত হইয়া বসন্ত বাবুর বাড়ী আক্রমণ করে। বসন্ত বাবুর বৈঠকখানায় নিয়মিত পুলিশ কর্ম্মচারীরা একত্র হইতেন। সে আক্রমণের ফলেও বসন্ত বাবুর নিজের কিছু হয় নাই, তিনি সে যাত্রাও রক্ষা পাইয়াছিলেন।

১৯১৩-১৪ সাল হইতেই বিপ্লববাদীদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা উগ্রতর হইয়া উঠিতেছিল। সে কর্ম্মপ্রচেষ্টা যেমন দুঃসাহসিক তেমনই ভয়ঙ্কর ছিল। এই একটা ঘটনা Sedition Committee Report-এর ভাষায় দিতেছি:—"During 1913 the revolutionaries continued their activities with increased ferocity. Two police officers were murdered. On the evening of Sept. 29th Head Constable Haripada Deb was shot dead by three young Bengalis on the edge of the lake in College Square, Calcutta .... The Head Constable was assassinated in the middle of the throng, his assailants disappeared

into the crowd, no arrest was made and no evidence was forthcoming. The murdered officer had succeeded in getting into touch with a revolutionary section and it is clear that they had seen through him and decided to put him out of the way."

ইহার মর্ম্ম :—১৯১৩ সালে বিপ্লবীদের কার্য্য অত্যন্ত ভীষণভাবে চলিতে থাকে। দুই জন পুলিশ কর্ম্মচারীকে হত্যা করা হয়। হেড্ কনষ্টেবল হরিপদ দেবকে তিন জন বাঙালী যুবক কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারের জনাকীর্ণ স্থানে ২৯এ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় গুলি করিয়া মারে এবং হত্যাকারীরা জনতার মধ্যে মিশিয়া যায়। এই সম্পর্কে কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না কাহাকেও গ্রেপ্তারও করা হয় না। মৃত পুলিশ কর্ম্মচারীটি বিপ্লবীদের এক দলের সঙ্গে পরিচিত হইতে পারিয়াছিল—বিপ্লবীরা ইহা টের পাইয়াই যে তাহাকে মারিয়া ফেলে ইহাতে সন্দেহ নাই।—

এই ঘটনারই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাংলার অপর প্রান্তে "...... a picric acid bomb was thrown into the house of Inspector Bankim Chandra Chaudhuri in Mymensingh town He was instantly killed. The Inspector had been a prominent worker against the Dacca Samiti at the time of the Dacca conspiracy case and there is no doubt that the Samiti brought about his death."

অর্থাৎ পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরীর ময়মনসিংহের বাসায় একটি পিক্‌রিক এসিড্ বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে ইন্‌স্পেক্টর তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই পুলিশ কর্ম্মচারীটি ঢাকা সমিতির বিরুদ্ধে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার সময়ে বিশেষভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সমিতিই যে তাঁহার মৃত্যু ঘটাইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই।—

ইন্‌স্পেক্টর সুরেশচন্দ্র মুখার্জ্জির মৃত্যু সম্বন্ধে Sedition Committee লিখিয়াছেন—

"... .... in Cornwallis Street, Inspector Suresh Chandra Mukerjee, while on duty, noticed an absconding anarchist in the street and apporached to arrest him, when he was fired at by the anarchist. ....The Inspector was killed.

ইহার মর্ম্ম—কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর সুরেশচন্দ্র মুখার্জ্জি একজন ফেরারী বিপ্লবীকে দেখিতে পাইয়া যেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে অগ্রসর হয়—অমনি উক্ত এনার্কিষ্ট তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোড়ে—ইন্‌স্পেক্টর মৃত্যুমুখে পতিত হয়।—

সি. আই. ডি. কর্ম্মচারী মধুসূদন ভট্টাচার্য্যকেও মেডিক্যাল কলেজের গেটের সামনে বহুলোকের সমক্ষে মারিয়া ফেলা হয়। এইরূপ অনেক দুঃসাহসিক খুন একপ্রকার প্রকাশ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

অপরদিকে বাংলারই এক প্রান্ত সীমায় সিভিলিয়ান মিঃ গর্ডনের উদ্দেশ্যে বোমা ও পিস্তলে সুসজ্জিত হইয়া মিঃ গর্ডনেরই বাগানে

বিপ্লববাদীরা উপস্থিত হইয়াছিল। মিঃ গর্ডনের আয়ু ছিল—বাঁচিয়া গেলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে বিপ্লবাদীদেরই একজন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল। কেমন করিয়া (বসিতে কি উঠিতে) বোমা হঠাৎ ফাটিয়া গেল। মিঃ গর্ডনের বাড়ীতেই একজনের শবদেহ পড়িয়া রহিল। তাহার পকেটের দুইটি গুলি-ভরা পিস্তলই পুলিশের হস্তগত হইল।

অরুণাচল আশ্রমের হাঙ্গামায় মিঃ গর্ডন সংযুক্ত ছিলেন। বিপ্লববাদীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে তাঁহার কোনও বিরোধ ছিল না। তবে বিপ্লববাদীরা এমনই ধারার আরও দুই একটা কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, দেশের লোকের সহানুভূতি লাভ করা।

এইখানে একটা কথা, অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলিয়া রাখি। বিপ্লববাদীরা তাহাদের শত্রু মনে করিয়া—যাহারা তাহাদের ক্ষতি করিয়াছে, অত্যাচার করিয়াছে,—যাহাদের একেবারে মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে তাহাদের মধ্যে ইংরাজও ছিল, দেশীয় লোকও ছিল। কিন্তু ইংরাজের বেলায় কোন প্রচেষ্টাই সফল হয় নাই। আশ্চর্য্য রকমে তাহারা বাঁচিয়াই গিয়াছে। দেশীয় অনেকেই মারা গিয়াছে। এক ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এলেনের গায়ে গুলি ঠিক লাগিয়াছিল—কিন্তু তিনিও বাঁচিয়া গিয়াছেন। মজফরপুরে যাহাকে মারিতে ইচ্ছা ছিল সে ত মরিলই না, মরিল এমন দুইটি প্রাণী, যার জন্য বিপ্লববাদীরাও কেবল দুঃখই করিয়াছে। মিঃ গর্ডনকে একবার সিলেটে, একবার বাংলার বাহিরে মারার চেষ্টা হয়, কিন্তু সফল হয় নাই। সিলেটে, বিপ্লববাদীরাই আশ্চর্য্য

রকমে প্রাণ দিয়াছে। সেখানে সেদিনে আরও কে একজন জবরদস্ত সাহেব নিমন্ত্রিত হইয়া আসিবেন কথা ছিল। তারপর ছোট লাট, বড় লাট প্রভৃতির উপর যে চেষ্টা হয় তাহাও এই রকমেই বিফল হইয়াছে। এ রকম আরও কয় ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। বিপ্লববাদীরা এজন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়াছে। যাহাদের কোন প্রকারের কুসংস্কার ছিল, তাহারা এমনও বলিয়াছে—ভগবান যেন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতেছেন, সাহেবদের দোষ নাই। নতুবা এমন করিয়া সব ওলট-পালট হইয়া যায় কেন ?

যাহাই হউক, বাংলার বিপ্লববাদীদের অরগ্যানিজেসনও এ সময়ে অনেকটা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বাংলার নানাদিকে দলের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা চলিল। অস্ত্র অভ্যাসের প্রয়োজন হওয়ায় সেদিকেরও সুবন্দোবস্ত হইল।

Sedition Committee লিখিয়াছেন :—"The members of the Samiti had two farms (Belonia and Udaipur) in Hill Tippera. The farms were ostensibly agricultural ventures, but really places for the furtherance of the revolutionary organisation. The members of the Samiti used to practise shooting in these farms." অর্থাৎ সমিতির লোকেরা পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় বেলোনিয়া এবং উদয়পুরে দুইটি কৃষিক্ষেত্র করিয়াছিল। ফার্ম বাহ্যত কৃষিক্ষেত্রই ছিল কিন্তু আদতে বিপ্লববাদীরা এখানে অস্ত্রচালনা শিক্ষা করিত।

বাংলার বাহিরেও বাংলার বিপ্লববাদীরা কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তার করিয়াছিল। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিপ্লববাদীরা সংঘবদ্ধ হইয়াছিল। বোমা তৈরীর বিশেষ বিশেষ প্রণালী আছে। বিশেষ একটা প্রণালী অনুসরণ করিয়া বাংলার কোনও এক স্থানে যে ধরণের বোমা তৈরী হইত—তাহা ঐ স্থানের সহিত সম্পর্করহিত হইয়া অন্যত্র তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা তেমন ছিল না। গবর্ণমেণ্টের বিশেষজ্ঞদের মতে মোটের উপর তিন প্রকার বোমা এদেশে ব্যবহৃত হইয়াছে। যে বোমার নমুনা রাজাবাজারে মিলিয়াছে, সেই বিশেষ প্রণালীর বোমাই আরও কয়েক স্থানে দৃষ্ট হইয়াছে। এই একই প্রকারের বিশিষ্টতাযুক্ত বোমা লাহোরে দৃষ্ট হইয়াছে, দিল্লীতে বড়লাটের উপর এবং সিলেটে মিঃ গর্ডনের বাগানে ফাটিয়াছে। ময়মনসিংহে ও মেদিনীপুরে, সর্দ্দার সেখ সমিরের বাগান-বাড়ীতে এই একই রকমের বোমা ফাটিয়াছে। পুনাতে এবং আলিপুরের বাগানেও একই রকমের বোমার formula পাওয়া গিয়াছিল। বাংলার বিপ্লববাদীরা যে উত্তর ভারতের বিপ্লববাদীদের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাহা এই বোমার আদান-প্রদান ব্যাপারেও সম্যক বুঝা যায়। তাহার পর বিপ্লবসঙ্ঘের বিস্তৃতি লক্ষ্য করিলেও ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। Sedition Committee বিপ্লববাদীদের organisationএর ব্যাপকতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাই আমরা এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি:—"It must not be supposed that the various organisations were necessarily

small. The Dacca Anusilan Samiti and the bodies which we call the West Bengal and Northern Bengal parties were widely extended and overlapped each other's territory. The Dacca Samiti was throughout the whole period the most powerful of these associations. The existence of this body alone, even if there had been no other, would have constituted a public danger." অর্থাৎ—সবগুলি সমিতিই যে ছোট ছিল তাহা মনে করা ভুল। ঢাকা অনুশীলন সমিতি এবং পশ্চিম বঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের দল বলিয়া যে সমিতিকে বলা হয়, তাহা একে অপরের সীমা অতিক্রম করিয়া বিস্তৃত হইয়াছিল। বিপ্লবী সমিতির মধ্যে ঢাকা সমিতি বরাবরই খুব প্রভাবশালী ছিল। যদি অপর কোন দল না-ও থাকিত, এই একটী দলের অস্তিত্বই বিপজ্জনক বলিয়া গণ্য হইতে পারিত।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে এই সমিতি অত্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। Sedition Committee এ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"In after years it spread itself over all Bengal and extended its operations to other provinces. While its orgnisation was most compact in Mymensingh and Dacca, it was active from Dinajpur in the north-west to Chittagong in the south-east and from Cooch Behar on the north-east to Midna-

pore on the south-west. Outside Bengal we find its members working in Assam, Bihar, the Punjab, the United Provinces, the Central Provinces and at Poona." অর্থাৎ পরবর্ত্তী সময়ে এই ঢাকা অনুশীলন সমিতি সমগ্র বাংলায় বিস্তৃত হয় এবং কার্য্যক্ষেত্র অপর প্রদেশে বিস্তার করে। ময়মনসিংহে ও ঢাকায় এই সমিতি খুব জমাট ছিল। উত্তর-পশ্চিমে দিনাজপুর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত এবং উত্তর-পূর্ব্ব কুচবিহার হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত ইহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। বাংলার বাহিরে এই দলের লোক আসাম, বিহার, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও পুনায় কার্য্য করিতেছিল।

এই ত গেল এক ঢাকার দলের বিস্তৃতির কথা। ইহা ছাড়া, পশ্চিম বঙ্গের ও কলিকাতার দল ছিল, মাদারীপুরের দল, বরিশালের দল, উত্তর বঙ্গের দল, ময়মনসিংহের দল ত ছিলই। প্রত্যেক দলই কর্ম্মক্ষেত্র বৃদ্ধি করিতেছিল। দুই একটী দল (যথা মাদারীপুর) মূল ঢাকার দল হইতেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পরে বিস্তৃতি লাভ করে। বাংলার চন্দননগরের দলের সঙ্গে ঢাকার দল (অনুশীলন। সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হইয়া গিয়াছিল—যথাস্থানে বাংলার বিপ্লববাদীদের সঙ্ঘের ব্যাপকতার কথা বলা হইবে।

অনেক সময় বিপ্লববাদীদের প্যাম্ফ্লেট একই নির্দ্দিষ্ট দিনে চট্টগ্রামের প্রান্তভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্জাবের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত বিতরিত হইত। বলা বাহুল্য, গভর্ণমেণ্ট এই বিস্তৃত সংবদ্ধ

connected সঙ্ঘ দেখিয়া ইহার প্রতিকারের সুবন্দোবস্তও সঙ্গে সঙ্গেই করিতেছিলেন। সরকারী অনেক পুলিশ কর্ম্মচারী এদিকে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। শত্রু মনে করিলেও ঐ কৃতিত্বের জন্য বিপ্লববাদীরা তাহাদের বাহবা দিয়াছে।

খুন সম্পর্কে আর একটা কথা বলা দরকার। বিপ্লববাদীদের জঙ্গী বিভাগ (Violence Department) হইতে লোক নির্ব্বাচিত হইয়া কোনও লোককে খুন করিতে হয়ত নিযুক্ত হইল। কিন্তু খুন করিবার হুকুম লইতে হইত পরিচালক বিভাগ হইতে। পরিচালকেরা হুকুম দিয়াই সরিয়া থাকিত—যাহাতে ধরা না পড়ে। কারণ পরিচালকেরা ধরা পড়িলে দলের ক্ষতি হইত বেশী। পরলোকগত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের খুন-ব্যাপারে সিডিশন্ কমিটি রিপোর্টে লিখিতেছেন যে, পাঁচ জন ব্যক্তি মসার পিস্তল ও রিভলভারে সুসজ্জিত হইয়া "......led by the chief of the Violence Department, carried out their attack on their victim under the orders of three organisers who, in accordance with the rules of the society, withdrew themselves before the actual commission of the crime, in order that the society might not be crippled by their arrest."

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিপ্লববাদীর পরিচয়

ভাগ্যবশেই হউক বা যে কারণেই হউক বাংলায় রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন যাহা হইয়াছে তাহা বিপ্লবের ফলে ; ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক প্রয়োজনের খাতিরে নহে। তাই দেখি, তাহার রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের প্রয়াসের সঙ্গেও সমগ্র বাঙালী জাতির তেমন কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বাঙালীর দুঃখ বাড়িয়াই চলিয়াছে। পলাশী-প্রাঙ্গণে বাঙালী যে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া আসিল—তাহা ইংরাজের শৌর্য্যবীর্য্যের ফলে নহে। বাঙালীজাতিকে ইংরাজজাতি ঠিক যুদ্ধ করিয়া পরাজিত করে নাই। বাংলার ভিতরকার দুর্ব্বলতাই বল, বা দুষ্ট শক্তিই বল, বিপ্লব ঘটাইয়া রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল। সমগ্র বাংলার অবস্থা তখন অতি শোচনীয়। প্রজাকুল নিঃস্ব, অজ্ঞ। ধনীরা বিলাসী, অত্যাচারী, আত্মকলহে রত। বাংলার রাষ্ট্র ও সমাজে বিশৃঙ্খলা, দুঃখ দৈন্য বাঙালীর অসহ্য হইয়াছে। তাই বাঙালীর রাষ্ট্রশক্তিকে বাঙালী অভিসম্পাত করিয়াই যেন চূর্ণ করিয়া দিল। কিন্তু ক্রমোন্নতির প্রভাবে সে পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই বলিয়া বাঙালী জাতিহিসাবে, তাহাতে বড় হইতে পারে নাই। তাহার

অর্থসমস্যা, সমাজসমস্যা, স্বাস্থ্যসমস্যা, অন্নসমস্যা জটিল হইয়াই দেখা দিয়াছে।

তার পর ইংরাজ তাহার শিক্ষা ও সভ্যতার বেসাতি লইয়া আসিল। বাংলা সেই শিক্ষা ও সভ্যতাকে ক্রমবিকাশের প্রয়োজনে গ্রহণ করে নাই। কতকটা সামাজিক বিপ্লবের পথেই তাহা গ্রহণ করিয়াছে। জীর্ণ, প্রাণহীন সমাজকে চূর্ণ করিয়াই সেদিকে বাংলা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সেই শিক্ষা ও সভ্যতারই ফলস্বরূপ বর্ত্তমান নব্য বাঙালীর সৃষ্টি। সেই শিক্ষা ও সভ্যতার যতখানি বিষ উদরস্থ করিতে বাঙালী বাধ্য, তাহা সে করিয়াছে। অবশ্য সে শিক্ষা-সভ্যতার গুণও কতকটা সে লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে বাঙালী জাতিহিসাবে শক্তিশালী হয় নাই। শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব বাঙালী দেখাইলেও তাহার অন্নসমস্যা, স্বাস্থ্যসমস্যা, সমাজসমস্যা ও ভীষণ দারিদ্র্য একটুও কমে নাই, কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে। অথচ শিক্ষালাভ করার ফলে বাঙালীর অস্বস্তি অনেকখানিই বাড়িয়াছে। বাংলার নেতাই বল আর কর্ম্মীই বল জাতিকে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিয়া অর্থে সামর্থ্যে স্বাস্থ্যে শক্তিশালী করিবে, তেমন মর্জ্জি কাহারও বড় হয় নাই। একটা রাষ্ট্রীয় দ্রুত পরিবর্ত্তন আকাঙ্ক্ষা সকলেই করিয়াছে। নিজেদের রুচি অনুযায়ী, সেই দ্রুত পরিবর্ত্তন, মধ্যপন্থীরা একভাবে চাহিয়াছেন, উগ্রপন্থীরা একভাবে চাহিয়াছেন, আবার বাংলার বিপ্লববাদীরা আর-একভাবে চাহিয়াছে।

*   *   *

বাংলার বিপ্লববাদীরা তাহাদের কর্ম্মশক্তি শুধু বাংলায়ই আবদ্ধ রাখে নাই। বাংলার বাহিরেও তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাহাদের শাখা যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতিতেও বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, একথা বলিয়াছি।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার বিপ্লববাদীরা নূতন ভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। বাংলার বিভিন্ন দিকে ছোট বড় বিভিন্ন সমিতি কাজ করিতেছিল। স্বদেশী আন্দোলন হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত সমস্ত সমিতিই সমান কার্য্যক্ষমতা দেখায় নাই। বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল বলিয়াই, অনেকে তেমন সুযোগ করিয়াও উঠিতে পারে নাই। কিন্তু ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজের সঙ্গে জার্ম্মাণীর যুদ্ধ বাধিয়া গেল তখন বাংলার অধিকাংশ সমিতিই সম্মিলিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। স্থানে স্থানে বিপ্লববাদীদের শলা-পরামর্শ চলিল,—'এবার বড় সুযোগ আসিয়াছে, এ সুযোগ ছাড়িব না। ইংরাজকে বড় কায়দায় পাওয়া গিয়াছে; এখন না হইলে আর হইবে না।' কেহ কেহ এমন আপশোষও করিলেন, 'যদি পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা করিতাম, তবে এ অবসরে নিশ্চিতই অভীষ্ট সিদ্ধ হইত।' এমন একটা সুযোগ এত শীঘ্র আসিবে, একথা যদি নিশ্চিত জানা থাকিত, আর বাংলার বিপ্লববাদীদের সকল সমিতিগুলিই যদি সম্মিলিত হইয়া সমানভাবে সেজন্য গোড়া হইতে প্রস্তুত হইতে থাকিত, তবে অবস্থা সঙ্গীন হইয়াই যে উঠিত ইহাতে সন্দেহ নাই। ১৯১৫ সালে বিপ্লব-চেষ্টা প্রশমিত করিতে ভারত গবর্ণমেণ্টের বেশী বেগ পাইতে হয় নাই, কিন্তু চারিদিকে

অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছিল, যে-ভাবে অল্পসংখ্যক সৈন্যের হস্তে গভর্ণমেণ্টকে তখন নির্ভর করিয়া থাকিতে হইয়াছিল, ইংরাজ সৈন্য যে-ভাবে ভারতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল, ভারতের সাধারণ লোকের মনোভাব যে-ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছিল, ভুলবশতই হউক বা যে কারণেই হউক ইংরাজের শক্তি-সামর্থ্য বিষয়ে ভারতবাসীর মনোভাব যে-ভাবে বদলাইয়া গিয়াছিল, তাহাতে একথা মনে করা অসঙ্গত নহে, যে বিপ্লববাদীদের চেষ্টা আরও পূর্ব্বে আরম্ভ হইলে, ভারতের বিপ্লববাদীদের দমন করা সহজসাধ্য হইত না। ইহার জন্য ইংরাজকে অনেকখানি বেগ পাইতে হইত।

যাহাই হউক, বাংলার বিপ্লববাদীরা সকলেই ১৯১৪ সাল হইতে নবোৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া পড়িল। বন্দুক পিস্তল সংগ্রহের প্রবল চেষ্টা চলিতে লাগিল। অর্থসংগ্রহের নানা চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই সময়ে রডা (Roda) কোম্পানীর পঞ্চাশটি মসার পিস্তল কলিকাতার বিপ্লববাদীদের চেষ্টায় বিপ্লববাদীরা করায়ত্ত করে। বিপ্লববাদীরা তখন যে-সমস্ত কাজ করিত, তাহার পক্ষে এই পঞ্চাশটি পিস্তল কম নহে। কিন্তু পিস্তলগুলি সবই বিপ্লববাদীরা লুকাইয়া রাখিতে পারিল না। কার্ত্তুজ অনেকগুলিই পুলিশ অল্পদিনের মধ্যে হস্তগত করিয়া ফেলিল, পিস্তলও ধরা পড়িতে লাগিল।

রডার বন্দুক চুরির সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশের কাজও খুব বাড়িয়া গেল। বিপ্লববাদীরা ইতিপূর্ব্বেই যে রকম বেপরোয়া ভাবে তাহাদের

অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া চলিয়াছিল, তাহাতে এই রকম পঞ্চাশটা পিস্তল যদি এক সঙ্গে পায় তবে যে একটা শক্ত গোলমাল বাধাইয়া তুলিতে তাহাদের বেশীক্ষণ লাগিবে না, তাহা পুলিশ বুঝিল। ধর-পাকড়ের ধুম লাগিয়া গেল। কলিকাতায় আমরাও এমনই সময়ে ধৃত হইলাম। গভীর রাত্রিতে কাহাকেও না জাগাইয়াই পুলিশ বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সাহেবদের কথা কানে যাইতেই নিদ্রা ভাঙ্গিল। সেখানে সন্ন্যাসী বা সাধু ওরফে শিশির কুমার গুহের সঙ্গে গ্রেপ্তার হইলাম। এই ঘটনা ১৯১৪ সালের শেষ ভাগে ঘটে।

সাধু গৈরিক বসন পরিহিত, মস্তকে উষ্ণীষ। সাধুর কোমরে দড়ি দেখিয়া রাস্তার একজন লোক বলিল, 'শালা সাধু চোর।' সাধু এবং আমি এক সঙ্গেই হাঁটিয়া যাইতেছিলাম, সাধু ঐ উক্তি শুনিয়া আমাকে ঠেলিয়া বলিলেন, 'ছিলাম ডাকাত হ'লাম চোর, মান আর থাকে না।' লালবাজারে গিয়া আর সাধুসঙ্গ মিলিল না, সাধু রহিলেন এক ঘরে, আমি আর এক ঘরে। রডার ব্যাপারেও কয়েকটি গ্রেপ্তার হইয়া ওখানে আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। রাত্রিতে আমার ঘরে (ঘরে আমি একা ছিলাম) একটি শিক্ষিত মাড়োয়ারী যুবক আসিলেন। তিনি কতক্ষণ পরে আলাপ আরম্ভ করিলেন। তিনি যে 'স্বদেশী' হাঙ্গামায় আসিয়াছেন, তাহাই আমাকে বুঝাইতে ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। মাড়োয়ারী বিপ্লববাদী হইয়াছে, একথা সহজে বিশ্বাস করা গেল না। শেষে জানিলাম,

"রডা-কেসে" তাঁহাকে সন্দেহে গ্রেপ্তার করিয়াছে। নির্দ্দোষী বেচারী এটর্নী হইবার চেষ্টা করিতেছিল,—মুক্ত হইয়াছে।

আমাদের বিপ্লববাদীদের হাজতবাসে বা জেলবাসে বাপ মা, বা ভাই বন্ধু কেহ বড় একটা খাবার দিয়া যাইত না, ইহাই দস্তুর। মাড়োয়ারীর বাপ মস্ত ধনী মেলাই খাবার দিয়া গেলেন, সাহেব ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিলেন। পরের দিন বৈকালে মাড়োয়ারী যুবক ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ হইতে যখন ফিরিয়া আসেন, তখন এক মেম-সাহেব নাকি রাস্তায় তাঁহাকে চোর মনে করিয়া সঙ্গী সার্জ্জেণ্টকে কি বলিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল। শিক্ষিত ধনী মাড়োয়ারী যুবক তাহাতে সত্যই বড় মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। আসিয়া একেবারে কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন,—'কি লজ্জা দেখুন, আমাকে চোর বলিল!' মুখে দুঃখপ্রকাশ করিয়া মনে মনে বিপ্লববাদীরা যে সমস্ত বিশেষণে দেশবাসী ও পুলিশ কর্ত্তৃক বিশেষিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলাম, আর নিজের মনে নিজে বলিলাম, 'লোকের কথায় কিবা আসে যায়'।

লালবাজারে দুই দিন ছিলাম। খাওয়ার সময় খাইতে গিয়া দেখি, সেখানে শুধু সাধুই নহে, পরিচিত আরও কয়েকটি গ্রেপ্তার হইয়া আসিয়াছে। অনেক দিনের ফেরারী একজনও সেই সঙ্গে। ভ্রাতা শ্রীমান —কেও দেখিলাম, গ্রেপ্তার হইয়া আসিয়াছে। বুঝিলাম, 'কেহ না রহিবে বংশে দিতে বাতি'। কালের হাত পড়িয়াছে, নতুবা শুধু পুলিশের চেষ্টায় এতদিনের absconder ধরা পড়ে না।

এই ধর-পাকড়ের ব্যাপার ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। যাহারা ঘর-ছাড়া লোক তাহাদেরও নিষ্কৃতি নাই—অচেনা যাহারা তাহারাও চেনা হইতে লাগিল। কেন, ইহার কারণ আছে। এই ঘর-ছাড়াদের মধ্যে মামলার ফেরারী আসামীও ছিল, আর বাড়ী ঘর ছাড়িয়া একেবারে নূতন নাম গ্রহণ করিয়া কাজ করিবার লোকও জুটিয়াছিল বিস্তর। ১৯১০ সালের পরে বাড়ী ঘরে থাকিয়া কাজ করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। বিপ্লববাদীদের অনেকের পিছনে ১৯১৩-১৪ সালে দশ বার জন পর্য্যন্ত গুপ্তচর লাগিয়া থাকিত। দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টাই তাহারা ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিত। তবু বিপ্লববাদীরা গুপ্তচরদের ফাঁকি দিয়াই সময় সময় অদৃশ্য হইয়াছে। গুপ্তচর চাকরী বজায় রাখিতে যা-হোক্ একটা রিপোর্ট দিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছে।

এত অনুসরণ করিলে কাজ করা অসম্ভব, সুতরাং ইহারা খুব বেশী কাজ করিতে পারিত না। কিন্তু যাহারা ঘর-ছাড়া তাহারা অনেকটা নিরাপদ। যে দুই চার জন পুলিশ কর্ম্মচারী তাহাদের চিনিত, তাহাদের চোখ এড়াইয়া চলিতে পারিলেই হইল। অনেকে ১৯০৭ সাল হইতে আত্মগোপন করিয়া ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত পুলিশের দৃষ্টি সমভাবেই এড়াইয়া চলিয়াছে। অথচ বাংলার প্রত্যেক জেলায়, সবডিভিসনে, অসংখ্য গ্রামে, ইহারা নিয়ত যাতায়াত করিয়াছে। ইহাদের কাহারও নামে হয়ত পুরস্কার ঘোষিত আছে। ষ্টেশনে ষ্টেশনে, নদীর মুখে মুখে তখন সন্দেহ হইলেই তল্লাস করা হইত। এ সমস্ত ঘর-ছাড়া লোকেরা এই

বিপদের মধ্য দিয়াই যাতায়াত করিয়াছে ; সঙ্গে আবার অনেক সময় অস্ত্র-শস্ত্রও থাকিত। মোট কথা, এ সমস্ত ঘর-ছাড়া বিপ্লববাদীদের—যাহাদের প্রত্যেকেই তখন ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়াছে, যাহাদের প্রত্যেককেই পুলিশ ধরিতে চাহে, যাহাদের অনেককে আবার পুলিশ নামে মাত্র জানে কিন্তু আকৃতিতে চিনে না—ধরা পুলিশের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইত, যদি না এই ঘর-ছাড়া লোকদের ঘরের লোকেই তাহাদের ধরাইয়া দিত। বিপ্লববাদীদের ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও তাহাদের এই গোপনতার মধ্যে, এই পলাতক জীবনের মধ্যে যে দুঃখ কষ্ট, নিষ্ঠা ও ত্যাগ রহিয়াছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। বিপ্লববাদীর একদল এমনই দুঃখ কষ্টের মধ্যে দলের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করিত,—কিন্তু, তাহাদের পাশে আবার তাহাদেরই লোক দাঁড়াইয়া, দুঃখ কষ্টের হাত এড়াইতে, বা অন্য কোনও প্রলোভনে তাহাদের পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিয়াছে। ১৯১৫-১৬ সালের পর হইতে দলের বাঁধুনি কতকটা কমিয়া যায়। তখন কেহ কেহ মনে করে, বিপ্লবের এই শেষ হইল। সবই গিয়াছে, আর কেন, পুলিশের হাত এড়াইতে, জেল হইতে বাঁচিতে, সব বলিয়া দিই। প্রধানত এই সমস্ত কারণে আর পুলিশের চেষ্টায়ও কতকটা, ফেরারীরাও ধরা পড়িতে লাগিল। অচেনা যাহারা তাহারাও চেনা হইল।

যাহাই হউক, ১৯১৪ সালের শেষ ভাগের কথাই বলি। তখন ধর-পাকড় খুব আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু চালকেরা অনেকে

তখনও ধরা পড়েন নাই। এদিকে যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে, পুলিশের দৃষ্টি খরতর হইয়াছে।

একদিকে আশা আকাঙ্ক্ষা, একদিকে নূতন নূতন বিপদ, আর একদিকে নব নব দায়িত্বপূর্ণ কাজে হাত দেওয়া, এ সমস্ত চিন্তা তখন বিপ্লববাদীদের মধ্যে দেখা দিল।

কলিকাতায় এখন যেখানে মহিলা উদ্যান, সেখানে নানা কেন্দ্র হইতে বিপ্লববাদীরা আসিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে একত্র হইয়াছে, আরও দুই চার জনের আসিবার কথা। ইহার মধ্যে আট দশ বছরের ফেরারীও আছে। অনেককে ধরিবার জন্য পুলিশের কর্ত্তারা ব্যাকুল হইয়াছেন। সেদিন পুলিশেরই সুপ্রভাত। তাহার কারণ, পুলিশের কার্য্যকুশলতা নহে; তাহার কারণ বিপ্লববাদীদেরই কাহারও বিশ্বাসঘাতকতা। পুলিশ ঠিক খবর পাইয়াছে। তাহারা সদলবলে, সমস্তটা পার্ক ঘিরিয়া ফেলিল। কোনও প্রকারে বিপ্লববাদীরা না পলাইতে পারে, সে আট-ঘাট বাঁধিয়াই আসিল। পার্কে ঢুকিতেই বিপ্লববাদীরা বুঝিতে পারিল। কতক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি হইল। হাত খালি, সুতরাং কেবল হাতাহাতিই চলিল। কেহ কেহ রেলিং ডিঙ্গাইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল, অসংখ্য পুলিশ কর্ম্মচারী পূর্ব্ব হইতেই সজ্জিত ছিল। শ্রীমান বী—পলাইয়া পাশি বাগানের মোড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। সেখান হইতে সে দেখিল, জনৈক বিপ্লববাদীকে পুলিশ প্রহার করিতেছে। শ্রীমানের পলায়ন করা হইল না, ফিরিয়া দাঁড়াইল—'মরিতে হয় ত সকলে মরিব, একলা বাঁচিব না।' পুলিশ কর্ম্মচারীরা অগ্রসর

হইল। শ্রীমান দুই জনের গলা দুই হাতে টিপিয়া ধরিয়াছে—এমন সময় জনকয়েক সাহেব কর্ম্মচারী আসিয়া পৌছিল। লোম্যান সাহেব প্রভৃতি নামজাদা সি. আই. ডি'র কর্ত্তারাও সেদিনকার এই মস্ত শীকারকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। চারিদিক হইতে শ্রীমানকে যখন চাপিয়া ধরিয়া হাতখানা ভাঙ্গিয়া ফেলার যোগাড় করিয়াছে তখন শ্রীমান অগত্যা একটী জ্যুবুৎস্যুর কৌশলে লোম্যান সাহেবের দক্ষিণ হস্তখানি কিঞ্চিৎ ভাঙ্গিয়া দিল।

শুধু এই গ্রেপ্তারই নহে, ইহার দুই চার দিনের মধ্যেই আর একজন বিপ্লববাদীকে রাস্তায় গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি যক্ষ্মা রোগে ভুগিতেছিলেন। এক সন্ন্যাসীর ব্যবস্থামতে রোজ গঙ্গাস্নান করিতেন। সেখান হইতে ফিরিবার সময় তাঁহাকে গঙ্গার ঘাটে ধরা হয়। ঘরের খুব জানা-শুনা লোকে ধরাইয়া না দিলে যে ইঁহাকে ধরা সহজ হইত না, ইহা বলা বাহুল্য। ১৯০৬ সালে একবার ইনি ধৃত হন, পরে ফেরারী হইয়া থাকেন। তাহার পর ১৯১২ সালে হেড কনষ্টেবল রতিলাল রায়ের খুন সম্পর্কে ধৃত হন। সেবারেও আইনের ফাঁকে খালাস হইয়া গেলেন। পরে পুলিশ যখন অন্য ব্যাপারে তাঁহাকে আটকাইবার মতলবে বাড়ীতে উপস্থিত হইল, তখন তিনি বাড়ী ছাড়িয়া আবার রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। পুলিশ ভাবিয়াছিল দুইটা দিন অবশ্যই বাড়ীতে থাকিবে। কিন্তু যখন অনুসন্ধান হইল তখন দেখা গেল তিনি অদৃশ্য হইয়াছেন। যাহাই হউক, ইঁহাকে ১৯১৪ সালের শেষ ভাগে পুলিশ ধরিয়া ফেলে। ইঁহাকে চিনিতে পারার মত পুলিশ

কর্ম্মচারী তখন বাংলায় বড় ছিল না। দলের লোকের মধ্যেও খুব বিশিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন তাঁহার প্রকৃত নাম কেহ জানিত না। ঘরের লোকের অঙ্গুলি সঙ্কেতেই পুলিশ তাঁহাকে হাতের মধ্যে পাইল। ধৃত হইয়াছিলেন যক্ষ্মা অবস্থায়। আমরা জানিয়াছি, তিনি জেলে থাকিতে তাঁহার যক্ষ্মা সারিয়া গিয়াছে। জেলের আদর যত্ন কি এত বেশী যে তাঁহার যক্ষ্মা ভাল হইল? তাহা নহে। বাহিরে এই যক্ষ্মা লইয়াই যে অনিয়ম, যে পরিশ্রম করিতেন, রৌদ্র বৃষ্টি সমানভাবে মাথায় করিতেন, তাহা জেলে যাওয়ায় বন্ধ হইল। জেলের কঠোরতা, সেলে আটক, প্রভৃতি দুঃখ হইতেও ইঁহারা বাহিরে থাকিতে বেশী দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেন। সেই স্বেচ্ছায় দুঃখভোগ, সেই দুঃখভোগের নিষ্ঠা, যাহারা দেখিয়াছে— তাহারা জানে, ইঁহারা সাধারণ মানুষ নহেন। ইঁহাদের শুধু খুনী বল, শুধু ডাকাত বল, অমানুষ বল, যাহা ইচ্ছা বল,—কিন্তু ইঁহারা সাধারণ মানুষ নহেন। ইঁহাদের জীবন উন্নত কি না তাহা জানি না, তবে অসাধারণ। আর কাহারও বিবরণ দিব না, সংগ্রহ করাও অসম্ভব। আমরা এই একজনের কথাই সামান্য কিছু বলিব।

*　　　*　　　*

নারদ ভক্তিসূত্রে আছে, ভক্তি নিজেই ফলস্বরূপা। এই প্রেম-ভক্তি মানুষকে আত্মারাম করে। মানুষ ইহার আস্বাদন পাইলে, 'অমৃতো ভবতি,' 'তৃপ্তো ভবতি'।

ভগবৎপ্রেমে মানুষ আনন্দ অনুভব করে—মানুষ শ্রেষ্ঠ হয়, মানুষ 'অমৃতো ভবতি,' কিন্তু দেশপ্রেমে, মানুষ তেমন আনন্দ

অনুভব করে কি, মানুষ শ্রেষ্ঠ হয় কি, অমৃত হয় কি? প্রেম যাহাকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠুক, তাহার গতি-প্রকৃতি কি একই ধারার? একজন মানুষকে আশ্রয় করিয়া অথবা একটি শালগ্রামশীলা বা ঐ রকম একটা কোন বস্তুকে আশ্রয় করিয়া যদি মানুষের প্রেম গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহাতে করিয়াই যদি মানুষ মানুষ হইতে পারে, শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে, তবে দেশকে আশ্রয় করিয়া তাহা সম্ভব কি?

বিপ্লববাদী দেশকে ভালবাসে শুনি; শুনি দেশের প্রতি তাহার প্রেম অনন্যসাধারণ, দেশের জন্য সে সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিতে উদ্যত। এই একনিষ্ঠায় তাহার জীবন উন্নত হইয়াছে কি? ধর্ম্মজীবন লাভ করিলে মানুষ উন্নত হয়। সে উন্নতি আমরা বুঝি—তাহার ত্যাগে, চরিত্রমাধুর্য্যে, নিষ্ঠায়, ভক্তিতে, স্থৈর্য্যে। দেশসেবা যদি ধর্ম্ম, আর সেই দেশসেবা যদি খাঁটি হয়, তবে মানুষ কেমনটি হইবে? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে জনৈক বিপ্লববাদীকে (ধরুন তাঁহার নাম অনন্তকুমার) পুলিশ রাস্তায় গ্রেপ্তার করে। তিনি তখন যক্ষ্মারোগে ভুগিতেছিলেন। অনন্তকুমারকে আমরা সমালোচকের দৃষ্টি নিয়া লক্ষ্য করিয়াছি। শুধু এই পরীক্ষা লইবার জন্য যে, ইঁহারা মানুষ হিসাবে কতটা উন্নত হইয়াছেন, দেখিব। ইঁহাদের জীবনী কেহ লিখিবে না, আমাদেরও লিখিবার উপায় নাই—কারণ কোন অবস্থায়ই লিখিবার অনুমতি মিলিবে না। সেই বিরক্তি আশঙ্কা করিয়াই তাঁহার প্রকৃত নাম দেওয়ার ভরসা হইল না।

অনন্তকুমার ঘর বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছেন। সুদিনে দুর্দ্দিনে তিনি অবিচলিত। যাহাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বাহির হইয়াছেন—সেদিকে একৈক লক্ষ্য। তাঁহাকে সুদিনেও যেমন নীরবে, অবিচলিত চিত্তে, নিরলস ভাবে কর্ম্ম করিতে দেখিয়াছি, দুর্দ্দিনেও তেমনই দেখিয়াছি। ইঁহার ভরসা যে কোথায় বুঝিতাম না। কৃতকার্য্য হইলেও উৎফুল্ল নহেন, অকৃতকার্য্য হইলেও অবসাদগ্রস্থ নহেন। কি একটা আনন্দ যেন বুকের মধ্যে জমিয়া আছে! গীতায় আছে, কর্ম্মেই অধিকার, ফলে নহে। সেকথা আমরা যাহারা বলি, সংস্কৃত শ্লোক অনর্গল বলিয়া যাই—সেই আমরা বিফল হইলে ভগ্নমনোরথ জনিত দুঃখ যথেষ্ট ভোগ করি! কিন্তু অনন্তকুমারকে গীতার শ্লোক আওড়াইতে শুনি নাই, কিন্তু গীতার ঐ বাণী তাঁহার মধ্যে সার্থক হইয়াছে, দেখিয়াছি।

দলের অর্থ যেন তাঁহার কাছে বুকের রক্ত হইতেও মূল্যবান। অর্থব্যয় সম্বন্ধে এত কৃপণতা, কৃপণ ভিন্ন কেহ করিতে পারে না। সহস্র সহস্র টাকা হাতে আসিয়াছে কিন্তু নিজে, যে হোটেলে খরচ কম, সেখানেই আহারের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। যে সময়কার কথা বলিতেছি তখন ছাত্রদের মেসে সাধারণত এক বেলার খোরাক খরচা ছিল তিন আনা। হোটেলে ছিল দুই আনা। অনন্তকুমার খুব না ঠেকিলে, তিন আনা ব্যয় করিয়া মেসে খাইতেন না। তাঁহার গায়ে দেখিয়াছি একটা শক্ত কোট। সেই একটা কোটই তিনি শীত ও গ্রীষ্মে সমভাবে গায়ে দিতেন। ময়লা হইলে নিজে কাচিয়া লইতেন। সেই কোটেরও গায়ে তালি

দেখিয়াছি। অত্যধিক পরিশ্রম করিলে মানুষ এক-আধটু জলখাবার খায়। কিন্তু তাঁহাকে দুই বেলা ভাত খাওয়া ছাড়া আর কিছু খাইতে আমরা দেখি নাই। ভবানীপুর হইতে কলিকাতা প্রায়ই হাঁটিয়া আসিয়াছেন, মোটর ত স্বপ্নের অতীত, ট্রামেও চড়েন নাই। একবার মনে আছে দারুণ গ্রীষ্মে অনেকটা রাস্তা হাঁটিয়া পার্কের ভিতরে আসিয়া একটা ছায়ায় বসিয়াছেন, মুখে ক্লান্তির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। বলিলাম 'চলুন ঐ সরবতের দোকানে।' পয়সা তিনি যে ব্যয় করিবেন না, তাহা জানিতাম। বলিলাম, 'পয়সা আমার সঙ্গে আছে, চলুন।' অনন্তকুমার হাসিয়া বলিলেন, 'সরবত ছেলেমানুষে খায়—আর খায়—যারা নবাব সওকৎজঙ্গ।' ভোগ-বিমুখ অনন্তকুমারকে কখনও ত্যাগের বক্তৃতা দিতে শুনি নাই। কিন্তু তাঁহার সমগ্র জীবনটা, জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপার ছিল এই ত্যাগ-নিষ্ঠায় মণ্ডিত। অথচ কোথাও কোনও আড়ম্বর নাই, কোনও অভিনয় নাই! তিনি কতটা ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন তাহা বুঝিবার সাধ্য কি? একদিনের দুদিনের পরিচয়ে, কথাবার্ত্তায় একটুও পরিচয় পাওয়া যাইবে না। বলিয়াছি, অনন্তকুমারকে বিশেষভাবে সমালোচকের দৃষ্টি নিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলাম—তাই কতকটা জানিয়াছি। একবার তাঁহাকে একটা বাসায় থাকিবার জন্য কয়েকটা টাকা দেওয়া হয়—সে টাকা খুবই সামান্য, তাহাতে কোন রকমে কায়ক্লেশে চলিতে পারে। কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম—তিনি ঐ সামান্য টাকা হইতেও টাকা বাঁচাইয়া অন্য একটি বিপ্লববাদীর প্রয়োজনীয় খরচ জুটাইয়াছেন। সহজে সেকথা জানা যায় নাই,

অনেক দিন পরে তবে সেকথা বাহির হইয়াছে। 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।' গৌর-ভক্তদের এই লক্ষণ অনন্তকুমারের মধ্যে ষোল-আনা দেখিয়াছি। কোন চেষ্টা নাই, অভিনয় নাই, কথা নাই, আড়ম্বর নাই—এ যেন তাঁহার স্বভাবধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। তিনি যেন সবার চাইতেই ছোট; হিমালয় ও ধরণীর মতই যেন তিনি সহিষ্ণু—ভয় নাই, ভাবনা নাই, রাগও নাই। অথচ যে পথে পা দিয়াছেন তাহাতে ভয়, ভাবনা ও রাগের কারণ যথেষ্টই আছে।

কিন্তু প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে ছাড়িবে কেন? শরীরের উপর এত বড় অত্যাচার, অনিয়ম সহিল না। কাসি দেখা দিল। বলা বাহুল্য অনন্তকুমারের কোন medical attendance আসিল না। একটু একটু কাসি বৈ ত' নয়? কত লোকেই ত' কত কাসে! সেই কাসি লইয়াই অনাহার, অনিদ্রা, পরিশ্রম সাধারণ মানুষের কল্পনাতীত।

অনন্তকুমার ফেরারী। পুলিশের নজর এড়াইয়াই তিনি চলেন। তবে বহুদিন হইয়া গিয়াছে এখন অনেকটা নিরাপদ। অল্প সময়ে বেশী কাজ করা যায় বলিয়া আজকালকার কংগ্রেসকর্ম্মীরা মোটর ব্যবহার করেন, অনন্তকুমারের এই সু-বুদ্ধি তখন জন্মায় নাই। যাহা হউক অনন্তকুমার পায়ে হাঁটিয়াই, সেই কাসি বুকে লুকাইয়া দিনের পর দিন কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। যখন হাঁটার কাজ থাকে না তখন বাসায় বসিয়া ভাঙ্গা রিভলভারটী বাহির করেন। কাসি বাড়িয়া উঠিল, হাঁপানির

অবস্থা। ক্রমেই বন্ধুবান্ধবদের কাছে ধরা পড়িতে লাগিল। শরীর যে দুর্ব্বল হইতেছে তাহাও আর লুকান সম্ভব নহে। অনুরোধে, তিরস্কারে, শেষে ডাক্তারের কাছে গেলেন। যে ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় ছিল অর্থাৎ টাকা লাগিবে না, সেখানেই গেলেন। বন্ধুবান্ধবেরাও নানা কাজে থাকে। সব সময় এ নিয়া পীড়াপীড়িও করিতে পারে না। সকলের আহার-বিহারেও নিশ্চয়তা নাই। যাক্ ডাক্তার একটা মিক্শ্চার দিলেন। দৈনিক চার বার ঔষধ খাইতে হইবে। সপ্তাহখানেক মাত্র ঔষধ খাইয়া একদিন ডাক্তারের কাছে গিয়া অনন্তকুমার বলিলেন, 'ডাক্তার বাবু, এমন একটা ওষুদ দিন, যা' জল দিয়ে খেতে না হয়, গ্লাসেরও দরকার না হয়।' ডাক্তার বুঝিলেন, বুঝিয়া একটা পেটেণ্ট ট্যাবলেট দিলেন। অনন্তকুমারের সুবিধা হইল ; ঔষধ খাওয়ার জন্য আর তাঁহার বাসায় আসার প্রয়োজন নাই। রাস্তায় হাঁটিয়াই ট্যাবলেট মুখে ফেলা যায়। জলের কল ত রাস্তায়ই আছে। একদিন বলিলাম, 'ওষুদ যে খান না, মারা যাবেন ত শেষে!' অনন্তকুমার অমনি হাসিয়া বলিলেন, 'হাঁ, মরা গাছের ফল কিনা, একটু সর্দ্দিকাসি হ'লেই মারা যায় আর কি? আর, ওষুদ ত নিয়ম মতই খাই'—বলিয়া পকেট হইতে ট্যাবলেটের শিশি বাহির করিয়া দেখাইলেন। অবাক হইলাম। বলিলাম, 'ডাক্তার বলে নাই rest নিতে?' অনন্তকুমার বলিলেন, 'ডাক্তাররা ত কতই বলে, না বললে কি ওদের ব্যবসা চলে!' হাঁপানি ক্রমেই বাড়িল, কাসির সঙ্গে রক্তও দেখা দিল। বন্ধু-বান্ধবেরা

ঠিক করিলেন, তাঁহাকে মরিতে দেওয়া হইবে না, জোর করিয়া চিকিৎসা চালাইতে হইবে। বিপ্লববাদীদের হুকুম হইল,—তাঁহার হাঁটাহাঁটি বন্ধ করিতে হইবে, ঔষধ খাইতে হইবে, ল— বাবুর তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে থাকিতে হইবে। শিশুকে মানুষ যে রকম শাসন করে অনন্তকুমারের উপর তেমনই শাসন চলিত। অনন্তকুমারের জন্য দুগ্ধের বন্দোবস্ত হইল। ঔষধ পথ্য কতকটা নিয়মিত হইল, শুশ্রূষার জন্য লোক নিযুক্ত হইল। অনন্তকুমার নিরুপায় হইয়া বলিলেন,—'কেবল অপব্যয়!'

কলিকাতায় রোগের কিছুই হইল না, ডাক্তার বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে বলিলেন। হাওড়ায় গাড়ীতে ওঠা গেল—বলা বাহুল্য, থার্ড ক্লাসে। গাড়ীতেই দুইবার ফিট উঠে। একটু একটু চোখ বুজিয়া থাকেন; কিন্তু বিন্দুমাত্রও হা-হুতাশ নাই। চেঞ্জে গিয়া ঔষধ পথ্যের যথা সম্ভব সুবন্দোবস্ত হইল। অনন্তকুমার বলিলেন, 'আপনারা যে কি করিতেছেন, organisation টাকার অভাবে suffer করিতেছে, নষ্ট হইতেছে, এখানে আমার জন্য এত ব্যয়। Organisationএর স্বার্থের দিক দিয়া এটা অন্যায়!' কিন্তু ল— বাবু এ বিষয়ে শক্ত। অনন্তকুমারকে খোলাখুলিই বলিলেন, 'আপনার এ বিষয়ে কোন মতামত দিবার প্রয়োজন নাই।' ল— বাবু চলিয়া আসিলেন। যাহারা রহিল তাহারা কতকটা ছেলে-মানুষ, তাহাদিগকে অনন্তকুমার বলিলেন, 'সমুদ্র পারে অমনি মানুষ ভাল হয়, অত দুধের দরকার নাই'—দুধের পরিমাণ কমিল এদিকে কোন চেষ্টাই সফল হইল না, রোগ বাড়িতেই লাগিল।

যক্ষ্মার পরিণামে তিনি ক্রমেই দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। কাসির ফিট যখন উঠিত তখন সেই নীরব-কর্ম্মীর দিকে চাহিয়া থাকা বস্তুতই শক্ত হইত। ফিট থামিলেই একটু হাসিয়া ফেলিতেন। যেন কিছুই হয় নাই।

আবার কলিকাতায় আনা হইল, চিকিৎসার চেষ্টা চলিল। এখানে অনন্তকুমারকে তিলে তিলে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি,—দেখিয়া মনে হইয়াছে এই সমাহিত জীবন, এই স্থৈর্য্য--এই অমানুষিক সহিষ্ণুতা, এই ত্যাগ—কোথা হইতে আসিল ? কোনও দিন সাধন-ভজন করিতে দেখি নাই। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মের ভিতর দিয়া যে অনন্তকুমার স্বভাবতই এই অনাড়ম্বর জীবন লাভ করিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ কি ?

মানুষ অনেক দিন রোগে ভুগিলে খিটখিটে হয়; আজ রান্নাটা খারাপ হইয়াছে, 'খাইতে পারি না,'—সময়মত পথ্যটা না পাইলে রোগী বিরক্তও ত হয়। কিন্তু এই যে নিদারুণ ব্যাধি, অসহনীয় হাঁপানি ও কাসির যন্ত্রণা, তবু কিন্তু অনন্তকুমার পাথরের মত অবিচলিত। একদিনও শুনি নাই, এটা খাইতে ইচ্ছা করে বা করে না ; একদিনও বলেন নাই, ক্ষুধা পাইয়াছে, খাইতে দাও। বাড়ীঘর নহে—ঠাকুর চাকরও নাই। অনভ্যস্ত বিপ্লববাদী কেহ রান্না করিতেছে—ডালের সঙ্গে জল মিশে নাই, কোন দিন হয়ত খুবই বিলম্ব হইয়া গেল। কিন্তু রোগীর বিরক্তি নাই—এদিকে যেন তাঁহার খেয়ালই নাই। একদিন অত্যন্ত দেরী হইয়া গিয়াছে, প্রায় একটা বাজে। অনন্তকুমার খাইতে বসিবেন, কিন্তু কেমন

করিয়া সেদিন ভাত গুলি সব নষ্ট হইয়া গেল। আবার ভাত বসিল। সেবারত যুবক দুঃখ করিয়া বলিল, বড় দেরী হইয়া গেল। —অনন্তকুমারের কিন্তু একটুও বিরক্তি নাই, চাঞ্চল্য নাই। তিনি যে রক্তমাংসের মানুষ, তাঁহার যে ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত না। অনন্তকুমার হাসিয়াই রহস্য করিয়া বলিলেন, 'রাঁধতে সয় বাড়তে সয় না! আর এক ঘণ্টায় সব হবে, তোমার বুঝি খুব খিদে লেগেছে?' যুবক আর বলিবে কি? কেবল চরিত্রমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হয়। মানুষের রোগ হইলে, কেহ যদি বাতাস করে, মাথায় হাত বুলায়, ভাল লাগে। অনন্তকুমারের সেই ব্যসনও ছিল না। অনবরত কাসি; কাসির পর, রক্ত একটু পড়িল। সেই ফিটের পরে ভয়ানক ক্লান্তও হইতেন; কিন্তু একদিনও বলেন নাই, একটু বাতাস কর। এই যে ফিট উঠিতেছে, তবু একথা কখনও বলেন নাই, আমার কাছে একজন থাক। বরং কোন কাজ থাকিলে বলিয়াছেন, 'আমার কাছে থাকার কি দরকার, ওকেই ত ও-কাজে পাঠান যায়।' একদিন অনন্তকুমার, যে যুবকটি রান্না করে তাহাকে কোথায় পাঠাইয়া তাঁহার একটি ছোট বাক্স আনাইয়াছেন, তাহাতে ছোট-খাট কয়েকটি যন্ত্র থাকিত। দুপুরে যখন কেহই থাকিত না তখন অনন্তকুমার যে পিস্তলটী মেরামত করিলে কাজ চলে, তাহাই মেরামত করিতে লাগিয়া যাইতেন। অনন্তকুমার জানিতেন যে, ল— বাবু প্রভৃতি এই দুর্ব্বল শরীরে তাঁহার এ কাজে বাধা দিবেন, খুটখাট করিতে দিবেন না। তাই ছেলেটীকে বলিয়া এ সমস্ত

লুকাইয়া আনাইয়াছেন, দুপুরটা এই কাজ করিয়াই কাটা'ন। একদিন ধরা পড়িলেন। আর একদিন আমরা আসিতেছি, দেখি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে একটা গাছের কাছে অনন্তকুমার বুকে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। দেখিয়া শঙ্কিত হইলাম, ব্যাপার কি? জেরা করিয়া জানা গেল—আজ পার্কে একজন বিপ্লববাদীর আসার কথা ছিল, তাহাকে বাসায় নেওয়ার উপায় নাই, অন্য কাহারও দ্বারা কাজটী হইবে না,তাই অনন্তকুমার সন্ধ্যায় একা হাঁটিয়া পার্কে আসিয়াছেন। বাসা হইতে একেবারে সবটা আসিতে পারেন না, ক্লান্ত হইয়া পড়েন। পার্ক হইতে ফিরিবার সময় (তখন রাত্রি) কাসির ফিট উঠিয়াছে, আর চলিতে পারেন না—তাই, গাছতলায় বুকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। গালাগালি করা হইল, ল— বাবু বলিলেন, 'আপনাকে নিয়া আর উপায় নাই। একেবারে ছেলে-মানুষ!'—অনন্তকুমার আস্তে আস্তে বলিলেন, 'আপনারাও ছেলে-মানুষ-এতে কি রোগ সারে? রোগ অমনি সারে!'—আর একদিনকার কথা বলি। একজন বাড়ী-ঘর ছাড়া ফেরারীর মা ছেলেকে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। মা জানেন যে, ছেলের খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট। তাই টাকা দিয়া বলিয়াছেন 'এ টাকা আমার নিজের, একদিন একটু ভাল করিয়া খাওয়া-দাওয়া করিও'

উক্ত ফেরারী বিপ্লববাদী কলিকাতায় থিয়েটার দেখে নাই। সেদিন কি কথায় ঠিক হইল—মা যে টাকা দিয়াছেন তাহা হইতে কয়েক টাকা ব্যয় করিয়া থিয়েটার দেখা হইবে—আরও তিনজন যাইবে। যাওয়া হইল। অনন্তকুমার সে খবর পরের দিন পাইয়া-

ছিলেন। অনন্তকুমারের কাছে যাইতেই বলিলেন, 'কি, বাবুদের থিয়েটার দেখা আরম্ভ হয়েছে?' কতকটা কৈফিয়তের মত আমরা বলিলাম, '— বাবুর মায়ের দেওয়া টাকা হইতেই ব্যয় করিয়াছি।' অনন্তকুমার তেমনি ভাবেই বলিলেন,— 'মায়ের দেওয়া টাকা হ'লেই তা অপব্যয় করা যায় না। মায়ের দেওয়া টাকা আরও অন্যভাবে ব্যয় করা যেত।' এই ঐকৈকনিষ্ঠ বীর ভক্তের কাছে সকলেই সেদিন লজ্জিত হইয়াছিলাম।

এমনই যখন তাঁহার শরীরের অবস্থা তখন কলিকাতায় ও ঢাকায়, ১৯১৪ সালের শেষভাগে, প্রধান প্রধান বিপ্লববাদীরা ধৃত হইয়াছেন। অনন্তকুমার ঐ শরীর নিয়াই খাটিতে আরম্ভ করিলেন। ছেলেগুলিকে ভরসা দিতে লাগিলেন। গুরুতর কাজে হাত দিতে অগ্রসর হইলেন। এমনই অবস্থায় একদিন গঙ্গার ঘাটে পুলিশ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল।

অনন্তকুমার কেমন ধারার মানুষ, আমরা বলিতে চাহি না— তবে যে সাধনায় মানুষ সমাহিত হয়, আত্মস্থ হয়, আত্মারাম হয়, তৃপ্ত হয়; যাহার সন্ধান পাইলে মানুষের ভোগের স্পৃহা থাকে না, রাগ দ্বেষ থাকে না, লোভ নিঃশেষ হইয়া যায়, সে সাধনা হয়ত তাঁহার ছিল। তবে কখন কোনও সাধনা করিতে তাঁহাকে দেখি নাই। তাঁহাকে দেশের লোকে ডাকাত বলিয়া জানে,— বড় জোর, বিপ্লববাদী বলিয়াই জানে।

বিপ্লববাদীর পন্থা নিয়া তর্ক উঠিবে, কিন্তু বিপ্লববাদীর খাঁটী দেশপ্রেম যে তাহাকে মানুষ হিসাবে কি করিয়াছে, তাহা বুঝিলেই

বুঝিব, ভগবৎপ্রেম, দেশপ্রেম কোনটাই সোজা নহে, তখন ভক্তেরই খাঁটি কথা মনে হইবে—

> 'পীরিতি পীরিতি সব জন কহে,
> পীরিতি মুখের কথা ?'

আদর্শে, প্রেমাস্পদে কতখানি নিষ্ঠা থাকিলে, এই পীরিতি সম্ভব হয়, কতখানি আত্মবিসর্জ্জনে এই প্রীতির পরিচয় মিলে, আমরা জানি না—সে প্রীতি আমাদের নাই !

বিংশ পরিচ্ছেদ

আগুনের খেলা

১৯১৪ সালের শেষ ভাগ হইতেই বাংলার বিপ্লববাদীরা আশু সশস্ত্র বিদ্রোহের কল্পনা করিয়া নূতন শক্তিতে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধ তখন বাধিয়া উঠিয়াছে। বিপ্লববাদীরা সত্যই নানা আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। চারিদিকেই বিপ্লবের যোগাড়-যন্ত্র চলিতে লাগিল। বিভিন্ন দলের একত্র হইয়া কাজ করিবার প্রস্তাব উঠিল। পরলোকগত যতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জীর নেতৃত্বাধীনে অনুশীলন ব্যতীত (চন্দননগর ও কাশীর দল অনুশীলনের সঙ্গে পূর্ব্ব হইতেই যুক্ত ছিল এখনও যুক্তই রহিল) বাংলার অন্যান্য খণ্ডশক্তি তখনকার মত সম্মিলিত হইল। বাঙালীর স্বভাবেই হউক বা যে জন্যই হউক, সমগ্র বাংলার বিপ্লববাদীরা এক হইতে পারে নাই।

যাহা হউক বিপ্লববাদীরা আর এক পা অগ্রসর হইয়া গেল। একটা কিছু করিতে পারিবে, এই ভরসায় তাহারা এখন কতকটা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইতে উদ্যত হইল। ধরিতে আসিলে শুধু ধরাই দিত না, স্থানে স্থানে এক-আধটুকু খণ্ডযুদ্ধের অভিনয়ও হইতে লাগিল।

এদিকে বজবজে কোমাগাটা মারুর যাত্রীরা নামিয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিল। পাঞ্জাবেও ঐ সময় অশান্তির শিখা জ্বল্ জ্বল্

করিয়া উঠিতেছিল। সমগ্র ভারতব্যাপী বিদ্রোহ ঘোষণার চেষ্টা চলিল। বিদেশস্থ বিপ্লববাদীরাও সজ্জিত হইতে লাগিল। ইংরাজ এখন নানাদিকে ব্যতিব্যস্ত। ভারতের সৈন্যবল অনেক কমিয়াছে এখন একটা চেষ্টা করিতেই হইবে। বিপ্লববাদীরা সুযোগের অপেক্ষায় রহিল। বিদেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর চেষ্টা চলিল। বিদেশস্থ বিপ্লববাদীরা কেহ কেহ ভারতের দিকে রওনা হইল। জার্ম্মাণীর জাহাজ অস্ত্র বহন করিয়া বঙ্গোপসাগরের মুখে পৌঁছাইয়া দিবে বন্দোবস্ত হইল। বাংলার বিপ্লববাদী যতীন্দ্রনাথের সহকর্ম্মী নরেন ভট্টাচার্য্য (মার্টিন) ভারতের বাহিরে আসিয়া জার্ম্মাণীর সহায়তা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অস্ত্র বোঝাই জাহাজ গ্রহণ করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। বিপ্লববাদীরা নৌকা লইয়া প্রস্তুত থাকিল। নির্দ্দিষ্ট *Maverick* জাহাজ আসিল না। শ্যামরাজ্যের জার্ম্মাণ কন্‌সাল খবর পাঠাইলেন, অস্ত্র ও টাকা ভিন্ন নৌকায় রায়মঙ্গলের দিকে আসিতেছে। ১৯১৫ সালের জুন মাস হইতে আগষ্ট মাসের মধ্যে Helfferichএর কাছ হইতে কলিকাতার বিপ্লববাদীদের কাছে ৪৩,০০০৲ টাকার মণিঅর্ডার আসে—কিন্তু হরি এণ্ড সন্‌স্ (Harry & sons) এর হাতে ৩৩,০০০৲ টাকা পৌঁছিবার পর সরকার তাহা টের পান।

পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, অস্ত্রগুলি তিন ভাগ করিয়া হাতিয়া (সন্দিপ), বালেশ্বর ও কলিকাতায় গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে গবর্ণমেণ্ট সমস্ত খবরই পাইলেন—সুতরাং প্রতিকারের ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গেই হইল।

Maverick জাহাজ হইতে কোনও প্রকারে নরেন ওরফে মার্টিন আমেরিকায় পলাইয়া গেলেন। সেখানে যুক্ত রাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধৃত করিলেন! হাতিয়াতে যে জাহাজে অস্ত্র লইয়া আসার কথা ছিল, তাহার জন্যও একজন বাঙালীর দরকার। সেজন্য একজন প্রেরিতও হইল। সে অতি কষ্টে সাংহাই গিয়া পৌঁছিল বটে, কিন্তু সেইখানেই গ্রেপ্তার হইল। এই জার্ম্মাণ ষড়যন্ত্র সম্পর্কেই গোয়াতে (Goa) দুইজন বাঙালী ধৃত হয়। তন্মধ্যে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় পুনা জেলে ১৯১৬ সালের জানুয়ারী মাসে আত্মহত্যা করে।

১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বালেশ্বরে পুলিশের নজর পড়ে। সেখানে তল্লাস চলিল। Universal Emporiumএ তল্লাস করিয়া পুলিশ আশে পাশে খোঁজ আরম্ভ করিল। ফলে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের সান্নিধ্যে জঙ্গলের মধ্যে পাঁচজন বাঙালী বিপ্লববাদীর সাক্ষাৎ মিলিল। তাহাদের ধরা কিন্তু খুবই সহজ হয় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের ধরিতে সদলবলে অগ্রসর হইলেন। অনুসরণকারীদের হাত এড়াইবার উপায় নাই দেখিয়া বিপ্লববাদীরা কয়জনই সশস্ত্র রুখিয়া দাঁড়াইল। একটি খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গেল।

Sedition Committee লিখিতেছেন—"They had killed one villager and wounded another and subsequently fired upon an attacking party which was led by the magistrate of Balasore. The result of this affray was that a well-known revolutionary,

Chittapriya Ray was found to be killed, while Jatin Mukerjee and another revolutionary were found wounded. Jatin died of his wounds a few days later. Two other youths were also captured."

ইহার পর হইতে বিপ্লববাদীদের ধরিতে গেলে, তাহারাও গুলি চালাইয়াছে। অনেকে পিস্তল লইয়া প্রস্তুত হইয়াই থাকিত। ঢাকার কলুতাবাজারে একটি খণ্ডযুদ্ধ হইল। ধরা না দিয়া, যতক্ষণ সাধ্য গুলি চালাইয়া পরে পুলিশের গুলিতেই প্রাণ ত্যাগ করিল। শালকিয়ায়ও গোলাগুলি চলিয়াছিল, বসিয়া ধরা দেয় নাই। স্থানে স্থানে এই প্রকারে পুলিশ ও বিপ্লববাদীরা জখম হইতে লাগিল। ফেরারীকে পলাইতে দেখিলে, পুলিশ গুলি করিতে কসুর করিত না।

শেষ দিক দিয়া বিপ্লববাদীরা, যে রকম স্বল্প সংখ্যায় লোক ও দুই চারটা পিস্তল লইয়া পুলিশের সঙ্গে লড়িয়াছে, গুলির আঘাত পাইয়াছে, মরিয়াছে, মারিয়াছে তাহাতে মনে হয় দেশে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র থাকিলে, তাহারা যে গরিলা যুদ্ধের অভিনয় করিত তাহা কি সাহসের দিক দিয়া, কি কৌশলের দিক দিয়া, কম বিপজ্জনক হইত না।

যাহা হউক, জার্ম্মাণীর সাহায্যে বিপ্লবের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইহার কয় মাস পূর্ব্বেই অন্য ভাবেও বিপ্লববাদীরা ভারতব্যাপী বিদ্রোহ ঘোষণার চেষ্টা করিয়াছিল। বিপ্লববাদীদের দুই পথ

ছিল, এক বিদেশের সাহায্যে, আর এক দেশীয় সৈন্যদের হাত করিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহ করা। দেশীয় সৈন্যের মধ্যেও চেষ্টা চলিল। চন্দননগরের রাসবিহারী বসু পাঞ্জাবে কাজ করিতেছিলেন। অনুশীলন সমিতি চন্দননগরের দল তথা রাসবিহারীর সঙ্গে পূর্ব্বেই যুক্ত ছিল। ১৯১৫ সালের প্রথম ভাগেই সৈন্য বিগড়াইবার কাজে ইহারা মন দিল। বাঙালী যুবক সে উদ্দেশ্যে নানা স্থানে প্রেরিত হইল। উত্তর ভারতে নানা স্থানে ইহারা কাজ করিতে লাগিল। এদিকে আমেরিকা হইতে মহারাষ্ট্রীয় যুবক পিংলে ভারতে আসিল। রাসবিহারীর সঙ্গে মিলিতে তাহার বিলম্ব হইল না। পিংলে জানাইল যে, চার হাজার শিখ আমেরিকা হইতে বিদ্রোহের জন্য ভারতে আসিয়াছে। বিশ সহস্র সেখানে প্রস্তুত হইয়া আছে, ভারতে বিদ্রোহ ঘোষণা হইলেই তাহারা আসিবে।

সশস্ত্র বিদ্রোহের দিন, ১৯১৫ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী নির্দ্দিষ্ট হইল। সৈন্য হাত করিবার কাজ তখনকার মত হাঁসিল হইল। দেশীয় শিখ সৈন্য অনেকেই ঐদিন বিপ্লবে যোগ দিতে সম্মত হইল। কেল্লায় কেল্লায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সৈন্যদের বুঝাইল। বাঙালী যুবকেরা, মহারাষ্ট্রীয় পিংলে প্রভৃতি ও পাঞ্জাবের বিপ্লববাদীরা সৈন্যদলে সঙ্গোপনে কাজ করিতে লাগিল। দিন ক্ষণের সংবাদ শুনিয়া বাংলার বিপ্লবদলের যুবকেরা উৎসাহিত হইয়া উঠিল। একদিকে সৈন্যেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে, আর এক দিকে ছোট-খাট ট্রেজারী হইতে টাকা ও রাইফেল, বাঙালীর ছেলেরা লুটিয়া লইবে সাব্যস্ত হইল। বাংলার স্থানে স্থানে সেই

সম্ভাবিত দিনের উদ্দেশ্যে পোষাকও তৈরী হইয়া গেল। কিন্তু লাহোর হইতে নির্দ্দিষ্ট একুশে তারিখ পরিবর্ত্তন করিতে বলা হইল। কারণ ঐ তারিখ সরকার টের পাইয়াছেন বলিয়া তাহাদের সন্দেহ ছিল। সুতরাং তারিখ বদলাইল। কিন্তু ইতিমধ্যে সরকারও অনেক খবর পাইলেন। 12th Indian Cavalryর মধ্যে মিরাটের কেল্লায় এক বাক্স বোমা সমেত পিংলে ধৃত হইল। বাক্সে যে দশটি বোমা ছিল, সরকারের মতে তাহাই 'sufficient to annihilate half a regiment'। পিংলে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিল। বিপ্লববাদীদের একজন সহায়কের বিশ্বাসঘাতকতায় সে আয়োজন শুধু পণ্ডই হইল না, অনেক সৈন্য ও অনেক বিপ্লববাদী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল। পাঞ্জাবের বহু শিখ সৈন্য ধৃত হইল। এই প্রচেষ্টা গোড়ায় পণ্ড না হইলে, ইংরাজ সরকারকে যে বেশ একটু বেগ পাইতে হইত ইহাতে সন্দেহ নাই। শেষ পর্য্যন্ত বিপ্লববাদীরা জয়ী হইত না নিশ্চয়, তবে এ ব্যাপারে একটা খণ্ডপ্রলয় হয়ত দেশে হইত। ভগবান যাহা [illegible]ই। তাঁহার ইচ্ছায় এই ব্যর্থতার মধ্যে দেশবাসী অনেক শিক্ষা পাইয়াছে। আর ইংরাজ সরকারকে হয়ত এই কথাটা বিশেষ করিয়া ভাবিতে হইয়াছে যে, যে সৈন্যের ভরসা তাঁহারা অনেকখানি করেন—তাহাদের বিগড়াইয়া দেওয়া খুব অসম্ভব নহে। যাহারা লাট ও জঙ্গীলাটের তাঁবে থাকিতে আইনত বাধ্য তাহারা নিঃস্ব বিপ্লববাদীদের কথা, সাময়িক ভাবে হইলেও শুনে কেন?

রাসবিহারী শেষ আশা নির্ম্মূল হইলে দেশত্যাগ করিয়া যান। Sedition Committee লিখিতেছেন—"Rash Behari left the country after a final interview with a few of his Benares disciples at Calcutta, in the course of which he informed them that he was going to "some hills" and would not be back for two years. They were, however, to continue organization and distribution of seditious literature during his absence under the leadership of Sachindra and Nagendra Nath Datta alias Girija Babu, of Eastern Bengal, a veteran associate of the Dacca Anusilan Samiti whose name appears in a note book belonging to Abani Mukerjee, a Bengali arrested at Singapur." রাসবিহারী কাশীর শচীন ও অনুশীলনের গিরিজা বাবুর হাতে তখনকার নেতৃত্বভার অর্পণ করিয়া জাপান চলিয়া যান। পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারে নাই।

১৯১৪-১৫ সালের দুই রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। বিপ্লববাদীরা ইহার পরেও ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত দল পুষ্ট করিতে ও রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। সশস্ত্র বিদ্রোহের চেষ্টা তখন আর ছিল না। যাহারা ফেরারী হইয়াছিল, তাহারা বনে জঙ্গলে, এখানে সেখানে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহাদের রক্ষার জন্য

অবশিষ্ট বিপ্লববাদীরা তখনও চেষ্টা চালাইতে লাগিল। তাহাদের সংগৃহীত অর্থ ও নানা সহায়তা ছিল বলিয়াই সরকারের চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়াও ফেরারীরা অনেক কাল আত্মগোপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

[illegible]

SHOULD THE SORTING OF THIS REAM BE FOUND DEFECTIVE, PLEASE RETURN THIS TICKET, ADVISING AT THE SAME TIME TO WHICH CONSIGNMENT THE COMPLAINT REFERS.

No. 143

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বৈদেশিক অংশ

বাংলার বিপ্লববাদীদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার একটা অংশ আমাদের দেশে গোপনই আছে; অবশ্য সে অংশের সকলখানি কথাই ভারত-গবর্ণমেণ্ট জানেন। বিদেশের সেই চেষ্টার পরিচয় সংক্ষেপে দিলাম।

মাণিকতলা বোমার মামলার চার বৎসর মধ্যেই অর্থাৎ ১৯১০ সালেই বাংলার বিপ্লববাদীরা বিশেষরূপে ভাবিতে লাগিল যে বোমার দ্বারা আর যাহা হউক না কেন দেশকে সম্পূর্ণরূপে ইংরেজের কবল হইতে মুক্ত করা সম্ভবপর হইবে না। স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে তাহার জন্য লোকবল ও বর্ত্তমান যুদ্ধের উপকরণ বিশেষ দরকার। তাহারা আরও ভাবিল যে এই সমস্তের জন্য টাকার দরকার। যদিও টাকা ডাকাতি দ্বারা সংগৃহীত হইতেছিল কিন্তু তাহা সামান্য। অধিকন্তু এই ডাকাতি প্রভৃতির জন্য বিপ্লববাদীদের উপর দেশের লোকের একটা বিজাতীয় ঘৃণা ফুটিয়া উঠিতেছিল। তাহারা বেশ বুঝিয়াছিল যে দেশবাসীর সহিত তাহাদের এই বিচ্ছেদ [illegible]নতার প্রধান অন্তরায়। এ[illegible]ব কারণে তাহারা ইংরাজবি[illegible]রাধী বিদেশীয় অন্যান্য জাতির নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া সম্ভবপর কিনা তাহার জন্য সচেষ্ট হয়।

জনকয় বিপ্লববাদী বিপ্লবের জন্য টাকা, যুদ্ধের উপকরণ এবং আন্তর্জ্জাতিক সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন করেন। তন্মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ কর ও অবনী মুখার্জ্জি প্রভৃতি ছিলেন। ইহাই বিপ্লবসংগ্রামে এক নূতন (ডিপ্লোম্যাটিক) যুগের সূচনা করিল। অবশ্য ইঁহাদের আগে ম্যাডাম কামা, তারকনাথ দাস প্রভৃতি ভারতের স্বাধীনতার কথা চারিদিকে প্রচার করিতেছিলেন কিন্তু তাঁহারা ভারতের স্বাধীনতার সহিত আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্ক বিশেষরূপে স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন নাই।

"জগতের জাতিসমূহের মধ্যে ভারতেরও একটী স্থান ও কর্ত্তব্য আছে। তাই তাহার স্বাধীনতা অপহৃত হওয়ায় জাগতিক ব্যাপারের উন্নতির পক্ষে সে বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" এই কথাটা বুঝাইতে, বিদেশের স্বার্থবুদ্ধিকে জাগ্রত করিতে বিপ্লববাদীরা চেষ্টা করিল।

আমেরিকায় পৌঁছিয়া শ্রীযুক্ত করের মুখ্য কর্ত্তব্য হইল তথাকার জনসাধারণের মধ্যে ভারতের কথা প্রচার এবং 'গদর' সমিতির সহিত 'হাতে হেতেড়ে' কাজ করা। বিগত মহাযুদ্ধের সময় যখন প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন 'চৌদ্দ দফা সর্ত্তের' সৃষ্টি করেন সেই সময় এই 'কর'ই তাহার মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার দাবীর উল্লেখ করিবার জন্য প্রেসিডেণ্টকে অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায়ই 'গদর' সমিতি ভারতে বিপ্লবসাধনের জন্য তিন লক্ষেরও অধিক টাকা এবং বহু লোক পাঠাইতে পারিয়াছিল। অপর দিকে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মরক্কোতে অশান্তির আগুন (Agadir

ব্যাপার) লক্ষ্য করিয়া এবং জার্ম্মাণীর সহিত ইংরাজ ও ফরাসীর যুদ্ধের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া অবনী মুখার্জ্জি বিদ্যার্থীরূপে বার্লিনে চলিয়া যান—উদ্দেশ্য ভারতে বিপ্লবের জন্য এই ঘটনাচক্রের সুযোগ গ্রহণ। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি জার্ম্মাণীর রয়াল হাউসের তদানীন্তন Chamberlain Court Von Wehdeর সহিত পরিচিত হন এবং জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ভারতীয় বিপ্লববাদীদের জন্য অর্থ ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হন। কিন্তু ইম্পিরিয়ালিজ্‌মের প্রকৃতি—তা সে জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইংরাজ, মার্কিণ, জাপান যে কোন জাতিরই হউক না কেন, চায় অন্য ইম্পিরিয়ালিজ্‌মকে বিতাড়িত করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা। কোন পতিত জাতির স্বাধীনতার সংগ্রামে তাহারা মাথা ঘামাইতে চায় না। সুতরাং এক্ষেত্রে ভারতে জার্ম্মাণীর অধিকার বিস্তারের কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া জার্ম্মাণ গবর্ণমেন্ট মুখার্জ্জীর কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অধিকন্তু যে জার্ম্মাণী ইংরাজের ভয়ানক শত্রুরূপেই পরিচিত সে মুখার্জ্জীকে বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িল না এবং অবশেষে তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিল। এইরূপে বাংলার বিপ্লববাদের 'ডিপ্লোম্যাটিক' যুগের প্রথম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

তার পর আসিল ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ইউরোপীয় মহাসমর। ইহার প্রারম্ভভাগে কতিপয় বাঙালী বিপ্লববাদী স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ সহোদর, যুগান্তরের প্রথম সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বাধীনে বার্লিনে ছিলেন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় মুক্তির

জন্য ভূপেন্দ্রনাথ, অবনী প্রভৃতি বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া যুদ্ধ ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের দ্বারস্থ হইলেন। কিন্তু জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের দৃঢ় বিশ্বাস এ যুদ্ধে পশ্চিম সীমান্তে তাঁহাদের জয় অবশ্যম্ভাবী এবং তাহার ফলে ভারতবর্ষ ইংরাজের কবল মুক্ত হইয়া তাঁহাদের হাতে আসিয়া পড়িবে! এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এবারেও বিপ্লববাদীদের প্রস্তাব তাঁহারা উপেক্ষা করেন। কিন্তু "মার্ণে"র পরাজয় দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মাণ যোদ্ধৃগণের চোখে 'জ্ঞানাঞ্জন' পরাইয়া দিল। কেন্দ্রীকৃত ব্রিটিশ শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য এইবার তাঁহারা বঙ্গীয় বিপ্লববাদীদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কিন্তু প্রচুর অর্থ দ্বারা সাহায্য করা সত্ত্বেও নানা কারণে, ও জার্ম্মাণীর আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার অভাবে সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইল এবং আন্দোলন পর্য্যন্ত ধ্বংস হইয়া গেল। এখানে আর একটা কথা বলি; জার্ম্মাণীর সাহায্য গ্রহণ ব্যাপারে সকল বিপ্লববাদী সায় দেয় নাই। অনেকে নবীন-চন্দ্রের উক্তি স্মরণ করিয়াছে—'মাটি কাটি লভি কোহিনুর' শেষে জার্ম্মাণী কি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইবে। কিন্তু সে সংখ্যা নগণ্য!

জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিবার প্রস্তাবে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হইল ভূপেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের প্রচেষ্টায় তাহা শুধু বাংলার বা বাঙালীর আন্দোলন রহিল না—তাহা সমগ্র ভারতের জন্যই হইল। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতুল্লা,* বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

ডাক্তার মন্সুর, হরদয়াল প্রভৃতি স্বনামখ্যাত বিপ্লববাদীদিগকে একত্র করিয়া সুচারুরূপে কার্য্যপরিচালন উদ্দেশ্যে একটী কার্য্যকরী সভা গঠিত হইল। বার্লিনস্থিত ভারতীয় ছাত্রগণের মধ্য হইতে কর্ম্মী সংগৃহীত হইতে লাগিল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবাসী-মাত্রকেই উত্তেজিত করিবার জন্য যথোপযুক্ত অর্থসহ তাঁহাদিগকে দুনিয়ার সকল মুল্লুকেই পাঠান হইল। তাঁহাদের মধ্যে কতক ১৯১৫ সালের জানুয়ারীতে ভারতে পৌঁছিলেন। এই জাতীয় দূতদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রথম আসিলেন তিনি রাসবিহারীর সহিত দেখা করিলেন। রাসবিহারীর সঙ্গে অনুশীলন ও শিখ সৈন্য, শিখ বিপ্লববাদী প্রভৃতি বিপুল জনবল ছিল; বিপ্লবকে প্রকট করিবার জন্য প্রাণে তখন তাঁহার অর্থ ও অস্ত্র-শস্ত্রের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। অন্য দিকে স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতিও সুসজ্জিত।

এদিকে দেশীয় সৈন্যদের সহায়তায়, বাংলার বিপ্লববাদীরা পিংলে প্রভৃতির সহযোগে যে বিদ্রোহের চেষ্টা করিয়াছিল—তাহা ১৯১৫ সালের প্রথম ভাগেই পণ্ড হয়। সমগ্র উত্তর ভারতের সেনাবারিকে বিপ্লবকথা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। লাহোরের ধর-পাকড়ের পর সৈন্যদের মধ্যে একটা ভয়ের সঞ্চার হয়। বিপ্লববাদীদের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে তখন তাহাদের নৈরাশ্য আসিয়াছে। বহু শিখ সৈন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল। তখন আর সৈন্যদের মধ্যে তেমন কোন সুবিধা করা যাইবে না, মনে করিয়া রাসবিহারী ঐ সময় জাপান গমন করেন।

রাসবিহারী ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে ভারতের উপকূল পরিত্যাগ করেন। অবশ্য বিপ্লববাদীরা তখনও ভরসা একেবারে ছাড়ে নাই। বিদেশের দিকে সকলে তাকাইয়া রহিল। দুইমাস অতীত হইয়াছে, রাসবিহারীর কোন খবর আসিল না। তিনি নিরাপদে পৌঁছিয়াছেন এই সামান্য খবরটুকু যাঁহারা জানিলেন, অপ্রকাশ রাখিলেন। সমিতি অধৈর্য্য হইয়া অবনীকে আহ্বান করিলেন এবং ব্যাপার কি জানিবার জন্য তাঁহাকে অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। তিনি জাপানে পৌঁছিয়া রাসবিহারী ও ভগবান সিং প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হইয়া বিপ্লবায়োজনে ব্যাপৃত হইলেন। স্থির হইল অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ তিনখানি জাহাজ ও কতিপয় জার্ম্মাণ Expert ভারতে প্রেরিত হইবে। এই নির্দ্ধারণ অনুসারে *Maverick*, *Henry S.* এবং অপর একখানি জাহাজ যুদ্ধসম্ভারপূর্ণ হইয়া ভারতে বিপ্লবাগ্নি প্রজ্জলিত করিবার জন্য আমেরিকা হইতে যাত্রা করিল। এই সংবাদ লইয়া ভারতে লোক চলিয়া গেল। সংবাদ পাইবামাত্র বৈদেশিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ভারতীয় বিপ্লববাদীগণ বুঝিয়া বসিলেন, তাঁহাদের সোণার স্বপন এবার বাঞ্ছিত বাস্তবে পরিণত হইবে—এই চিন্তায় তাঁহাদের মাথা যেন গুলাইয়া গেল। তাঁহারা যথা তথা নির্ব্বিচারে কর্ম্মীসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এইভাবে এ আন্দোলনে প্রবেশ করিল একদল অর্থলিপ্সু লোক। ব্যাঙ্ককের উকীল কুমুদনাথ মুখার্জ্জি এই ভাবে এই দলে আসিয়া পড়ে। শুধু টাকার খাতিরেই জাহাজ সম্বন্ধীয় কয়েকটি খবর সে ভারতে পৌঁছাইয়া দিতে স্বীকৃত হয়। ভারতে পৌঁছিয়া

যতীন্দ্রনাথের সহকর্ম্মী নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। যতীন্দ্রনাথ কিন্তু কুমুদনাথ কর্ত্তৃক আনীত সামান্য খবরে তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। অধিকন্তু টাকা আসিতে দেরী হইতেছে দেখিয়া তিনি নরেন্দ্রকে জাভায় পাঠাইয়া দিলেন। নরেন্দ্রনাথ তথায় পৌঁছিয়া জার্ম্মাণীর তদানীন্তন অর্থসচিবের ভ্রাতা Helffericএর সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি নরেন্দ্রকে রাসবিহারীর পঞ্চাশ হাজার গিল্ডার্স (পঁয়ষট্টি হাজার টাকা) দেন। সে সময়ে রাসবিহারী সাংহাইএ। নরেন্দ্র টাকা ও জাহাজ পৌঁছিবার তারিখের সংবাদ লইয়া বাংলায় ফিরিয়া আসিলেন। যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ গ্রহণের বন্দোবস্ত করিলেন—একথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। কিন্তু এ আয়োজনের সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়ায় বিপ্লববাদীদিগকে কার্য্যপ্রণালী বদলাইতে হইল এবং সে সংবাদ লইয়া নরেন্দ্র পুনরায় জাভায় গেলেন।

পূর্ব্বোক্ত কুমুদনাথের সঙ্গে নরেন্দ্রের বিরোধই ১৯১৬ সালের সর্ব্বধ্বংসের কারণ। নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় যাত্রায় জাভা আসার পর কুমুদনাথের সঙ্গে টাকা পয়সা লইয়া কলহ হয়। এবং এইজন্যই কুমুদনাথ সিঙ্গাপুরে গিয়া যুদ্ধের উপকরণপূর্ণ জাহাজের খবর সহ অন্যান্য সকল কথা ইংরাজকে বলিয়া দেয়। গুপ্ত সংবাদ সব বাহির হইয়া পড়ায় ব্রিটিশ সিংহ জাভার ক্ষুদ্র ডাচ্ গবর্ণমেণ্টের উপর এমন চাপ দিলেন যে তাহার ফলে তথায় জার্ম্মাণ ষড়যন্ত্র অসম্ভব হইয়া উঠিল। নরেন্দ্র নানা অছিলায় প্রথমে চীনদেশে চলিয়া গেলেন। তারপর আমেরিকায় গিয়া

মেক্সিকোর বাসিন্দা হইলেন। এইরূপে বঙ্গীয় বিপ্লববাদীদের যুদ্ধ-সংক্রান্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টার একটা দিকের অবসান হইল।

কিন্তু আবারও চেষ্টা চলিল। রাসবিহারীর অনুসন্ধানে অবনী টোকিওতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তা ছাড়া ম্যানিলা (Manila) হইতে পলায়িত 'গদর' সমিতির পাঞ্জাবী নেতা ভগবান সিংএর সহিতও দেখা হইল। সাবরওয়াল প্রভৃতির ন্যায় আরও কয়েকজন পাঞ্জাবী ও বাঙালী বিপ্লবের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া এই সময় তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। জাপানে পৌঁছিয়া অবনী রাসবিহারীর নেতৃত্বাধীনে সকলকে সংঘবদ্ধ করিলেন এবং চীন দেশস্থিত জার্ম্মাণদিগকে জানাইলেন যে তাঁহারা তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইতে ইচ্ছুক। এই সংবাদ পাইয়া পিকিনের জার্ম্মাণ এ্যাম্বাসাডার তাঁহার কতিপয় সহকর্ম্মী ও Expert লইয়া এক ভোজ-সভার আয়োজন করিলেন এবং জাপানে অবনী, রাসবিহারী ও ভগবান সিংকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ভগবান সিং ও রাসবিহারীর পক্ষে তখন চীনভ্রমণ নিরাপদ নহে, কারণ তত্রত্য ইংরাজ কর্তৃপক্ষ সন্ধান পাইবামাত্র ইঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতেন—Extra territorial ক্ষমতাদ্বারা তাঁহারা ইচ্ছামাত্রেই এরূপ গ্রেপ্তার করিতে পারিতেন। তজ্জন্য এবং চেষ্টা করিয়াও যদি ঠিক সময় পৌঁছিতে না পারেন এই আশঙ্কায় তাঁহারা জনৈক ভারতীয়কে পূর্ব্বেই তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে উক্ত ভোজ-সভায় প্রেরণ করেন। পিকিনে ইঁহারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই জাপান হইতে অবনী ও ভগবান সিং সহ রাসবিহারী সাংহাই

পৌঁছিলেন এবং তত্রত্য জার্ম্মাণ কন্সাল কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইলেন। ইহার পরেই এক কন্‌ফারেন্স আহূত হইল। এবং তাহাতে উপস্থিত থাকিলেন রাসবিহারী প্রভৃতি ভারতীয় বিপ্লববাদী, একাধিক জার্ম্মাণ রাজদূত (ambassador) ও কতিপয় Expert এবং এই সভাতেই অস্ত্রপূর্ণ জাহাজের ও অর্থসমস্যার মীমাংসা হইল। কিন্তু বোধনেই বিসর্জ্জনের বাজনাও বাজিয়া উঠিল—অবনী ভারতবর্ষে ফিরিবার পথে, সিঙ্গাপুরে তাঁহার মারাত্মক নোট বুক সহ ধরা পড়িলেন।

অস্ত্রপূর্ণ যুদ্ধ জাহাজ বাংলার দিকে আসিতেছিল তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, হাতিয়া, কলিকাতা ও বালেশ্বরে তাহা গ্রহণ করিবার আয়োজন হইয়াছিল, তাহাও বলিয়াছি, কিন্তু তিনখানা জাহাজ গেল কোথায়? ব্যাপার হইয়াছিল এই :—

যে তিনখানি অস্ত্রপূর্ণ জাহাজের ভারতের দিকে আসিবার কথা ছিল তাহার মধ্যে যেখানি সত্যই এ পথে আসিতেছিল, ইংরাজ ক্রুজার H. M. S. *Cornwall* আন্দামানের নিকট সেখানি ডুবাইয়া দিল। অপর দুইখানি অর্থাৎ *Henry S.* ও *Maverick*এর কর্ত্তারা মৎলব আঁটিয়া সুমাত্রা জাভা প্রভৃতির দক্ষিণস্থ দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপে গিয়া অস্ত্রশস্ত্র মেক্সিকোর প্রসিদ্ধ বোম্বেটিয়া ভিলার নিকট বিক্রয় করিয়া টাকা পয়সা পকেটস্থ করিলেন। তারপর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে Helfferic জাহাজ দুইখানিকে আমেরিকান্ ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় ভারত ও জার্ম্মাণীর মধ্যে যে সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল, এইরূপেই তাহা নিঃশেষ হইল। এই সম্পর্কে জার্ম্মাণীর

ইম্পিরিয়ালিষ্ট গবর্ণমেণ্ট নাকি তিন মিলিয়ান ডলারেরও অধিক (প্রায় এক কোটী টাকা) ব্যয় করিয়াছেন। ইহা অবিকৃত সত্য যে এই টাকার কিয়দংশ কয়েকজন স্বার্থপর ভারতীয় তথাকথিত বিপ্লববাদী আত্মসাৎ করিয়াছে, কিন্তু খুব বেশীর ভাগটাই Helfferic, Rudde meer প্রভৃতি যে সব জার্ম্মাণ এ সম্পর্কে আসিয়াছিল তাহাদের সিন্ধুকেই ফিরিয়া গিয়াছে।

এই সশস্ত্র বিপ্লবপ্রয়াস ব্যর্থ হইলেও বাংলার বিপ্লববাদীরা ইহা হইতে এই শিক্ষালাভ করিয়াছে যে সমাজের উপর অর্থের প্রভাব কতদূর; আর বিদেশের কে কেমন সুহৃদ! তাহাদের নিকট ইহা এখন সুস্পষ্ট যে, জগতের জাতিসমূহ এমন কতকগুলি ভাবে বিভক্ত যে পরস্পর বিবদমান দুইটি জাতির মধ্যেও, প্রথম জাতির শ্রেণীবিশেষের নিকট হইতে, দ্বিতীয় জাতির অনুরূপ শ্রেণীর বিরুদ্ধে কোন সুযোগ সুবিধা লাভের চেষ্টা মূর্খতা মাত্র। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে জার্ম্মাণী ও ইংরাজ পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িতেছিল যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া কিন্তু লক্ষ্য উভয়েরই এক—সে লক্ষ্য জগতের উপর imperialismএর প্রভাব বিস্তার। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজের কেন্দ্রীকৃত শক্তিকে কতকাংশে দুর্ব্বল করিবার উদ্দেশ্যেই জার্ম্মাণী ভারতে বিপ্লব ঘটাইতে চাহিয়াছিল। ভারতের স্বাধীনতা কখনই তাহার কাম্য ছিল না, স্বার্থই তাহাকে একার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছিল।

এই ভাব একই সময়ে বিদেশস্থ বহু বঙ্গীয় বিপ্লববাদীর প্রাণে উদিত হওয়ায়, তাহারা ঐদিক হইতে মন সরাইয়া লয়।

অনেকে বিদেশের mass movementএর দিকে আকৃষ্ট হয়। এই সমস্ত কারণেই হউক বা যে কারণেই হউক, বিদেশস্থ বাংলার বিপ্লববাদীদের কেহ কেহ রুষিয়ার সোভিয়েট দলে যোগ দেয়। কেহ কেহ সেখানে বিবাহ করিয়াছেন—মানবেন্দ্র ওরফে নরেন্দ্র 'মার্টিন' ইংরাজ কন্যাকে (বর্ত্তমান নাম শান্তি দেবী) বিবাহ করিয়াছেন। অবনী এক রুষীয় রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন। সিঙ্গাপুর কেল্লার বন্দীনিবাস হইতে পলায়ন করিয়া অবনী জাভায় আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। সোভিয়েট ভাবের ভাবুক হইয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অবনী জাভা পরিত্যাগের সঙ্কল্প করেন। বিশেষত জাভা গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অবস্থানের কথা জানিতে পারিয়া এরূপ ব্যবস্থা করিতেছিলেন যে আর তথায় থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। পলায়নের কোন উপায় না পাইয়া ইউরোপ যাত্রী জনৈক ধনবান ব্যক্তির ভৃত্যরূপে তিনি মস্কো চলিয়া যান। তিনি পূর্ব্ব হইতে আগত নরেন্দ্র ও অন্যান্য কয়েক জন বিপ্লববাদীর সঙ্গে তথায় মিলিত হন। অবনী এবং নরেন্দ্র কতিপয় আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। তথাকার অত্যাচারিত জাতিসমূহ অবশ্য নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যই অর্থ ও অন্যান্য উপকরণ দিয়া ভারতীয়দের সাহায্য করিতে স্বীকৃত হয়।

বাংলার বিপ্লববাদীদের কেহ কেহ এই ভাবে বিদেশে থাকিয়া বোলশেভিক রুষিয়ার ভাবে ভাবুক হইয়া পড়িয়াছেন।

* * *

এদিকে ভারতে ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে বিদ্রোহপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর ঐ বৎসরই মার্চ্চ মাসে ভারতরক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হয়। Internment আরম্ভ হইল। এই সময়েই বর্ম্মায় (রেঙ্গুনে) বিভ্রাট বাধে—সেখানকার ষড়যন্ত্রও প্রকাশ হইয়া পড়ে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বিপ্লবের শেষ শিখা

১৯১৬ খৃষ্টাব্দেও বাংলায় এবং বাংলার বাহিরে বিপ্লববাদীরা পূরা উদ্যমেই কাজ চালাইতেছিল। তখন সকলেই ফেরারী। সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়াই থাকিত। যে কোন মুহূর্ত্তে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা জানিয়াই চলিতে লাগিল। দলে দলে intern হইতে লাগিল। কিন্তু তখনকার যাহারা পরিচালক, তাহারা তখনও ধৃত হয় নাই। খুন, জখম, ডাকাতি চলিতেই লাগিল। এই সময়েই অর্থাৎ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর দিন কয় মধ্যে ধর-পাকড় ভীষণভাবে আরম্ভ হইল। পুঁটি, রুই কাতলা কেহই বাদ গেল না—ঘরে ঘরে গ্রেপ্তার চলিল। ভারতরক্ষা আইনের সঙ্গে ১৮১৮ সালের রেগুলেশন যোগ করা হইল। যাঁহারা পূর্ব্বে intern ছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই state prisoner হইয়া জেলে আসিলেন। আর দলে দলে নূতন গ্রেপ্তার হইয়া intern হইতে লাগিল। সেই ধর-পাকড়ের মুখে বিপ্লববাদীদের দুঃখ কষ্টের কথা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ বুঝিবে না—সুতরাং সেকথা থাকুক।

এই রকম বেড়াজাল ফেলার ফলে, সরকার কৃতকার্য্য হইলেন। ১৯১৭ সাল হইতে বিপ্লবদল এক প্রকার ভাঙ্গিয়া যায়। ভাঙ্গা হাটে এখানে সেখানে দুই চার জন কেবল বিপ্লববাদীদের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে লাগিল। বসন্ত বাবুর খুন ব্যাপারে যাহারা লিপ্ত ছিল তাহাদের সকলেই ধরা পড়ে। Sedition Committee Reportএ আছে—"এই খুনের উদ্যোক্তারা খুনের কয় দিন পরেই ধরা পড়ে। তাহাদের মধ্যে দুই জন বর্ত্তমান ষ্টেট্ প্রিজনার। আর একজন (নলিনী কান্ত ঘোষ) ধৃত হইয়াছিল কিন্তু দলন্দা হইতে পলাইয়া যায়। পরে ১৯১৮ সালের জানুয়ারীতে পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র লড়াই করিয়া ধৃত হয়। চার জনকে রাজবন্দী করা হইয়াছে—পঞ্চম ব্যক্তিকে দলন্দায় আটক রাখা হয়, সে ওখান হইতেই পলাইয়া যায়; সম্প্রতি (report লেখার সময়, ১৯১৮ সালে) সেও গ্রেপ্তার হইয়াছে।"

এই ভাবে বিপ্লববাদীদের প্রায় সকলেই ধৃত হইল। কেহ intern হইল, কেহ কেহ ষ্টেট প্রিজনার হইল; কাহারও বা কারাদণ্ড হইল—বাকি জন কয় ফেরারী হইয়াই রহিল। এই ফেরারী অবস্থায় তাহাদের পলায়নপটুত্ব খুবই প্রকাশ পাইয়াছে।

এই পলায়ন ব্যাপারটা যে ভীরুতার জন্য অনুষ্ঠিত হইত তাহা নহে। ধরা দিবে না—ইহাই ছিল তাহাদের কথা। কিন্তু যেখানে ধরা পড়িবার ষোল আনা সম্ভাবনা—যেখানে মৃত্যু ভিন্ন অন্য উপায় নাই—সেখানে যাওয়ার কথা হইলে অনেক সময়ই দেখা যাইত—'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি

কাড়াকাড়ি' পড়িয়াছে। ভয়কে এড়াইবার জন্য পলায়ন নহে, পলাইয়াছে, আত্মগোপন করিয়াছে অন্য কারণে। নিশ্চিত বিপদের মুখে অনেকেই যাইতে চাহিত।

অধিকাংশ ফেরারী বিপ্লববাদীই রাস্তাঘাটে পুলিশের চক্ষে ধূলি দিয়া চলাফেরা করিয়াছে। তাহাদের সম্বল দেখা যাইত, একটা ছাতা। বার মাস ছাতা হাতে আছেই। ছাতা কোন সময় মাথার উপরে রৌদ্র নিবারণ করিত হঠাৎ আবার আবরণও হইত। ডান দিকে হয়ত সি. আই. ডি. কর্ম্মচারী কেহ আছে, অমনই ছাতা ডান দিকে একটু হেলিয়া গেল—সেদিক হইতে মুখ দেখা সম্ভব রহিল না।

দলন্দায় বিপ্লববাদীদের অনেককে রাখিয়াছে। দিন রাত পাহারা। সেখান হইতেও বিপ্লববাদীরা দুইবার পলাইয়াছে। ধরিবার জন্য কত আয়োজন, কিন্তু সহজে তাহাদের ধরা যায় নাই। ধরা না দেওয়ার জন্য তাহাদের অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। এখানে দুই এক জনের পলাতক জীবনের বিষয় কিছু জানিলেই, বুঝা যাইবে—শেষের দিককার আত্মগোপন কেমন ধারায় চলিয়াছিল।

মুর্শিদাবাদের নলিনী বাগচীকে ভাগলপুরে কলেজে পড়িতে পাঠান হইল, বিহার প্রদেশে বিপ্লববাদ প্রচার করিতে। কয়দিন পরে এই বাঙালীর দিকে পুলিশের নজর পড়িল। নলিনী পড়া ছাড়িয়া ফেরারী হইল। নলিনী 'জলপানি' পাওয়া ভাল ছেলে। বিহারে একেবারে খাঁটি বিহারী সাজিয়া বসিল। মাথায় টিকি,

মালকোচা মারা মোটা ধুতি, বিহারী জামা, মুখে অনর্গল বিহারী বুলি। বিহারের জেলায় জেলায় স্কুল কলেজে বিহারী হইয়াই ঘুরিতে লাগিল—কিছুদিন পরে বিহারী পুলিশের দৃষ্টি পড়িল। বলা বাহুল্য, নলিনীকে এবার বাঙালী নলিনী নহে, বিহারী যুবক বলিয়াই সন্দেহ হইল। বাধ্য হইয়া বিহার ছাড়িতে হইল, নলিনী বাংলায় আসিল! ডিব্রুগড় হইয়া গৌহাটিতে গেল। ১৯১৭ সালের কথা। বাংলায় তখন ভাঙ্গা হাট—ধর-পাকড় খানাতল্লাস, internment, গুলি। অবশিষ্ট বিপ্লববাদীর প্রধানরা বুঝিলেন—বাংলায় থাকা নিরাপদ নহে। তখন আসামেই ভাল ভাল কর্ম্মীদের 'reserve force' রূপে রাখা সাব্যস্ত হইল। নলিনীকেও গৌহাটিতে রাখা হইল।

একদিন রাত্রিশেষে বন্দুক পিস্তলের গুড়ুম গুড়ুম শব্দে গৌহাটির জনসাধারণের নিদ্রা ছুটিল। গৌহাটিতে হৈচৈ। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল—আঠার জন বি. এ., এম. এ. পাশ করা বাবু বোমা পিস্তলসহ একটা বাসায় বাস করিতেছিল। গৌহাটির reserve পুলিশ তাহাদের আক্রমণ করে। উভয় পক্ষে গুলি চলিয়াছে, খুনোখুনি হইতেছে।—ক্ষুদ্র সহর বন্দুক পিস্তলের শব্দ অনেকে শুনিতে পাইল। গৌহাটির ঐ বাসায়, নলিনী বাগচী, নলিনী ঘোষ ও আরও কয়েক জন বিশিষ্ট ফেরারী বাস করিতেছিল। কলিকাতার পুলিশ কোন ধৃত বিপ্লববাদীর কাছেই গৌহাটির সংবাদ পাইয়া ১৯১৭ সালের ৯ই জানুয়ারীতে ঐ বাসা ঘেরাও করিয়া ফেলে। অবশ্য বিপ্লববাদীরা সাধারণত নাকে

তেল দিয়া সুখনিদ্রা যাইত না। ঐ ভাবে অবস্থান সময়ে রিভলভার বিছানার নীচে রাখিয়া একজন সতর্ক প্রহরী জানালার ধারে বসাইয়া সকলে ঘুমাইত। দুই ঘণ্টা পর পর পাহারা বদলি হইত। বিপ্লববাদীদের কাছে ইহাই ছিল যেন দুর্গ। পুলিশ দেখিয়াই সকলকে জাগান হইল। কিন্তু চুপি চুপি। কর্ত্তব্যও স্থির হইল। রিভলভার ও পিস্তল হাতে লইয়া সবাই বাহিরে আসিল। আসিয়াই পুলিশের উপর গুলি ছুঁড়িতে লাগিল। প্রথমটায় পুলিশ এই হঠাৎ আক্রমণে হতভম্ব হইয়া পড়িল। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইতেই বিপ্লববাদীরা অবসর বুঝিয়া পাহাড়ের দিকে পলাইয়া গেল। কিন্তু বৈকাল বেলায় অসংখ্য পুলিশ রাইফেল ও বন্দুকে সুসজ্জিত হইয়া পাহাড়টী ঘেরাও করিয়া ফেলিল। তখন উভয় পক্ষেই গুলি চলিল। ফলে অনেকেই আহত হইয়া ধৃত হইল। দুইজন পলাইয়া গেল। তন্মধ্যে একজন এই নলিনী। তাহারা ছয় দিন পরে পাহাড় পার হইয়া লামডিং ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। সে যাওয়া কি সোজা? অনাহারে অনিদ্রায় দিনের পর দিন চড়াই উৎরাই হাঁটিয়া চলিতে হইয়াছিল। সর্ব্বদা পুলিশের ভয়, কখনও গাছে উঠিয়া, কখনও বা পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিয়া, পাথরে শুইয়া রাত কাটাইয়াছে। অবিশ্রাম দ্রুতগতিতে চড়াই উৎরাই চলিতে চলিতে হাত পায়ের তলদেশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। শুধু কি এই চলারই বিপদ? এক রকম পাহাড়ে আঠালো পোকা তাহাদের মাথায় ও পিঠে লাগিয়া যায়—তাহা অনেক কষ্টেও টানিয়া উঠান যায় নাই। এই পোকার আক্রমণ জনিত বিষ-বেদনায়

জর্জ্জরিত হইয়া ইহারা অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। পাহাড়েই প্রাণ বিয়োগ হইবার উপক্রম হইল। যাহা হউক মরণের সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহারা আসাম পুলিশের হাত এড়াইল। গৌহাটী হইতে নলিনী বিহারে গেল। কিন্তু সেখানে থাকা নিরাপদ নয় দেখিয়া বাংলায় আসিল। হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া নলিনী দেখিল কেহই তাহাকে নিতে আসে নাই। কোথায় বিপ্লববাদীরা আত্মগোপন করিয়া আছে কে জানে? নলিনী প্রমাদ গণিল। সঙ্গে একটী রিভলভার। কোথায় যাইবে? এক পক্ষাধিক কাল অনিদ্রা, অনিয়ম ও অনাহারে শরীর অবসন্ন। বিষাক্ত পার্ব্বত্য পোকা তখনও মাথায়, দেহে লাগিয়াই আছে। হাওড়াতেই প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইল। নিরুপায় হইয়া অগতির গতি গড়ের মাঠের এক গাছতলায় শুইয়া পড়িল। দিন রাত্রি মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। পরের দিন দৈব ঘটনায়ই যেন এক পরিচিত বিপ্লববাদীর চোখে নলিনী পড়িয়া গেল। বিপ্লববাদী তাহাকে তুলিয়া ধরিল। নলিনীর সর্ব্বাঙ্গে বসন্ত! বিপ্লববাদীরা সবই প্রায় ধরা পড়িয়াছে। কলিকাতার অবস্থা শোচনীয়। টাকা পয়সা কাহারও হাতে নাই। দুই চার জন যাহারা ছিল, তাহারাই তখনও ক্ষীণ আশায় এদিক ওদিক ঘুরিতেছে।

কলিকাতায় এক ক্ষুদ্র কুঠুরিতে নলিনীকে রাখা হইল। বসন্তে চোখ মুখ ঢাকিয়া গেল, জিহ্বা অচল। অর্থাভাবে, বিনা চিকিৎসায় রহিল। পথ্য ঘোল। তিন দিন কথা বন্ধ। ঐ বাসায় মাত্র একজন বিপ্লববাদী আত্মগোপন করিয়া আছে।

মৃতদেহ সৎকারের লোকও জুটিবে না। ১৯১৮ সালে বিপ্লববাদীদের অবস্থা এমনই ধারার শোচনীয়। নলিনী এ বসন্তেও মরিল না। ভাল হইয়া আবার পূর্ব্ব বঙ্গে (ঢাকায়) অবশিষ্ট নির্ব্বাণোন্মুখ বিপ্লববাদীদের ভার লইয়া বসিল। নলিনীর সঙ্গে তারিণী মজুমদার রহিল। ১৯১৮ সালের ১৫ই জুন ভোরে নলিনীর বাসা পুলিশ ঘিরিয়া ফেলিল। দুইজনই পিস্তল লইয়া বাহির হইল। গুলি চলিল। পুলিশও খুন জখম হইল। তারিণীর গায়ে বিস্তর গুলি লাগায় তাহার মৃতদেহ ওখানেই পড়িয়া রহিল। নলিনী গুলি খাইয়াও বাহির হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বন্দুকের গুলিতে সে মাটিতে পড়িয়া যাওয়ায় পুলিশ আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। হাসপাতালে তাহার শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিপ্লবাগ্নির শেষ শিখাও নির্ব্বাপিত হইল।

বিপ্লববাদী অবনী মুখার্জ্জি সিঙ্গাপুরে তাঁহার মারাত্মক নোটবুক সমেত গ্রেপ্তার হইয়া সিঙ্গাপুর কেল্লার বন্দীনিবাসে অবস্থান করিতেছিলেন। কোর্টমার্শেলে তাঁহার মৃত্যুর হুকুম হইয়াছে! বেচারা কিন্তু মরিতে নারাজ! বাঁচিতে চাহেন। কেমন করিয়া পালান যায়! সেই অজ্ঞাত বন্ধুবান্ধবহীন দেশে কে তাঁহাকে সাহায্য করিবে। কিন্তু সাহায্য মিলিল। অবনী কেল্লায় নানা চেষ্টা চালাইলেন, কেল্লার বন্দীশালার বিদেশী কর্ম্মচারীর কি জানি কেন কৃপা হইল। অবনীকে কেল্লার বাহির করিয়া দিবে স্থির হইল।

কিন্তু তাহার পর সমুদ্র পার হইবেন কেমন করিয়া? কেমন করিয়া অন্য দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? কড়াকড়ি পাহারা—উপকূল হইতে যাইতে ও নামিতে প্রহরীর দৃষ্টির মধ্য দিয়াই যাইতে হয়। অবনী জনকয় জাপানীর সঙ্গে নৌকায় আসিয়া জলকেলির অভিনয় করিতে করিতে অপর কূলে আসিয়া পৌঁছিলেন। কখনও নৌকা হইতে লাফাইয়া জলে পড়িতে লাগিলেন, কখনও পারে উঠিতে লাগিলেন। অবনী উপকূলে রহিয়া গেলেন। নৌকায় জাপানীরা বসিয়া রহিল—দাঁড় টানা আরম্ভ হইল। প্রহরীরা ভাবিল, জল খেলিয়া সকলেই চলিয়া গেল। অবনী এইভাবে সিঙ্গাপুর কেল্লা হইতে মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়া পলাইলেন। কিন্তু তাহার পর যাইবেন কোথায়? সর্ব্বত্র ধরা পড়িবার আশঙ্কা। আকৃতি, কথাবার্ত্তা সবই যেন ধরাইয়া দিতে চাহে। অগত্যা অবনী সমুদ্রের উপকূল ধরিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। ভয়ঙ্কর শ্বাপদ-সঙ্কুল জঙ্গলের মধ্য দিয়াই হাঁটিতে লাগিলেন। কোথায় যাইতেছেন, জানেন না। সেই অজ্ঞাত দেশ—উপরে আকাশ, একদিকে অনন্ত সমুদ্র, অন্য দিকে গহন বন। আহার নিদ্রা নাই। কিন্তু হঠাৎ ঐ সমুদ্রেরই তীর ঘেঁসিয়া একখানা নৌকা যাইতেছে দেখা গেল। তিনি নৌকার মাঝির দিকে অগ্রসর হইলেন। মাঝিও তাঁহার কথা বুঝে না, তিনিও মাঝির কথা বুঝেন না। একপক্ষে তাঁহার ভালই হইল, তিনি যে কে তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা হইলেও মাঝি কিছু জানিতে পারিল না। তাঁহার কাছে সামান্য যে অর্থ ছিল, মাঝিকে দিলেন। মাঝি ঐ দিকেরই এক দ্বীপবাসী। তাঁহাকে নৌকায়

তুলিয়া লইল—কিছু খাদ্যও দিল। অবনী সুমাত্রা দ্বীপে আসিলেন। সুমাত্রায় দিন কয় বিশ্রাম করিয়া জাভায় চলিয়া গেলেন। সেখানে ধৃত হইবার ভয়ে, ভৃত্য হইয়া এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ইউরোপে মস্কো সহরে পলাইয়া যান।

পরিশিষ্ট

আন্দোলনের প্রথম পর্য্যায়

গুপ্তসমিতির মধ্যে কয়েকটা দোষ দেখা যায়। অভিজ্ঞতা হইতেই অবশ্য একথা বলিতেছি।

ভীরুতার প্রশ্রয়ও ইহাতে আছে। একটা দৃষ্টান্ত দিব। ধরা যাক্, জনৈক বিপ্লববাদী কোন ষ্টেশনে গিয়াছে। সেখানে সে দেখিল একজন কর্ম্মচারী কোনও দরিদ্র দেশীয় লোককে অপমান ও লাঞ্ছনা করিতেছে। বিপ্লববাদী দেখিয়া অন্তরে বেদনা পাইল। কিন্তু অগ্রসর হইয়া অত্যাচারীকে বাধা দেওয়া এবং তাহার ফলে, একটা মারামারি বা বিপদকে বরণ করা—এসব কিছুই করিল না। কিন্তু মনে মনে ঠিক করিল, বেটাকে শাস্তি দিতে হইবে। সেই শাস্তি যে গুপ্ত প্রণালীমতেই দিতে হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য অত্যাচার মাত্রেই সব সময় বাধা দিতে যাওয়া সকল বিপ্লববাদীর পক্ষেই বিপ্লবের দিক দিয়া সঙ্গত হয় ত' নহে। যে এত করিয়া আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহার হঠাৎ সাময়িক একটা আবেগে চালিত হইয়া একটা হাঙ্গামা না বাধানই ভাল। তেমন প্রকাশ হইবার ফলে বিপ্লবকার্য্যে অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। অনেকে এ সমস্ত ছোট-খাট

ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া দলের কোনও বিঘ্ন এইজন্য ঘটাইতে চাহে নাই। তাহাতে অভীষ্টলাভে বাধা পড়িবার সম্ভাবনা। কিন্তু এ ভাবে কর্ত্তব্য বুঝিয়াও প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিতে যাহারা চাহে নাই—তাহারা সকলেই সমান সাহসী, বীর, ত্যাগী হয় ত' ছিল না। এমনও হয় ত' কেহ থাকিত যাহার ভিতরে একটু দুর্ব্বলতা লুকাইয়া আছে। কিন্তু সেও যখন প্রকাশ্যে কিছু করিতে না চাহিয়া গুপ্ত ভাবেই করিতে চাহে তখন তাহাতে তাহার দুর্ব্বলতা প্রশ্রয় পায়। অনেক সময় সে বুঝেই না যে, আত্ম-প্রবঞ্চনা করিতেছে। হয় ত' যে কাজটা ভয়েই করে না, তাহাও বিপ্লববাদের খাতিরেই করিতেছে না, ইহাই মনে করে। সব কাজই গুপ্ত ভাবে করিতে করিতে প্রকাশ্যে কিছু করার অভ্যাসও চলিয়া যায়। অথচ প্রকাশ্যে তেমন কাজ করার মধ্যে একটা সাহসিকতা আছে। প্রকাশ্যে একটা অন্যায়কে প্রতিবাদ করিবার অভ্যাস কোন কোন বিপ্লববাদীর চলিয়া যায়। অবশ্য যাহারা এ সমস্ত দুর্ব্বলতার অতীত—অর্থাৎ যাহাদের মধ্যে ভীরুতা, ক্ষুদ্র স্বার্থ প্রভৃতির নাম গন্ধও ছিল না—তাহাদের এই গুপ্ত ব্যাপারে কোন ক্ষতি করে নাই। কিন্তু অপর যাহারা গুপ্ত সমিতির আবহাওয়ায় বা তাহার দোহাই দিয়া, প্রকাশ্যে কোন বিরোধ করিতে চাহে নাই—কিন্তু গুপ্ত ভাবে খুব শক্ত বিপজ্জনক কাজেও হাত দিয়াছে, তাহাদের মধ্যে হয় ত' একটা দুর্ব্বলতা অনেক সময় লুকাইয়া থাকিত।

* * *

বিপ্লববাদীদের গুপ্ত সমিতির কর্ম্মপদ্ধতিতে এ সমস্ত দলে সময় সময় অনেক অযোগ্য, মূর্খ লোকও নেতৃত্ব করিতে পারে। তাহার অজ্ঞতা, মূর্খতা প্রভৃতি ধরিবার উপায় এ ব্যাপারে সময় সময় থাকে না। সাধারণের সমালোচনার মুখে না পড়িলে, মানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি, যোগ্যতা প্রভৃতি ব্যাপারের যাচাই সব সময় হয় না।

বিপ্লববাদীদের একটা violence জঙ্গী বিভাগ ছিল। এই বিভাগই সাধারণত খুন, ডাকাতি প্রভৃতি করিয়াছে। এ বিভাগে বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ লোকই যে কেবল কৃতিত্ব দেখাইয়াছে তাহা নহে, বিদ্যাবুদ্ধিহীন, উচ্চ আদর্শহীন কেহ কেহ কখনও হয় ত' খুব কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। বিপ্লববাদীদেরও শেষকালে এমন একটা সময় আসিল—যখন এই খুন জখম, ডাকাতিতেই জোর পড়িল বেশী। এদিকে যে যোগ্য তাহার আদর খুব। সুতরাং সে-ই কর্ম্মীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাইতে থাকিল। এমন কি পুরাতন অভিজ্ঞ নেতাদের অবর্ত্তমানে ইহারাই প্রধান হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে নেতারা হয় ত' ইহাদের দ্বারা এই সমস্ত কাজই করাইয়াছেন; কিন্তু দল পরিচালন ব্যাপারে ইহাদের কোন হাতই থাকিত না। তাঁহারা ইহাদের যোগ্যতা সবই জানিতেন। কিন্তু তাঁহাদের অবর্ত্তমানে নূতন ছেলেদের কাছে ইহারাই হইত প্রধান। নূতন ছেলেদের ইহারাই পরিচালনা করিত। তাহারা ইহাদের দ্বারা পরিচালিত হইত, কিন্তু ইহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, বিচক্ষণতার পরিচয় কিছুই পাইত না, বুঝিতও না। গুপ্ত ব্যাপারে অনেক কথা জানিবারও উপায় নাই। কোন সমস্যার কথা উঠিলে 'তোমাদের

ও-কথা জানিবার প্রয়োজন নাই'—বলিয়াই ছেলেদের দাবাইয়া দেওয়া অসম্ভব হইত না। ছেলেরা প্রথম প্রথম ভাবিত, জানিবার হয় ত' প্রয়োজন নাই। অথবা কেহ ভাবিত, যখন বলিতেছেন না তখন কি জানি, এক রহস্য আছে। অবশ্য এ রকম অযোগ্য কেহ কেহ শেষের দিক দিয়াই কর্ত্তৃত্ব করিয়াছে। তবে তাহাদের প্রভাব অতি অল্প সময়েই নষ্ট হইয়াছে। অযোগ্যের হাতে গুরুতর ব্যাপারের ভার পড়িলে যেমন নানা দিকে ব্যভিচার ঘটে, এ বেলাও তাহাই ঘটিয়াছে।

শেষ অবস্থায় এমন একটা সময় আসিল, যখন খুব সাহসিকতার কাজ দেখাইতে পারিলেই কর্ত্তৃত্বের ভার আসিয়া পড়িত। ভাবপ্রচার, দল গঠন ও বিস্তৃতি সম্পর্কে যে বিদ্যা, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন, এ সমস্ত খুন ডাকাতির ব্যাপারে তেমন না হইলেও হয়। মৃত্যু যেখানে, সেখানে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, নানা বিপজ্জনক কাজে হাত দিতেছে,—সুতরাং শেষের ঐ ভাঙ্গা হাটে—যখন সকলেই মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, মরণ আর মারণ ইহাই প্রধান কথা—তখন এমনই কেহ কেহ নেতৃত্ব করিয়াছে; তাহাদের মধ্যে বিপ্লববাদীদের সেই দার্শনিক অনুভূতি, নৈতিক চেতনা, দায়িত্ববোধ ছিল না—ছিল কেবল সাহসিকতা। শুধু সাহসিকতায় পশুত্বকে বড় করিয়া তুলিতে পারে—কিন্তু মানুষের সাহসিকতার পরেও কিছু আছে। এই শ্রেণীরই অতি বড় সাহসিক এক কর্ম্মী শেষকালে তাহার স্বার্থ বা কর্ত্তৃত্ব লাঘবের ভয়ে—একজন যুবককে হত্যা করে। লক্ষ্ণৌএর বাগানে

১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে তাহার শেষ নিঃশ্বাস পড়িয়াছিল—তাহা কোন্ ভ্রান্তিকে অভিসম্পাৎ করিয়াছে, কে জানে ?

* * *

বাংলার রমণী এই বিপ্লবদলে হাতে হাতে তেমন যোগ দেন নাই। তেমন চেষ্টাও চলে নাই। তবে সহানুভূতিসম্পন্ন কেহ না ছিলেন এমন নহে। বীরভূমের দুকুরীবালা দেবীর অস্ত্র আইনে সাজা হয়। তিনি জেল ভোগ করেন।

* * *

বাংলার বিপ্লববাদীদের পুলিশে অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া অনেক কথা অনেক স্থানে উঠিয়াছে। অবশ্য ছোট-খাট অবশ্যম্ভাবী লাঞ্ছনা ধর্ত্তব্য নহে। তবে ১৯১৬ সালের শেষভাগে ভীষণ অত্যাচারের কথা দেশে প্রচারিত হয়।

১৯১৬ সালের শেষভাগে হাতিয়া দ্বীপ হইতে রওনা হইয়া কলিকাতা দলন্দায় আসিতেছি। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের তিন আইন মতে রাজবন্দী হইলাম। সন্দ্বীপ হইতে ভূতপূর্ব্ব মুনসেফ্ অবিনাশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও আসিলেন। একত্র নোয়াখালীর থানায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে কতটি যুবক দেখিলাম। তাহারা সদ্য Internmentএর হুকুম পাইয়াছে। দলন্দায় মাসখানেক ছিল। আমাদের দলন্দায় নিতেছে, শুনিয়া বলিল, 'যান দেখবেন ব্যাপার !' তাহাদের কাছে শুনিলাম, 'কনফেশন' করাইবার জন্য সেখানে ও কীড ষ্ট্রীটে ভীষণ অত্যাচার করা হইতেছে। অত্যাচারের প্রকৃতিও তাহারা বলিল। কেহ শোনা কথা বলিল,

কেহ বলিল, ভুক্তভোগী। আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করিলাম। গোয়ালন্দে ষ্টীমারে উঠিয়াছি, অবিনাশ বাবুও আছেন। বলাবলি করিলাম। কি রকম অত্যাচার হইতে পারে, কল্পনাও করিলাম। দলন্দায় গেলাম, ভাবিলাম, এইবার সুরু হইবে। বিপ্লববাদীদের কাহাকেও দেখিলাম না। একজন (সেন) সেখানে Intern ছিলেন। তিনি খুব স্বাধীনভাবে ঘোরা ফেরা করিলেন, দেখিলাম। সাহেবদের সঙ্গে বেশ খাতির। তিনি জানাইলেন, কে কে নাকি মার খাইয়া প্রথম কিছু বলে নাই, কিন্তু শেষে সব বলিয়াছিল। বুঝিলাম, তিনি অনেক জানেন। তিনিও বলিলেন, আপনাদের হয়ত অন্যত্র লইয়া গিয়া সব জিজ্ঞাসা করিবে। একটা অত্যাচার যে অদূরে অবস্থান করিতেছে, তাহা কল্পনা করিয়া আমরা নানাভাবে তাহা 'উপভোগ' করিতে লাগিলাম। কিন্তু রাত্রিতে সিপাহীরা আসিয়া অবিনাশ বাবুকে ও আমাকে মেদিনীপুর লইয়া গেল। মার-ধর—কিছু খাইলাম না। জেলে আসিলাম। পরে নূতন নূতন অনেকেই আসিতে লাগিলেন—অনেকের মুখেই নিদারুণ অত্যাচারের কাহিনী শুনিলাম। কেহ দরখাস্ত করিয়াও গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন।

শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহ মেদিনীপুর হইতে বাংলা গবর্ণমেণ্টের কাছে দরখাস্ত পাঠায়। দরখাস্তে অন্যান্য কথার মধ্যে এই কথাগুলিও লেখা থাকে :—

2. "That your humble memorialist was severely tortured on his way to the Kyd Street S. B. Police

Office as an effect to which he had to pass stools in his cloth, and that he was not even allowed to take his shoes and dress when he was taken away from his shop.

3. "That your humble memorialist was kept in the Kyd Street Police Office up to 22nd July 1916 without being produced before any open court and under brutal extortion and starvation.

4. "That your humble memorialist had to pass five days 24 hours in a standing posture without a wink of sleep in addition to all sorts of brutal extortion.

5. "That your humble memorialist was given diet in those days which in quality is unedible and in quantity less than 1/5th of the required quantity and was not given rice as effect of which he lost some 12 or 13lbs in those 14 days."

ইহার মোটামুটি বাংলা ঃ—

(২) আবেদনকারীকে কীড্ ষ্ট্রীটের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ, পুলিশ আফিসে নেওয়ার সময় সে ভীষণভাবে প্রহৃত হয়, ফলে সে কাপড়ে মলত্যাগ করিয়া ফেলে। তাহাকে দোকান হইতে গ্রেপ্তার করিয়া নেওয়ার সময় জুতা ও পরিচ্ছদ লইতে দেওয়া হয় নাই।

(৩) আবেদনকারীকে ২২শে জুলাই পর্য্যন্ত (৮ই জুলাই ধৃত হয়) কোন আদালতে উপস্থিত না করিয়া কীড্ ষ্ট্রীটে রাখা হয়। সেখানে সে অনাহার ও পাশবিক অত্যাচারের মধ্যে দিন কাটায়।

(৪) আবেদনকারী প্রথম পাঁচ দিন ২৪ ঘণ্টাই দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তখন ঘুমাইতে পারে নাই। সে অবস্থায়ও অমানুষিক অত্যাচার চলিতে থাকে।

(৫) আবেদনকারীকে এই সময় যে খাদ্য দেওয়া হইত তাহা অখাদ্য। আর তাহা পরিমাণে প্রয়োজনের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। তাহার ফলে সে চৌদ্দ দিনে ১২।১৩ পাউণ্ড ওজনে কমিয়া যায়।

১৯১৮ সালের আগষ্টের 'মডার্ণ রিভিউ'এ এই কথাগুলি আছে :—

"Early last month we received a copy of a petition submitted to His Excellency the Governor-General in Council by one Jogesh Chandra Chatterjee, a State prisoner now in Rajshahi Central Jail. It contains allegations of incredible cruelties and revolting ill-treatment. One extract from it will suffice. The prisoner thus describes what happened on the 5th day after his arrest :—

"That on the 5th day at about 5 p. m. I was again taken to the office at Kyd Street. There the officer (of the first day) according to the proposal of an officer in European costume called and they four took me to the latrine. There one man took hold

of my hands, another head, and the officer in European costume pressed my nostrils and the Methtar put a commodeful of urine mixed with stools and thurst and poured it all over my face. Then they kept me in my cell and did not allow me to have a wash. All these days I was not allowed to take my bath, and got only 2 or 3 luchies for food and that too, not every day."

We do not know whether this petition has reached the Viceroy's hands. If it has not, it is to be hoped that His Excellency will order it to be placed before him and cause an open enquiry to be made."

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চাটার্জ্জির দরখাস্তের উত্তরে গবর্ণমেন্ট জানান যে তাঁহার অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা।

যাহাই হউক, মিসেস্ এনি বেসাণ্ট দুইখানা পত্র পান। তাহাতে অনেকের উপর অত্যাচার করার কথা লেখা থাকে। মিসেস্ বেসাণ্ট সেই পত্রের উপরে নির্ভর করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টকে ইহার সত্যাসত্য অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করেন। ফলে একটী তদন্ত কমিটী বসে। মিসেস্ বেসাণ্টের দ্বিতীয় পত্রে এগার জনের নাম ছিল। কমিটী তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। এই এগার জনের নাম কুভুবাদিয়ার ডেটেন্যুরাই যে পাঠাইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কমিটি তদন্তে সি. আই. ডি.র প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করেন। Hon. Mr. Stevenson

Moore এবং Sir. B. C. Mitter এই তদন্ত কমিটীর মেম্বার ছিলেন। কলিকাতা রাইটার্য়স্ বিল্ডিংএ সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। পূর্ব্বোক্ত আবেদনকারী অরুণও সাক্ষ্য দেয়।

বঙ্গীয় সিভিল রাইট্‌স্ কমিটির সেক্রেটারী বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টকে উক্ত কমিটির রিপোর্ট চাহিয়া এক পত্র লেখেন। গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে ১৯১৮ সালের ১১ই জুলাই পত্রের উত্তর দেওয়া হয়—"That such portions of the report...as it intended to publish, have already been communicated to the press." 'রিপোর্টের যে অংশ গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করিয়াছেন তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।' ১৯১৮ সালের ৪ঠা জুলাই 'ইংলিশম্যানে' মাননীয় ষ্টিভেন্‌সান মুর ও স্যর বি. সি. মিত্রের রিপোর্ট বাহির হয়। রিপোর্টে দেখা যায়, এগার জনের মধ্যে চার জন সাক্ষ্য দিতে আসিয়া বলেন, তাহারা কমিটির কাছে কোন সাক্ষ্য দিবেন না। দুইজন সাক্ষ্য দিতে গিয়া বলেন, তাহাদের পক্ষে যে অভিযোগ বর্ণনা করা হইয়াছে—তাহা মিথ্যা। একজন সামান্য অত্যাচারের কথা বলেন, কমিটি তাহা বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু অবশিষ্ট চার জন, ক্ষেত্রমোহন সিংহ, আশুতোষ কাহিলী, অরুণ ও অনন্ত কমিটির কাছে অত্যাচারের কথা বলে ("made before us specific charges of ill-treatment and torture against the Special Branch." কিন্তু কমিটি বিশেষ ভাবে তদন্ত করিয়া দেখিয়াছেন যে অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন। ("We have analysed these officers

of the Intelligence Branch and the charges at some length with the result that we are satisfied that they are quite unfounded.")

এই রকম নানাবিধ অত্যাচারের কাহিনী দেশে প্রচারিত হয়। দরখাস্তও যায়, উত্তরও আসে, তদন্তও বসে। কেহ যদি সত্যই অত্যাচারিত হইয়া থাকে, [illegible] জানে সত্য কি, আর কেহ যদি সত্যই অত্যাচার করিয়া থাকে সেও জানে সত্য কি; আর জানেন একজন, তিনি সবই জানেন, তিনি সর্ব্বতোচক্ষু ন্যায়াধীশ ভগবান। সাক্ষ্য ও তদন্ত সেখানে নিষ্প্রয়োজন।—কিন্তু এই অত্যাচারের কাহিনী এতই প্রচারিত হইয়াছে—অত্যাচারিতগণ স্বীয় নিগ্রহের কাহিনী এমন স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বিপ্লববাদী ও দেশবাসী ইহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছে।

পরিশিষ্ট

আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্য্যায়

১৯১৮ সালের পরে বাংলার বিপ্লববাদীদের আর বড় একটা অস্তিত্ব প্রকাশ পায় নাই। কর্ম্মী অনেকেই ধৃত, দণ্ডিত; অনেকেই অন্তরীণে আবদ্ধ, অনেকে ষ্টেট্ প্রিজনার, অনেকে খণ্ডযুদ্ধে মৃত—অবশ্য এর পরও জন কয় ফেরারী ছিলেন। তাঁহারা, যথা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি চন্দননগরের শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়কে মধ্যস্থ করিয়া সি. আই. ডি. বিভাগের কর্ত্তাদের সঙ্গে সর্ত্ত সাব্যস্ত করিয়া ১৯২১ সালে আত্মপ্রকাশ করেন।

১৯২০ সালে রিফর্ম এ্যাক্টের সঙ্গে সম্রাটের ঘোষণাবাণী প্রচারিত হয়। তাহারই ফলে অনেক অন্তরীণ ও রাজবন্দী মুক্ত হন। মুক্ত রাজবন্দীদের নানাভাবে সাহায্য করিবার জন্য যাঁহারা তখন চেষ্টা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে স্বর্গীয় দেশবন্ধু দাশ, মিঃ বি. সি. চ্যাটার্জ্জী, মিঃ আই. বি. সেন, কুমার কৃষ্ণ দত্ত, ওয়াই. এম. সি. এ'র ভারতীয় বিভাগের মিঃ আর. ও. রাহার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইহার পরই কলিকাতা স্পেশাল কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ মন্ত্র প্রথম ঘোষিত হয়। অসহযোগ-খেলাফৎ সমগ্র ভারতের রাজনীতিক আন্দোলনে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত করে। বহির্মুখীন খিলাফৎ আন্দোলনের অযৌক্তিকতা বাংলার বহু রাজনীতিক, চিন্তাশীল ব্যক্তি ও বিশেষভাবে বহু বিপ্লববাদী বহু স্থানে বলিয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সবখানি তত্ত্ব বাংলার বিপ্লববাদীরা গ্রহণ করিতে না পারিলেও এই আন্দোলনের মধ্যে যে স্বাদেশিকতা ছিল, এবং এই আন্দোলনের মধ্যে জনগণের সঙ্গে যে সহযোগীতার ভাব ছিল তাহাতেই অনেক বিপ্লববাদী আকৃষ্ট হন, এবং নব উদ্যমে নাগপুর কংগ্রেসের পরে ইহাতে যোগ দেন।

বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কিত নর-হত্যা, ডাকাতি প্রভৃতি কোন কর্ম্ম আর বাংলায় অনেক দিন প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু কলিকাতা শাঁখারিটোলা পোষ্ট মাষ্টারের হত্যাকাণ্ডে বরেন ঘোষ ধৃত হইলে (১৯২২), পুরাতন পদ্ধতিক্রমে একদল লোকের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার কথা প্রকাশ পায়। সন্তোষ মিত্র প্রভৃতি ঐ সম্পর্কে ধৃত হয়, দ্বিতীয় আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা চলে, কিন্তু মামলা টিঁকে না। মাণিকতলায় বোমা আবিষ্কৃত হয়, যশোদা ও অবনী দণ্ডিত হয়। যশোদা যক্ষ্মায় মারা যায়।

তার পর মিঃ টেগার্টকে হত্যা করিতে গিয়া ভুলে মিঃ ডে নামক একজন ইংরাজকে হত্যা করায় গোপীনাথ সাহা ধৃত হয়, এবং নিজে স্বীকার করে যে, সে মিঃ ডে'কে ভুলে হত্যা করিয়া

ফেলিয়াছে বলিয়া দুঃখিত, সে মিঃ টেগার্টকেই হত্যা করিতে চাহিয়াছিল। এই স্বীকারোক্তির ফলে গোপীনাথের ফাঁসি হয়।

১৯২৩ সালে দিল্লীর স্পেশাল কংগ্রেস শেষ হইলেই বাংলার মুক্ত ভূতপূর্ব্ব জন কয় বিপ্লববাদীকে পুলিশ রেগুলেশন আইনে ধৃত করে। তাঁহারা বাহির হইয়া অপরাধজনক কোন কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া দেশের কেহ মনে করে না। পাছে কিছু করেন, এই অতি সাবধানতায়ই তাঁহাদের পুলিশের কর্ত্তারা ধরিয়া আটক করে। ইহারই এক বছর পরে বাংলার আরও কয়েকটি মুক্ত রাজবন্দীকে পুনরায় আটক করা হয়। নূতন লোককেও আটক করা হয়। তন্মধ্যে তদানীন্তন কলিকাতা করপোরেশনের চীফ্ একজিকিউটিভ্ অফিসার সুভাষচন্দ্র বসুও ছিলেন।

এই অর্ডিন্যান্স ও তিন আইনে যদিও এবার অনেক ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দীকেই আটক করা হইয়াছিল, (দেশেও এই অন্যায় ধর-পাকড়ের জবরদস্তীর জন্য যথেষ্ট আন্দোলন হয়) তবু ইহা সত্য যে ধৃত অনেকেই অশান্তিকর কিছু করেন নাই। কেহ করিয়াছেন, এমন কোন প্রমাণই গবর্ণমেণ্ট দিতে পারেন নাই।

তারপর দেখা দিল কাকোরী ট্রেন ডাকাতি।—দক্ষিণেশ্বর ও শোভাবাজারে বোমা আবিষ্কার। দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় যাহাদের সাজা হইয়াছিল, তাহারাই আলিপুর জেলে সি. আই. ডি. বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হত্যা করে; এবং ফলে প্রমোদরঞ্জন ও অনন্তহরি চরম দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

কাকোরী ট্রেন ডাকাতির সম্পর্কে আর একটি ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রপাত হয়। পূর্ব্বে কাশী ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত শচীন্দ্রনাথ সান্যাল কলিকাতায়ই ধৃত হন। এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের ষড়যন্ত্রের মামলার আসামী হন। এই মামলা সম্পর্কে পঁয়তাল্লিশ জনকে গ্রেপ্তার করে। এবং দেড় শত বাড়ী খানাতল্লাস হয়। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার স্থান যদিও উত্তর ভারত, এবং ষড়যন্ত্রে যদিও যুক্ত-প্রদেশের অ-বাঙালী জন কয় ছিলেন, তবু মামলায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, ঐ বিপ্লব-ষড়যন্ত্রের প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন বাঙালী যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী এবং শচীন্দ্র সান্যাল প্রভৃতিই।

এই মামলায় শাস্তি অত্যন্ত কঠোর হইয়াছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। ইতিপূর্ব্বে কোন ষড়যন্ত্র মামলায়ই এত কঠোর সাজা হয় নাই। দণ্ডিত আসামীদের আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে কিছু না বলিয়াও তাঁহাদের কর্ম্মফল, তাঁহাদের কর্ম্মের শুভাশুভ, দুঃখ কষ্ট তাঁহারা যে শেষ পর্য্যন্ত একনিষ্ঠ দৃঢ়তায় অবিচলিত ভাবে বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছেন ইহাও বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের আর একটা দিক। এই মামলায় রাজেন্দ্র লাহিড়ীর ফাঁসী হয়। গ্রেপ্তারের সময় সে এম. এ. পড়িত, বয়স ২১।২২ হইবে।

সাজাহানপুরের পণ্ডিত রামপ্রসাদের ফাঁসী হয়। আসফক উল্লারও (সাজাহানপুর নিবাসী) ফাঁসী হয়। আসফক্ উল্লা জাতিতে পাঠান ছিলেন। বিপ্লব আন্দোলনে ভারতীয় মুসলমানের এই প্রথম ফাঁসী।

ঠাকুর রোশন সিংহেরও ফাঁসী হয়। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁহার প্রথম সাজা হয়। প্রকাশ জেলে তিনি বিপ্লবীদের কাছে বিপ্লবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁহার বাড়ী বেরেলিতে।

যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, গোবিন্দচন্দ্র কর, মুকুন্দীলাল গুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ বক্সী, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের হুকুম পান। মন্মথ গুপ্ত ১৪ বছর, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১০ বছর, বিষ্ণুশরণ দুব্লিস্ ১০ বছর, রামকৃষ্ণ ক্ষেত্রী ১০ বছর, রাজকুমার সিংহ ১০ বছর এবং আরও কয়েকজন সাজা পান। কাকোরী মামলার পর, দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলা হয়। দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার ভারতব্যাপী বিরাট ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনেন; ফলে এলাহাবাদের শৈলেশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি দশ জনের কারাদণ্ড হয়।

বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের ধারা বাংলায় ও বাংলার বাহিরে পুনরায় এই ভাবে স্থানে স্থানে আত্মপ্রকাশ করিলেও,—বাংলার বহু মুক্ত বিপ্লবপন্থীই কংগ্রেস প্রভৃতি প্রকাশ্য আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন।

পরিশিষ্ট

ষড়যন্ত্র মামলা

এখানে সমগ্র বাংলায় বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন দলে উল্লেখযোগ্য যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, যে সমস্ত মামলা হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইতেছে। বাংলায় বিপ্লব আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৯০৪ সাল হইতে বারীন্দ্রপ্রমুখ যুগান্তর দলের ব্যক্তিদের দ্বারা। ঐ সময় (১৯০৫) বঙ্গবিভাগের আন্দোলনও আরম্ভ হয়, একথা বলা হইয়াছে। এই যুগান্তর দলের কর্ম্মীরাই ১৯০৮ সালে মুরারীপুকুর বাগানবাড়ীতে ধৃত হন। বারীন্দ্র স্বীয় জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, ১৯০৭ হইতে ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত চৌদ্দ পনের জন ত্যাগী যুবক তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তিনি এবং উপেন্দ্র প্রভৃতি তাহাদের ধর্ম্ম ও রাজনীতি শিক্ষা দিতেন; ভবিষ্যৎ বিপ্লবের আয়োজনের জন্য তাঁহারা কেবল প্রস্তুত হইতেছিলেন। সে জন্য সামান্য অস্ত্র শস্ত্রই মাত্র তাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বারীন্দ্র বলেন "আমি এগারটি পিস্তল, চারিটি বন্দুক, একটি কামান সংগ্রহ করিয়াছিলাম"। উল্লাসকর দত্ত বোমা তৈরী নিজেই শিখিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র দাস নিজ সম্পত্তির অংশ বিক্রয় করিয়া প্যারীতে গিয়া বোমা তৈরী শিখিয়া আসেন এবং

উভয়ে বোমা তৈরী কার্য্যে লিপ্ত হন – একথা বারীন্দ্রের জবানবন্দীতে প্রকাশ। এই মামলার আসামী নরেন গোঁসাই এপ্রুভার হইয়া যে জবানবন্দী দেয় তাহাতে বাংলার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জড়ায়।

আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা। ১৯০৮ সালে এই মামলা আরম্ভ হয়। বাংলায় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের মামলা এই প্রথম। বার জনের সাজা হয়। এই দলের মুখপত্র যুগান্তর বাংলায় বিপ্লব প্রচার করিত। মুরারীপুকুরে বোমা পাওয়া যায়, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে বোমা আবিষ্কৃত হয়—এখানে হেমচন্দ্র দাস বোমা প্রস্তুত করিত। অন্যান্য স্থলেও অস্ত্র শস্ত্র রাখা হইত। দেওঘরের ‘শীল লজে’ও বিপ্লবীদের আড্ডা ছিল। প্রধান বিচারপতি রায়ে বলেন, এ দলে শিক্ষিত ও প্রবল ধর্ম্মবিশ্বাসী লোকদের লওয়া হইত। (“Men of education, of strong religious convictions”.)

ঐ ষড়যন্ত্রে যদিও বহু লোক লিপ্ত হয় নাই, তবু নানা দিক দিয়া এই ষড়যন্ত্র মামলাটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাই প্রথম মামলা। ষড়যন্ত্রকারীরা যথেষ্ট উদ্যম নির্ভীকতা, কৌশলবুদ্ধি দেখাইয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট এই মামলায় আটত্রিশ জনকে সেশনে সোপর্দ্দ করেন। বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, উপেন্দ্র, উল্লাসকর, অবিনাশ, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, বীরেন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্র লাল বক্সী, বিভূতি সরকার, সুধীর সরকার, ইন্দুভূষণ রায়, (আণ্ডামানে আত্মহত্যা করে) প্রভৃতির এই মামলায় সাজা হয়। মজফরপুর হত্যাকাণ্ড এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়ান হয়।

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা। ১৯১০ সালে ননীগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী প্রভৃতি ৪৬ জনকে ১২১ ক (রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র) ধারায় অভিযুক্ত করা হয়। ৪৬ জনের মধ্যে সাত জনের বিরুদ্ধে মামলা চলে না। ষড়যন্ত্রের স্থান শিবপুর (হাওড়া এবং ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য অংশ। আসামীদের কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয় যথা :-(১) শিবপুর দল (২) কুরচি দল (৩) খিদিরপুর দল (৪) চিংড়িপোতা দল (৫) মজিলপুর (৬) হলুদবাড়ী (৭) কৃষ্ণনগর (৮) নাটোর (৯) ঝাউগাছা (১০) যুগান্তর.(১১) ছাত্র ভাণ্ডার (১২) রাজসাহী (রামপুর বোয়ালিয়ার দল)। এই ষড়যন্ত্র মামলা টিঁকে না। বিচারকগণ রায়ে বলেন, যদিও বিভিন্ন দল নানা অপরাধজনক কার্য্য করিয়াছে নিশ্চিত তবু বিভিন্ন দলকে এই একটি ষড়যন্ত্রের মধ্যে আনা যায় না। শুধু এই কারণেই এই আইনের ফাঁকেই বহু আসামীকে ষড়যন্ত্রের মামলায় খালাস দেওয়া হয়। কেবল আসামীদের মধ্যে ছয় জনকে সাজা দেওয়া হয়, তাহারা হলুদবাড়ী ডাকাতিতে লিপ্ত ছিল।

উপরোক্ত বিভিন্ন group হইতে রায়তা, নেত্রা, হলুদবাড়ী প্রভৃতি বহু ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ।

খুলনা ষড়যন্ত্র মামলা। খুলনা জেলার নাংলা ডাকাতির পরে পুলিশের তদন্তের ফলে এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে। বিধুভূষণ দে প্রভৃতি ধৃত হয়। এগার জনের হাইকোর্টের বিচারে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের অপরাধে সাজা হয়। এই মামলা সম্পর্কে

জোরাবাগান ও আহিরীটোলায় খানাতল্লাস করিয়া 'মুক্তি কোন্ পথে' প্রভৃতি বহু রাজদ্রোহমূলক কাগজ পত্র পুলিশ হস্তগত করে। অস্ত্র শস্ত্র আমদানীর কথাও প্রকাশ হয়।

ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা। ১৯১০ সালে সাতচল্লিশ জনের নামে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের মামলা আনা হয়। তন্মধ্যে চুয়াল্লিশ জনকে দায়রায় সোপর্দ্দ করা হয়। এক বছরের উপরে মামলা চলে, ১৯১১ সালে আগষ্ট মাসে সেশন জজ ছত্রিশ জনকে দ্বীপান্তর ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। হাইকোর্টে আপীল করা হয়, ফলে চৌদ্দ জনের সাজা হ্রাস হয়, বাকি বাইশ জন খালাস পায়।

এই মামলা ঢাকা অনুশীলন সমিতির উপরেই চলে। এই সমিতির 'প্রতিজ্ঞাপত্র' আদ্য ও অন্ত্য অংশ 'পরিদর্শকের কর্ত্তব্য' 'সম্পাদকের কর্ত্তব্য' প্রভৃতি আলোচনা করিয়া বিচারপতি মুখার্জ্জী (স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়) বলেন যে সমিতি তাহাদের "Unnamed secret" রক্ষা করার জন্য, নেতার আদেশ নির্ব্বিচারে মানার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিল। প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রথম অংশ অতি সাধারণ। শেষাংশে মন্ত্রগুপ্তির দিকে অত্যন্ত জোর দেওয়া হইয়াছে। সমিতির সেই "Unnamed secret" লইয়া যাহাতে সমিতির সভ্যগণও পরস্পর আলাপ না করে, সমিতি হইতে যাহাতে কেহ বিচ্ছিন্ন হইতে না পারে সেদিকে পরিচালকের, নেতার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। 'পরিদর্শকের কর্ত্তব্যে'র মধ্যে গ্রাম্য সংবাদ সংগ্রহের (Village notes) উপদেশ ছিল; গ্রামের রাস্তাঘাট

নদনদী ইত্যাদির অবস্থান সংবাদ এবং অন্যান্য সংবাদ, যথা লোক সংখ্যা তাহাদের বিভাগ তাহাদের মতিগতি গ্রামে ব্যবসায় বাণিজ্য মেলা ইত্যাদির সংবাদ পরিদর্শককে সংগ্রহ করিতে হইত। স্থানীয় মানচিত্র তৈরী করিতে হইত।

এই মামলায় সরকার পক্ষের বহু লোক সাক্ষ্যদান করিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অপরাধের যোগাযোগ তেমন প্রমাণিত হয় নাই; এবং উপরোক্ত কাগজ পত্র না পাইলে হাইকোর্টের বিচারে যুদ্ধোদ্যমের ষড়যন্ত্র প্রমাণ করা হয়ত শক্ত হইত। হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত করেন:—সমিতির সভ্যদের নিয়ন্ত্রনের জন্য নিয়মাবলী ছিল। এই সকল নিয়মাবলী হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, সমিতি তাহার মন্ত্রগুপ্তি "Unnamed secret" রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিল; এই জন্য সভ্যদের মধ্যেও অনাবশ্যক আলোচনা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল; তাহারা আত্মীয় ও বন্ধুর কাছেও পরিচালকের বিনা অনুমতিতে পত্র লিখিতে পারিত না, এবং বাহির হইতে পত্র আসিলেও পরিচালককে দেখাইতে হইত, পত্র লিখিলেও দেখাইতে হইত, এসব ঠিক ঠিক অনুসৃত হইতেছে কিনা তাহা দেখাও সমিতির বিশিষ্ট সদস্যদের অন্যতম কর্ত্তব্য ছিল; সদস্যদের আত্মীয় স্বজন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইতে হইত। কোন সদস্যের কোন অর্থ আসিলে (আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক প্রেরিত) তাহা সমিতির সাধারণ অর্থ বলিয়া গণ্য হইত।

হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত করেন—

(১) সমিতি গোপনতা অত্যন্ত কড়া ভাবে রক্ষা করিত (jealously guarded secret), মন্ত্রগুপ্তি প্রকাশ না হয় এ নিমিত্ত সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিত। মন্ত্রগুপ্তিটি এমন যে তাহা নিজেদের মধ্যেও আলোচ্য নহে।

(২) সদস্যেরা মন্ত্রগুপ্তির প্রতিশ্রুতি 'ব্রত' গ্রহণ করিত এবং কতকটা সামরিক নিয়মানুবর্ত্তিতায় জীবন যাপন করিত।

(৩) ঢাকা সমিতি ছিল কেন্দ্র, তাহার অধীনে এই ধরণের আর আর শাখা সমিতিগুলি কাজ করিত।

(৪) সদস্যদের মধ্যে যাহারা 'অন্তরঙ্গ' হইত, তাহাদের কালী মূর্ত্তির সম্মুখে অত্যন্ত কঠোর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিতে হইত।

(৫) কোন বাহিরের লোক প্রতিশ্রুতি গ্রহণ না করিয়া যদি সমিতিতে ঢুকিত তবে সে যে সকল কথা জানিয়াছিল তাহা নষ্ট করা হইত। ('his knowledge was to be destroyed.')

(৬) সমগ্র বাংলাব্যাপী সমিতির ক্ষেত্র বিস্তৃত করাই ছিল উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি গ্রাম নগরের যাবতীয় সংবাদ সংগৃহীত হইত, মানচিত্রে ভৌগোলিক অবস্থান লিপিবদ্ধ হইত।

(৭) পুলিনবিহারী দাসের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল একটি *imperium in imperio* স্থাপন এবং নিজে তাহার নেতা হওয়া।

(৮) নেতার উপর সর্ব্ববিধ পূর্ণকর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত ছিল।

(৯) এই সমিতির অনেক সদস্যই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর বিদ্বিষ্ট ছিল।

(১০) বাহিরের লাঠি ছোড়া ড্রিল কুস্তি প্রভৃতি খেলার পরে সভ্যগণ পরিদর্শকের কর্ত্তব্যে উল্লিখিত 'গুপ্ত' ব্যাপার লইয়া ভিতরে ভিতরে আলোচনা করিত। এই সমিতি একটা বিপ্লব সমিতি।

বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা। ১৯১৩ সালে নরেন্দ্রমোহন সেন, রমেশচন্দ্র আচার্য্য প্রভৃতি চুয়াল্লিশ জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের অভিযোগে শমন জারী করা হয়। তন্মধ্যে সাঁইত্রিশ জনকে গ্রেফ্তার করা সম্ভব হয়। রজনীকান্ত দাস ও গিরীন্দ্র দাস সরকারী সাক্ষী হয়। গিরীন্দ্রের পিতা এ্যাডিশন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট্। সাত জনকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও দুই জনকে সেশন জজ খালাস দেন। বার জন, রমেশ ও ফেলু রায় প্রভৃতি সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অভিযোগ স্বীকার করে এবং অবশিষ্টদের বিরুদ্ধে সরকার মামলা তুলিয়া লন। এই মামলায় সরকারের সহিত আসামীদের সর্ত্ত হয়। সেই সর্ত্তানুযায়ী বার জন অপরাধ স্বীকার করে। ফলে অবশিষ্টের বিরুদ্ধে সরকার মামলা তুলিয়া লন এবং সর্ত্তানুযায়ী যাহারা দোষ স্বীকার করে তাহাদেরও সর্ত্তানুযায়ী নির্দ্দিষ্টকাল জেলবাসের পরই মুক্তি দেওয়া হয়। মামলার রায়ে বলা হয়—

(১) আসামীরা সকলেই অল্পবয়স্ক (১৯—২৯)।

(২) তাহারা যন্ত্রবৎ অপরের আদেশে চলিয়াছে। সেই পরিচালকদের গ্রেফ্তার করা সম্ভব হয় নাই, এবং তাহাদের পরিচয়ও পুলিশ জানে না।

(৩) বার বছর যাবত এই আন্দোলন চলিয়াছে।

(৪) District organisation schemeএ ছাত্রদের মধ্যে কিভাবে কাজ করিতে হইবে, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কিভাবে কাজ করিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ ছিল।

(৫) অল্পবয়স্ক যুবক ও ছাত্রই এই আন্দোলনের পরিচালক। বরিশালে এই দলের নেতা রমেশ আচার্য্যের বয়স মাত্র একুশ বছর।

বরিশাল ষড়যন্ত্রের দ্বিতীয় পর্য্যায়। পূর্ব্ব মামলায় যাহারা ফেরারী ছিল, তাহাদের বিভিন্ন স্থানে ও সময়ে ধৃত করা হয়। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে (১) মদনমোহন ভৌমিক ওরফে মদনচন্দ্র ভৌমিক ওরফে কুলদাপ্রসাদ রায় (২) ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী ওরফে কালীধর চক্রবর্ত্তী ওরফে বিরজাকান্ত চক্রবর্ত্তী ওরফে মহারাজ (৩) খগেন্দ্র চৌধুরী ওরফে সুরেশ চক্রবর্ত্তী (৪, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী (৫) রমেশ চন্দ্র চৌধুরী ওরফে রমেশ চন্দ্র দত্ত ওরফে পরিতোষ ধৃত হয়। ষড়যন্ত্র মামলায় সাজা হয়। সাব্যস্ত হয়, বরিশাল সমিতি ঢাকা সমিতিরই অঙ্গ। এই সংঘের প্রধান আড্ডা সোনারঙ্গ জাতীয় বিদ্যালয়। শিক্ষকগণ ও ছাত্রগণ সমিতির কার্য্য করার উদ্দেশ্যেই ওখানে থাকিত। বরিশাল মামলার 'কর্ম্ম' overt acts বলিয়া নিম্নের ঘটনা বিচারে সাব্যস্ত হয়ঃ—

হলদিয়া হাট ডাকাতি—কলাগাঁও—দাদপুর—পণ্ডিতসর—গাঁওদিয়া ডাকাতি—সুকইর ডাকাতি—গোলকপুর বন্দুকচুরী—কাওয়াকুরী ডাকাতি—বিরঙ্গল ডাকাতি—পানান ডাকাতি—সারদাচক্রবর্ত্তী হত্যা—কুমিল্লা ডাকাতি—লাঙ্গলবন্দ ডাকাতি।

রতিলাল হত্যা, বরিশাল ইন্‌স্‌পেক্টর হত্যা, রাজকুমার রায় (ময়মনসিং ইন্‌স্‌পেক্টর) হত্যা, মৌলবী বাজার বোমাবিস্ফোরণ সোনারঙ্গ হত্যা রাউতভোগহত্যা প্রভৃতিও এই মামলার overt acts ইহা এপ্রুভার প্রিয়নাথ আচার্য্যের বর্ণনায় প্রকাশ পায়।

রাজাবাজার বোমার মামলা। মৌলবী বাজার বোমা বিভ্রাটের পরে সিলেটের ডেপুটি কমিশনারের পরোয়ানা বলে কলিকাতা পুলিশ রাজাবাজার আপার সারকুলার রোডের একটি বাটি খানাতল্লাস করিয়া অমৃত হাজরা ওরফে শশাঙ্ক হাজরা প্রভৃতি চার জনকে গ্রেফ্‌তার করে। পরে আরো দুই জন ধৃত হয়। সেখানে বোমা তৈরীর সাজ সরঞ্জাম পাওয়া যায়। এই বোমার ধরণ ড্যালহাউসি স্কোয়ার, মেদিনীপুর (এপ্রুভারের বাটিতে (১৯০৯) ফেলা হয়), দিল্লী (যাহা বড়লাটের উপর ফেলা হয়), মৌলবী বাজার, লাহোর (১৯১৩), ময়মনসিংহ (১৯১৩) এবং ভদ্রেশ্বরের (১৯১৩) বোমারই মতন বলিয়া বিচারকগণ সিদ্ধান্ত করেন। শশাঙ্ক ওরফে অমৃত হাজরার ঘরে এই বোমা পাওয়া যায় বলিয়া বিচারকগণ মনে করেন যে সে বিপ্লব ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অন্য আসামীদের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করা যায় না। শশাঙ্কের কঠোর শাস্তি হয়। ইহারা অনুশীলনেরই লোক বলিয়া মামলায় সাব্যস্ত হয়।

ফরিদপুর মামলা। ফরিদপুর (মাদারীপুর) ষড়যন্ত্র মামলায় পূর্ণচন্দ্র দাস প্রভৃতি অনেকে গ্রেফ্‌তার হন। কিন্তু পুলিশ শেষ পর্য্যন্ত মামলা চালায় না, ছয় মাস চালাইয়া সরকার পক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণের অভাব হেতু মামলা তুলিয়া লয়। সরকার

পক্ষের কৌঁন্সলী মিঃ এন্ গুপ্ত বলেন, সাক্ষীরা ভয়ে সাক্ষ্য দিতে চাহে না ; সুতরাং মামলা চালান অসম্ভব বলিয়া সরকার মামলা তুলিয়া লইলেন। এই সম্পর্কে সাক্ষীকে ভীতিপ্রদর্শন করার অভিযোগে বামনচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সাজা হয়।

যে কয়েকটি প্রধান প্রধান ষড়যন্ত্র মূলক মামলার বিবরণ সরকারী বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাই মাত্র এখানে দেওয়া হইল ; ইহা ছাড়া বহু মামলা হইয়াছে। কোথাও আসামীদের সাজা হইয়াছে কোথাও তাহারা খালাস হইয়াছে। দ্বিতীয় আলিপুর মামলা, শাঁখারি টোলার মামলা, কাকোরী, দেওঘর দক্ষিণেশ্বর, শোভাবাজার, সুকিয়াষ্ট্রীট বোমার কারখানা সম্পর্কিত মামলার বিবরণের কোন রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়ায় লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হইল না।

বাংলাদেশে বিপ্লব আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ আরম্ভ হয় ১৯০৬ সাল হইতে। অবশ্য বারীন্দ্র প্রভৃতির উদ্যোগে ১৯০২—০৩ সাল হইতেই বিপ্লব আন্দোলন সম্পকিত গুপ্ত সমিতির সূত্রপাত হইয়াছিল।

প্রথম প্রথম বিপ্লবীদের জঙ্গী বিভাগের (Violence) কার্য্য তেমন সাফল্য লাভ করে নাই ; সাফল্য লাভে বিপ্লবীদের মধ্যে তেমন দৃঢ় সংকল্পও যেন তখন জাগে নাই। সত্যই ১৯০৬ সালে রংপুরে বিপ্লবীরা ডাকাতি করিতে গিয়া, ঐ গ্রামে একজন দারোগা আছে, ইহা জানিয়াই চলিয়া আসে। কিন্তু ইহার পর ক্রমেই বিপ্লবীদের জঙ্গী বিভাগের কার্য্যে অধিকতর দৃঢ় সংকল্প, সাহস, কৌশল লক্ষিত হয়।

নিম্নে আমরা ১৯০৬ সাল হইতে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত সমগ্র বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবদলের অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর উল্লেখ করিতেছি।

১৯০৬ সাল। রংপুরের মহিপুর গ্রামে এবং ঢাকা জেলা শেখর-নগর গ্রামে ডাকাতির চেষ্টা হয়, কৃতকার্য্য হয় না।

১৯০৭ সাল। অক্টোবরে এবং ৬ই ডিসেম্বরে যুগান্তর দলের দ্বারা বাংলার লাটের ট্রেণ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হয়। এবং যে ট্রেণে লাটসাহেব ছিলেন নারায়ণগড়ের কাছে তাহা সত্যই বোমা বিস্ফোরণে লাইনচ্যুত হয়। অবশ্য লাটসাহেবের কিছু হয় নাই। এই ঘটনায় বাংলার পুলিশ জনকয় নির্দ্দোষী কুলিকে ধরিয়া সাজা দেয়, এবং হতভাগ্যদের দোষ না করিলেও, দোষ স্বীকার করিয়া সাজা গ্রহণে বাধ্য করে। পরে বিপ্লবীদের স্বীকারোক্তিতে সকল রহস্য ভেদ হয়।

১৯০৭ সাল। নিতাইগঞ্জে (নারায়ণগঞ্জ) একজন লোককে (কুলী) ছোরা মারিয়া টাকা ছিনাইয়া লওয়ার চেষ্টা হয়। কয়েক সহস্র টাকা লইয়া কুলি যাইতেছিল। টাকা ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া যাওয়ায় বিপ্লবীদের হাতে আসে নাই। ফরাসী চন্দননগরে গাড়ী উল্টাইবার ব্যর্থ চেষ্টা হয়। মেদিনীপুর নারায়ণগড়েও তেমান ব্যর্থ চেষ্টা হয়। ২৩এ ডিসেম্বরে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এলেনের উপর গোয়ালন্দে গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। আঘাত গুরুতর হইলেও তিনি রক্ষা পান।

১৯০৮ সাল। হাওড়া জেলার হরিনপাড়ায় (থানা শিবপুর) ডাকাতি হয়। ফরাসী চন্দননগরে তথাকার মেয়রের বাটিতে

বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। মেয়র আহত হন নাই। ৩০এ এপ্রিল বিহারের মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে মিসেস্ ও মিস্ কেনেডি নিহত হন, অপর এক ব্যক্তি আহত হয়। এই বোমা নিক্ষেপের অপরাধে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। প্রফুল্ল চাকী ধৃত হওয়ার মুখেই পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করে।

এই ১৯০৮ সালেই (২রা মে) প্রথম আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়। ১৯১০ সালে মামলা শেষ হয়। ১৯১০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী আপীলের শেষ রায় বাহির হয়। তিন জনের সাত বৎসর, এবং চার জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, চার জনের সাত বৎসর, এবং তিন জনের পাঁচ বৎসর সাজা হয়।

১৫ই মে কলিকাতা গ্রে ষ্ট্রীটে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। তাহাতে চার জন লোক জখম হয়। ঐ সালের জুন হইতে ডিসেম্বরের মধ্যে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কাঁকিনাড়া, শ্যামনগর, সোদপুর প্রভৃতি ষ্টেশনে গাড়ীতে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। মারাত্মক কিছু হয় নাই। একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক গুরুতররূপে জখম হইয়াছিলেন।

২রা জুন ঢাকা জেলার বাহ্রাতে ভীষণ ডাকাতি হয়। রাজনীতিক ডাকাতির মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম বড় ডাকাতি। এই ডাকাতিতে চার জন নিহত হয়। বহু জখম হয়। গ্রামবাসী ও পুলিশ সমবেত হইয়া বন্দুক লইয়া বিপ্লবীদের আক্রমণ করে। একজন বিপ্লবীও নিহত হয়। ২৫,৮৩৭৲ পাওয়া যায়।

১৪ই আগষ্ট ঢাকা সাটিরপাড়া নৌকা চুরি হয়। তিন জনের জেল হয়। ময়মনসিংহ বাজিতপুরে ১৫০০৲ ডাকাতি হয় এক

জনের দেড় বৎসর ও এক জনের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

১লা সেপ্টেম্বর আলিপুর জেলে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার এপ্রুভার নরেন গোঁসাই যখন সব কথা বলিয়া দিতেছিল, সেই সময়ে ষড়যন্ত্র মামলার অন্য দুই জন আসামী কানাইদত্ত ও সত্যেন্দ্র বসু তাহাকে জেল হাঁসপাতালে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করে। কানাই ও সত্যেন্দ্রের ফাঁসি হয়।

১৬ই সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার বিঘাতিতে (ভদ্রেশ্বর থানায়) ৫৩৬৲ ডাকাতি হয়। এক জনের ছয় বৎসর, দুই জনের পাঁচ বৎসর, এবং একজনের সাড়ে তিন বৎসর, সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

৩০এ অক্টোবর ফরিদপুর জেলার নরিয়া (পালং) হাট লুট হয়। ৬৭০৲ পাওয়া যায়। ক্ষতি হয় ৬,৪০০৲। দুই জন লোক খুন হয়। কেহই ধৃত হয় না।

৭ই নভেম্বর কলিকাতা ওভারটুন হলে সার এণ্ড্রু ফ্রেজারের উপর জিতেন রায় পিস্তলের গুলি ছোঁড়ে। সার এণ্ড্রু ফ্রেজার আহত হন না। জিতেনকে অকুস্থলেই ধরা হয় এবং তাহার দশ বৎসর কারাদণ্ড হয়।

৯ই নভেম্বর সারপেনটাইন লেনে সাব ইন্‌স্পেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জ্জীকে হত্যা করা হয়। কেহ ধৃত হয় না।

১৪ই নভেম্বর ঢাকার রমনাতে যুবক সুকুমার চক্রবর্ত্তীকে খুন করা হয়। ঐ নভেম্বরেই হাওড়াতে কেশবচন্দ্র দে ও ঢাকা রমনাতে অন্নদা ঘোষকে খুন করা হয়। শেষোক্ত তিনটি হত্যায় কেহ

ধৃত হয় নাই—বা কোন মামলা হয় নাই। সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ, পুলিশের বিশ্বাস যে, এই তিন জনই সমিতির বিরুদ্ধে খবর বা সাক্ষ্য দিবে এই ভয়েই তাহাদের হত্যা করা হয়।

২৯এ নভেম্বর নদীয়া জেলার রাইতা ডাকাতি হয়। কোন মামলা হয় না।

২রা ডিসেম্বর হুগলী জেলার মোরিহালে ১৩০ৎ ডাকাতি হয়। একজন জখম হয়। মামলায় এক জনের সাত বছর সাজা হয়।

এই ১৯০৮ সালের নভেম্বরেই প্রথম নয় জনকে তিন আইনে আটক করা হয়। ১১ই ডিসেম্বর ১৯০৮ সালে নূতন আইন পাশ হয় (Criminal Law Amendment Act XIV 1908)। এই আইনের বলে কতকগুলি মামলা জুরী বাদ দিয়াই তিন জন হাইকোর্টের বিচারপতি দ্বারা তৈরী স্পেশাল বেঞ্চে হইতে পারিবে নির্দ্দিষ্ট হয় এবং এই আইনের বলেই সপরিষদ বড় লাট কতগুলি সমিতিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার লাভ করেন। এই আইনের বলেই ১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে পূর্ব্ব বাংলায় ঢাকা অনুশীলন সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, ময়মনসিংহের সুহৃদ ও সাধনা সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়।

<u>১৯০৯ সাল।</u> ১লা জানুয়ারী কুমিল্লায় অস্ত্র অপহরণ করা হয়। ঢাকার নবাবেরও তিনটি রাইফেল চুরি যায়।

১০ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় পাবলিক প্রসিকিউটার আশুতোষ বিশ্বাসকে (ইঁনিই নরেন গোঁসায়ের খুনের মামলায় সরকার পক্ষে ছিলেন) হত্যা করা হয়। হত্যাকারীর ফাঁসি হয়।

১০ই ফেব্রুয়ারী এবং ৫ই এপ্রিল যথাক্রমে বেলঘরিয়া ও আগড়পাড়ায় নারিকেল খোলের বোমা বিস্ফোরণ হয়। দুই জন আহত হয়।

২৭এ ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার হরিপাল থানার মাশুপুর গ্রামে ৫০০৲ ডাকাতি হয়। দশ বার জন যুবক ডাকাতিতে ছিল। কোন মামলা হয় নাই।

২৩এ এপ্রিল ২৪ পরগণার নেত্রায় (থানা ডায়মণ্ড হারবার) ২,৪০০৲ ডাকাতি হয়। ডাকাতদের সঙ্গে বন্দুক ছিল।

৩রা জুন ফরিদপুর জেলার ফতেজংপুরে প্রিয়নাথ চাটার্জ্জী পিস্তলের গুলিতে নিহত হয়। তাহার ভ্রাতা গণেশকে হত্যা করিতে গিয়া ভুল ক্রমে তাহাকে হত্যা করা হয় বলিয়া প্রকাশ পায়। মামলায় আসামীর সাজা হয় না।

১৬ই আগষ্ট খুলনা জেলার নাংলায় ১,০৭০৲ ডাকাতি হয়। মামলায় এক জনের সাত বৎসর সাজা হয়।

১৬ই হইতে ৩০এ আগষ্ট পর্য্যন্ত নাংলা ষড়যন্ত্র মামলা হয়। ছয় জনের সাত বৎসরের দ্বীপান্তর বাস হয়। তিন জনের পাঁচ বৎসর এবং দুই জনের তিন বৎসরের সাজা হয়।

২৪এ সেপ্টেম্বর খুলনা জেলার হোগুলবুনিয়ায় ৫০৲ ডাকাতি হয়। একজন লোক আহত হয়। এই ডাকাতিতে বন্দুক ও পিস্তল ব্যবহৃত হইয়াছিল।

১১ই অক্টোবর ঢাকা রাজেন্দ্রপুরে ২৫,০০০৲ ট্রেণ ডাকাতি হয়। একজন দারোয়ান নিহত হয়, একজন আহত হয়। এই মামলায়

একজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। পাট ব্যাপারী সাহেব কোম্পানীর টাকা নারায়ণগঞ্জ হইতে দারোয়ান মারফৎ যাইতেছিল। চলতি ট্রেণে দারোয়ানদের নিহত ও আহত করিয়া ২৩,০০০৲ টাকা নেওয়া হয়। রাস্তায় অনেক টাকা পড়িয়া যায়। ১১,৮৬৪৲ টাকা রাস্তায় পাওয়া যায়।

১৬ই অক্টোবর ফরিদপুর জেলার দরিয়াপুরে ২,৬০০৲ ডাকাতি হয়। এখানে পিস্তল ব্যবহৃত হইয়াছিল।

২৮এ অক্টোবর নদীয়া জেলার হলুদবাড়ীতে ১,৪০০৲ ডাকাতি হয়। এই ডাকাতি মামলায় পাঁচ জনের আট বৎসর এক জনের সাত বৎসর, এক জনের পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড হয়।

১০ই নভেম্বর ঢাকার রাজনগরে ২৭,৮২৭৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না।

১১ই নভেম্বর ত্রিপুরা জেলার মতলব থানার মোহনপুরে ১৬,৪০০৲ ডাকাতি হয়। একজন লোক আহত হয়। কেহ ধৃত হয় না। এই পর পর দুইটি ডাকাতিই ঢাকা সমিতির সোনারঙ্গ স্কুল কেন্দ্র হইতে পরিচালিত হয় বলিয়া সিডিশন কমিটি তাঁহাদের বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

২৪এ নভেম্বর আগরতলায় রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে সন্ন্যাসীবেশে দুই জন ধৃত হইয়া মুচলেকায় আবদ্ধ হয়।

২৭এ ডিসেম্বর যশোহর বাইকারা ৮১৪৲ ডাকাতি হয়। এই খানেও পিস্তল ব্যবহৃত হইয়াছিল। কেহ ধৃত হয় নাই।

১৯১০ সাল। ২৪এ জানুয়ারী কলিকাতা হাইকোর্টে পুলিসের

ডেপুটি সুপারিণটেন্‌ডেন্ট সামশুল আলমকে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করা হয়। হত্যাকারীর ফাঁসি হয়।

মার্চ্চে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রপাত হয়। ৭ই ফেব্রুয়ারী খুলনার সোলেগাতিতে ২০০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না।

১১ই ফেব্রুয়ারী যশোহরের ধুলগ্রামে ৬,১৭৫৲ ডাকাতি হয়। কোন মামলা হয় না।

৩০এ মার্চ্চ খুলনার নন্দনপুরে ৬,৫০০৲ ডাকাতি হয়। কোন মামলা হয় না। ৫ই জুলাই যশোহরের মহিষা (থানা মহম্মদপুর) ২,২০৪৲ ডাকাতি হয়। এই ডাকাতিতে একজনের ছয় বৎসর এক জনের পাঁচ বৎসর, তিন জনের তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

২৯এ জুলাই ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রপাত হয়। ২১এ জুলাই ময়মনসিংহ জেলার গোলকপুরে বন্দুক অপহৃত হয়। ৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকা হলদিয়াহাট (থানা লোহজং) ১,৫০০৲ ডাকাতি হয়। একজন লোক নিহত হয়, এবং অনেকে আহত হয়। কেহ ধৃত হয় না।

৭ই নভেম্বর ফরিদপুর জেলার কালারগাঁয় (থানা ভেদরগঞ্জ) ১২,৬৬০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না।

৩০এ নভেম্বর বাখরগঞ্জ জেলার দাদপুর (থানা মেহেদীগঞ্জ) ৪৯,৩৬৮৲ ডাকাতি হয়। পাঁচ জন লোক আহত হয়। কোন মামলা হয় না।

শেষোক্ত তিনটি ডাকাতি ঢাকা সমিতির সোনারঙ্গ স্কুল কেন্দ্র হইতে পরিচালিত এবং সংগৃহীত অর্থের কতকটা অংশ ঢাকা

ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনে ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়া সিডিশন কমিটির রিপোর্টে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

১৯১১ সাল। ২১এ জানুয়ারী ঢাকা সোনারঙ্গে পিয়নকে মারধর করার জন্য সোনারঙ্গ স্কুলের ছয় জনের সাজা হয়। ৫ই ফেব্রুয়ারী ফরিদপুর জেলার পণ্ডিতচরে ৫,৫০০৲ ডাকাতি হয়। মামলা হয় না। কেহ ধৃত হয় নাই।

২০এ ফেব্রুয়ারী ঢাকা গাঁওদিয়া (থানা লোহজং) ৭,৪৫৭৲ ডাকাতি হয়। মামলা হয় না। কেহ ধৃত হয় নাই।

৩১এ মার্চ্চ ময়মনসিংহ সুয়াকৈর ১,২০০৲ ডাকাতি হয়। একজন লোক আহত হয়।

১০ই এপ্রিল ঢাকা রাউৎভোগে মনোমোহন দে নিহত হয়। কেহ ধৃত হয় না। মনোমোহন ঢাকা মামলায় ও মুন্সীগঞ্জ বোমার মামলায় সাক্ষ্য দেয়। ২২এ এপ্রিল বাখরগঞ্জের লক্ষণকাটি ১০,২০০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না। ৩০এ এপ্রিল ময়মনসিংহ জেলার চরশসায় ২,১৫০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না। ত্রিপুরা জেলার বরকাণ্ডায় ২৬০৲ ডাকাতি। কেহ ধৃত হয় না।

১৯এ জুন ময়মনসিংহ সহরে পুলিশ সবইন্‌স্পেক্টর রাজকুমার গুলিতে নিহত হয়।

১১ই জুলাই ঢাকা সোনারঙ্গে তিন জন লোককে হত্যা করা হয়। কেহ ধৃত হয় না। ২৭এ জুলাই ময়মনসিংহ সারাচর ডাকাতি হয়। টাকা পায় না। একজন যুবকের পাঁচ বৎসরের সাজা হয়।

৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকা সিঙ্গইর বাজার লুট হয়। ৮,১৭০্ পাওয়া যায়। কেহ ধৃত হয় না।

৩রা অক্টোবর কুলিয়াচর বাজারে ৩,১২৫্ ডাকতি হয়। একজন লোক আহত হয়।

৬ই নভেম্বর রংপুরের বালিয়া গ্রামে ১,২১৮্ ডাকাতি হয়।

১১ই ডিসেম্বর বরিশালে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর মনমোহন ঘোষকে 'Royal Proclamation'এর দিনেই হত্যা করা হয়। ইন্‌স্পেক্টর ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় একজন সাক্ষী ছিলেন।

৩১এ ডিসেম্বর নোয়াখালির চাউল পলিতে ১,৯৭৭্ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না।

এই বৎসর যদিও অধিকাংশ ঘটনা পূর্ব্ববঙ্গে ঘটে, কিন্তু দুটি উল্লেখ যোগ্য ঘটনা কলিকাতার রাস্তায় অনুষ্ঠিত হয়।

গোয়েন্দা বিভাগের হেড কনষ্টেবল শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে ২১এ ফেব্রুয়ারী হত্যা করা হয়। এই ঘটনার একপক্ষ মধ্যে ২রা মার্চ্চ সন্ধ্যার সময় ১৬ বছরের একটি বালক কর্ত্তৃক মিঃ কাউলি নামক একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোকের মোটর গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বোমাটি ফাটে না। কিন্তু নিক্ষেপকারী তখনই ধৃত হয়। পরে জানা যায় যে বোমাটি গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্ম্মচারী ডেন্‌হ্যাম সাহেবের উদ্দেশ্যেই নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

<u>১৯১২ সাল</u>। ২৩এ জানুয়ারী ঢাকা বাইগুণ টেওয়ারী ৩,৪৭০্ ডাকাতি হয়।

২১এ ফেব্রুয়ারী ঢাকা আইনপুর (ঘিয়র থানা) ৭,৫৯৩৲ ডাকাতি হয়।

কোলা ডাকাতিও এই সালেই অনুষ্ঠিত হয়।

১৭ই এপ্রিল বাখরগঞ্জের কুসঙ্গল ডাকাতি হয়। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় প্রকাশ এই ডাকাতির উদ্দেশ্য ছিল একটি সরকারী বন্দুক, তাহা লভ্য হইয়াছিল। ১৯এ কাকুরিয়া ডাকাতি হয়।

২৩এ মে বরিশাল জেলায় বিরঙ্গল ৮,০৮০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধরা পড়ে না।

জুন মাসে ফেণীতে সারদা চক্রবর্ত্তীকে হত্যা করা হয়। সমিতির বিরুদ্ধে সে অপরাধ করিয়াছিল বলিয়াই নাকি সাজা হিসাবে (disciplinary) এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়।

১১ই জুলাই ঢাকায় পানামে ২০,০০০৲ ডাকাতি হয়। একজন লোক গুলিতে আহত হয়। গ্রামবাসীও বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল।

১৫ই জুলাই বাখরগঞ্জ জেলার প্রতাপপুরে ৭.৫৯৫৲ ডাকাতি হয়। দুইজন লোক আহত হয়।

২৪এ সেপ্টেম্বর ঢাকা গোয়ালনগরে হেডকনষ্টেবল রতিলাল রায়কে হত্যা করা হয়। কাহাকেও গ্রেফ্তার করা যায় নাই।

২৭এ অক্টোবর কুমিল্লায় ডাকাতি করার উদ্যোগ করার অপরাধে দশজনের সাত বৎসর করিয়া সাজা হয়।

১৪ই নভেম্বর ঢাকা লাঙ্গলবন্দে ১৬,০০০৲ ডাকাতি হয়। প্রায় দুই শত গ্রামবাসী ডাকাতদের বাধা দিতে সমবেত হইলে তাহারা (বিপ্লবীরা) চার জনে গুলি ছুঁড়িয়া তাহাদের দূরে রাখে।

এই ডাকাতির 'মাল' পাওয়া যায় বলিয়া গিরীন্দ্রমোহন দাসের পাঁচ বৎসরের সাজা হয়। সে একরার করিয়াছিল।

২৮এ নভেম্বর ঢাকা ওয়ারীতে গিরীন্দ্র দাসের বাক্সে অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া যায়। কতকগুলি বন্দুক, রিভলভার, কার্টিজ, গুলি বারুদ ইত্যাদি অস্ত্র-শস্ত্র এবং লাঙ্গলবন্দ ডাকাতির গহনা পত্র পাওয়া যায়। গিরীন্দ্রের পিতা ছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট্। পুত্র বিপ্লবীদলে মিশিয়াছে সন্দেহে তিনি পুত্রের বাক্স খোলেন—পুলিশকে ডাকিয়া পুত্রকে এবং অস্ত্র-শস্ত্র ধরাইয়া দেন। গিরীন্দ্র অবশেষে একরার করে। অস্ত্র আইনে তাহার আঠার মাস সাজা হয়। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায়ও সে গ্রেপ্তার হয়।

১৩ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর বোমার মামলার সাক্ষী আবদার রহিমকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাহার গৃহে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বোমা বিস্ফোরিত হয়। কিন্তু আবদার রহিম সে ঘরে সে রাত্রে ছিল না, তাহার কন্যা আশ্চর্য্য রকমে বাঁচিয়া যায়।

১৯১৩ সাল। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা ভরাকরে (থানা টঙ্গীবাড়ী) ৩,৪০০৲ ডাকাতি হয়। একজনের দুই বৎসরের সাজা হয়।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহ ধুলদিয়ায় (থানা কৈঠাদি) ৯,০৪৬৲ ডাকাতি হয়। একজন লোক নিহত হয়—তিনজন আহত হয়। পিস্তলের সঙ্গে বোমাও ব্যবহৃত হইয়াছিল।

২৭এ মার্চ্চ সিলেট মৌলবীবাজারে গর্ডন সাহেবকে বোমা মারিয়া হত্যা করার উদ্দেশ্যে দুইজন বিপ্লবী সমবেত হয়। হঠাৎ বোমা ফাটিয়া একজন বিপ্লবী ঐ বাগানেই মারা যায়।

৩রা এপ্রিল গোপালপুরে ৬,০৪৫৲ ডাকাতি হয়। একজন লোক আহত হয়।

২৯এ মে ফরিদপুর কাওয়াকুরীতে (মাদারীপুর থানায়) ৫,১৩০৲ ডাকাতি হয়। কেহই ধরা পড়ে না।

২৮এ জুন ঢাকা কামারাঙ্গীচরে (রূপগঞ্জ থানা) ২,২৬০৲ ডাকাতি হয়, কেহ ধরা পড়ে না!

১৬ই আগষ্ট ময়মনসিংহ কেদারপুরে ১৯,৮০০৲ ডাকাতি হয়। একজন ভৃত্য হত হয় এবং পাঁচ জন লোক আহত হয়। কেহই ধরা পড়ে না।

২৯এ সেপ্টেম্বর কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে হেডকনষ্টেবল হরিপদ দেবকে গুলির আঘাতে নিহত করা হয়।

৩০এ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহে পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরীকে বোমা নিক্ষেপে হত্যা করা হয়।

৭ই নভেম্বর ২৪ পরগণা ছত্রবাড়িয়ায় ৮৬৮৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধরা পড়ে না।

২৪এ নভেম্বর ময়মনসিংহ সারাচর ৪,৩৯০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধরা পড়ে না।

৩০এ ডিসেম্বর ত্রিপুরা জেলার খারামপুরে (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) ৬,০০০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধরা পড়ে না।

১৯এ ডিসেম্বর কুমিল্লা পশ্চিমসিংহে ৩,১০০৲ ডাকাতি হয়। একজন লোক আহত হয়। কেহ ধরা পড়ে না।

৩০এ ডিসেম্বর ভদ্রেশ্বরে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

নভেম্বর মাসে কলিকাতা রাজাবাজারে বোমা নির্ম্মানের সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হয়।

এই সালের মে মাসে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রপাত হয়। এই মে মাসেই লাহোরের রাস্তায় একটি বোমা বিস্ফোরণ হয়। ফলে একজন চাপরাশী নিহত হয়। একজন বাঙালী ইহা স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া সিডিশন কমিটি লিপিবদ্ধ করিয়াছে।

১৯১৪ সাল। এই সালের ঘটনাবলী গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ, হুগলি ও ২৪ পরগণা জেলা এবং খাস কলিকাতায়। আমরাও সেই বিভাগ অনুযায়ীই ঘটনার হিসাব দিতেছি।

জানুয়ারী মাসে ময়মনসিংহ চারলিয়ার চরে ডাকাতির চেষ্টা হয়।

৮ই মে ত্রিপুরা জেলার গোসাইপুরে (নবীনগর থানা) ৫,৫০০৲ ডাকাতি হয়। একজন গ্রামবাসী আহত হয়।

১৯এ মে চট্টগ্রাম সহরে সত্যেন্দ্র সেনকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। নিহত ব্যক্তি পুলিসে খবর যোগাইত বলিয়া বিপ্লবীরা সন্দেহ করিত। কেহ ধৃত হয় নাই।

১৯এ জুলাই ঢাকা সহরে রামদাসকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। রামদাস ডেপুটি সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নির্দ্দেশ অনুযায়ী বিপ্লবীদলের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছিল। কেহ ধৃত হয় নাই।

২৮এ আগষ্ট ময়মনসিংহ বিতাই (নেত্রকোণা থানা) ১৭,৭০০৲ ডাকাতি হয়। এক ব্যক্তি নিহত হয়, একজন আহত হয়। কেহই ধৃত হয় না।

১৩ই নভেম্বর ময়মনসিংহ কৈঠিয়াদি থানার উকরাশালে ৪,৮০০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না।

১৯এ নভেম্বর মাদারীপুরে বোমা বিস্ফোরণ হয়। ১৮ই ডিসেম্বর ত্রিপুরা জেলার রাধানগরে ৪,৯০০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না।

২৩এ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ দারিকপুরে (ফুলপুর থানা) ২৩,০০০৲ ডাকাতি হয়। একজন আহত হয়। কেহই ধৃত হয় না।

২৫এ ডিসেম্বর ত্রিপুরা জেলার মোচ্‌নায় ডাকাতির চেষ্টা করা হয়।

ফেব্রুয়ারী মাসে হুগলী বৈদ্যবাটী ডাকাতির চেষ্টা হয়। আগষ্টে বরানগরে ডাকাতির চেষ্টা করা হয়। ৭ই নভেম্বর ২৪ পরগণা মামুরাবাদে ১,৭০০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না। এই ডাকাতিতে মসার পিস্তল ব্যবহৃত হইয়াছিল।

এই মাসেই আলমনগরে ডাকাতির চেষ্টা করা হয়।

ডিসেম্বরে এড়িয়াদহে (২৪ পরগণা) ৫১০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না।

১৯১৪ সালেরই ২৬এ আগষ্ট কলিকাতার বিপ্লবীদলের চেষ্টায় বন্দুক ব্যবসায়ী রডা এণ্ড কোম্পানীর পঞ্চাশটি মসার

পিস্তল (পিস্তলগুলি এমন নূতন ভাবে তৈরী যে তাহা রাইফেলের মতও ব্যবহৃত হইতে পারিত) এবং ৪৬,০০০ রাউণ্ড কার্টিজ, কোম্পানীরই একজন কেরাণীর দ্বারা অপহৃত হয়। সিডিশন কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে, যে, পিস্তলগুলি অপহৃত হওয়ার অব্যবহিত পরেই বাংলার নয়টি বিভিন্ন দলে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়। কমিটি ইহাও বলেন আগষ্টের পরে বাংলার অধিকাংশ খুন ও ডাকাতিতেই এই মসার পিস্তল ব্যবহৃত হইয়াছে। বাংলার বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন দলের পরবর্ত্তী ঘটনাবলীতে অস্ত্র ব্যবহারের ও অস্ত্র প্রাপ্তির যে সব নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে বাংলার প্রত্যেক দলের হাতেই এই মসার গিয়াছে অথবা আদান প্রদান হইয়াছে। পঞ্চাশটির মধ্যে একত্রিশটি পিস্তল বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সময়ে পুলিশ হস্তগত করে।

এই বৎসরের প্রথমভাগে গোয়েন্দা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার নৃপেন্দ্র ঘোষকে চিৎপুর রোডে হত্যা করা হয়। ট্রাম হইতে জনাকীর্ণ রাস্তায় নামিবার সময় তাঁহার উপর গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। আততায়ী বলিয়া নির্ম্মলকান্ত রায়কে ধরা হয়। নির্ম্মলকান্ত রায়কে যাহারা ধরিয়াছিল তাহাদের বাংলার লাট ধন্যবাদ দেন ও পুরস্কৃত করেন। কিন্তু নির্ম্মলকান্ত খালাস পায়। এ মামলায় আসামীর পক্ষে মিঃ নর্টন, মিঃ সি. আর. দাস, মিঃ জে. এন. রায় প্রভৃতি দাঁড়ান। জুরীরা নির্ম্মলকে নির্দ্দোষ বলেন—জজ একমত না হইয়া পুনরায় বিচারের আদেশ দেন। নূতন জুরী বসে। তাঁহারাও বলেন, নির্দ্দোষ ; জজ তবুও একমত হন না। তিনি

পুনরায় জুরী ভাঙ্গিয়া দেন—তখন সরকার পক্ষ মামলা তুলিয়া লন।

২৫এ নভেম্বর কলিকাতা মুসলমানপাড়ায় ডেপুটি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাটিতে ও বাটির বাহিরে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বসন্ত বাবু দৌড়াইয়া রক্ষা পান—একজন হেড কন্‌ষ্টেবল নিহত হয়, দুইজন কন্‌ষ্টেবল ও বসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের একজন আত্মীয় আহত হয়। এই বোমার মামলায় নগেন্দ্রনাথ সেন ধৃত হইয়া হাইকোর্টের বিচারে মুক্ত হয়।

১২ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা গার্ডেন রীচে ১৮,০০০৲ ডাকাতি হয়। একজনের সাত বৎসরের কারাদণ্ড হয়।

রাজনীতিক ডাকাতিতে ইহাই প্রথম ট্যাক্সি ডাকাতি। কলিকাতা চার্টার্ড ব্যাঙ্ক হইতে বার্ড কোম্পানীর দারোয়ান বিশ হাজার টাকা নিয়া যাইতেছিল, বিপ্লবীরা ১৮,০০০৲ টাকা পায়। সিডিশন কমিটির মতে এই ডাকাতি যতীন্দ্র মুখার্জ্জী ও বিপিন গাঙ্গুলীর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইয়াছে। ইহারই এক সপ্তাহ পরে কলিকাতা বেলিয়াঘাটার চাউলের ব্যবসায়ীর ক্যাসিয়ারকে তহবিলের ২০,০০০৲ টাকা দিতে বাধ্য করা হয়। এই ডাকাতিতে যে ট্যাক্সি ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহার ড্রাইভারকে হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ রাস্তায় পরিত্যক্ত হয়। ইহাও যতীন মুখার্জ্জীর তত্ত্বাবধানে হইয়াছে বলিয়া সিডিশন কমিটি লিপিবদ্ধ করিয়াছে।

২৪এ ফেব্রুয়ারী কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটে নিরোদ হালদারকে গুলিতে নিহত করা হয়। নিরোদ দৈবাৎ বিখ্যাত

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী যে ঘরে ছিল সেখানে উপস্থিত হয় এবং যতীন্দ্রনাথকে চিনিতে পারিয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকে।

২৮এ ফেব্রুয়ারী কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে ইন্স্পেক্টর সুরেশ মুখার্জ্জী জনৈক ফেরারী বিপ্লবীকে দেখিয়া তাহাকে গ্রেফ্তার করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন সময় উক্ত ফেরারী ও তাহার চার জন সঙ্গী তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করে, আর্দ্দালী আহত হয়।

এই বৎসরের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বালেশ্বর ইউনিভারস্যাল এম্পোরিয়ামে তল্লাস করা হয়, এবং পরে ময়ূরভঞ্জ জঙ্গলে যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন প্রভৃতি পাঁচ জন বাঙালীর সঙ্গে বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেটের খণ্ড যুদ্ধ হয়। যথাস্থানে তাহা বলা হইয়াছে। চিত্তপ্রিয় নিহত হয়, যতীন্দ্রনাথ ও অপর সকলেই গুরুতর আহত হয়। যতীন্দ্রনাথ এই আঘাতের ফলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিপ্লবীদের গুলিতে গ্রামবাসী একজন নিহত হয় এবং পুলিশ পক্ষের অনেকে আহত হয়।

২১এ অক্টোবর মসজিদবাড়ীতে পুলিশ সাব ইন্স্পেক্টর গিরীন্দ্র ব্যানার্জ্জীকে নিহত করা হয়, এবং সাব ইন্স্পেক্টর উপেন্দ্র চ্যাটার্জ্জী আহত হয়। ইন্স্পেক্টর সতীশ ব্যানার্জ্জী রক্ষা পায়।

১৭ই নভেম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ৮০০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না।

৩০এ নভেম্বর কলিকাতা সারপেনটাইন লেনে একজন কন্ষ্টেবল এবং স্থানীয় একজন বালক পিস্তলের গুলিতে নিহত হয়। কেহই ধৃত হয় নাই।

২রা ডিসেম্বর কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে ২৫,০০০৲ ডাকাতি হয়। একজনের তের বৎসর, একজনের দুই বৎসর ও একজনের এক বৎসর সাজা হয়।

১৪ই ডিসেম্বর শেঠবাগানে ৬,১০০৲ ডাকাতি হয়।

২৭এ ডিসেম্বর চাউলপট্টি রোডে এক ব্যক্তিকে আহত করিয়া ৭৫০৲ টাকা সম্বলিত একটি হাত ব্যাগ ছিনাইয়া লওয়া হয়।

নিম্নের ঘটনাগুলি কলিকাতা হইতে ব্যবস্থা হইয়া কলিকাতার আশে পাশে ঘটে।

৬ই এপ্রিল এড়িয়াদহে ৫০০৲ ডাকাতি হয়। ৩০এ এপ্রিল নদীয়ার প্রাগপুরে ২,৭০০৲ ডাকাতি হয়। রাস্তা ভুল হওয়ায় অনেক পথ নৌকায় আসিতে হয়। একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর বহু লোকজন লইয়া তাহাদের আক্রমণ করে। এই গোলমালে বিপ্লবীরা একজন নিজের লোককেই ভুলক্রমে গুলি করিয়া বসে। আত্মরক্ষার আর উপায় না থাকায়, সঙ্গীর মৃতদেহ নদীতে নিক্ষেপ করিয়া নৌকাখানা ডুবাইয়া তাহারা চলিয়া যায়। তিন জনের সতের বৎসর এবং এক জনের আট বৎসর দ্বীপান্তর হয়।

২রা আগষ্ট আগড়পাড়ার জনৈক বিল কালেক্টরকে আক্রমণ করা হইলে তাহার চীৎকারে একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়। ফলে ঘটনাস্থলের কিছু দূরে বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা বিপিন গাঙ্গুলী পিস্তল সমেত ধৃত হন। তাঁহার পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড হয়।

২৫এ আগষ্ট মুরারী মিত্রকে তাহার বাড়ীতে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করা হয়। আগড়পাড়ার ঘটনার তদন্তে মুরারী মিত্র ও

তাহার পুত্র প্রভাস পুলিসকে সাহায্য করিতেছিল বলিয়া সিডিশন কমিটিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৩০এ সেপ্টেম্বর নদীয়া জেলার শিবপুরে ২০,৭০০৲ ডাকাতি হয়। একজন কনষ্টেবল এবং একজন গ্রামবাসী হত হয়, এবং অপর এগার জন আহত হয়। নয় জন বিপ্লবী ধৃত হয়। আট জনের যাবজ্জীবন ও এক জনের দশ বৎসরের দ্বীপান্তর হয়। সিডিশন কমিটির মতে এই ডাকাতি বরিশাল হইতে ১৯১২ সালে কলিকাতায় আগত দল দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়; এবং এই ডাকাতির পরে তাহারা একেবারে কাবু হইয়া পড়ে।

এই সালেই নদীমাতৃক পূর্ব্ববঙ্গেও প্রাগপুর এবং শিবপুরের মতই নৌকাযোগে ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়।

২২এ জানুয়ারী ত্রিপুরা জেলায় বাঘমারীতে ৪,১৭০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না।

৩রা মার্চ্চ কুমিল্লা সহরে জেলা স্কুলের হেড্‌মাষ্টারকে হত্যা করা হয়। হেডমাষ্টারের ভৃত্য গুরুতর আহত হয়, এবং পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একজন মুসলমান হত্যাকারীদের অনুসরণ করিতেছিল তাহাকেও গুলি করা হয়।

১১ই মার্চ্চ ত্রিপুরা জেলার বলদায় ৪,০০০৲ ডাকাতি হয়। দুই জন আহত হয়।

২৫এ মে ত্রিপুরা জেলার আউরাইলে ৪,২৫০৲ ডাকাতি হয়।

৫ই জুন বাখরগঞ্জ জেলায় গাজীপুরে ১৫,০০০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না।

১৪ই আগষ্ট ত্রিপুরা হরিপুরে ১৮,০০০৲ ডাকাতি হয়। একজন ব্যক্তি গুলিতে নিহত হয়। তিন জন আহত হয়।

৭ই সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ চন্দ্রকোনায় ২১,০০০৲ ডাকাতি হয়। একজন গ্রামবাসী নিহত হয়। ছয় জন আহত হয়।

২৬এ নভেম্বর ময়মনসিংহ রসুলপুরে ৪৬০৲ ডাকাতি হয়। একজন লোক গুলিতে নিহত হয়।

১৯এ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ সশেরদীঘিতে (বাজিৎপুর) ধীরেন্দ্র বিশ্বাসকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। ধীরেন্দ্র পুলিশের ইন্‌ফরমারের কার্য্য করিতেছিল বলিয়া প্রকাশ পায়।

২২এ ডিসেম্বর ময়মনসিংহে কালিয়া চাপড়া (কৈঠাদি) ডাকাতি হয়।

২৯এ ডিসেম্বর ত্রিপুরা করকলায় (চান্দিনা থানা) ১৫,০০০৲ ডাকাতি হয়। দুই ব্যক্তি গুলিতে নিহত হয়।

এই বৎসরেই ১৮ই নভেম্বর খবর পাইয়া ঢাকা দলের ঐ সময়ের নেতৃস্থানীয় অনকূল চক্রবর্ত্তী ও অপর কয়েক জনকে পুলিশ গ্রেফ্‌তার করে। ঐ সঙ্গেই কতকগুলি অস্ত্র-শস্ত্র পুলিশের হস্তগত হয়।

এই সালেরই ১৯এ অক্টোবর ময়মনসিংহ সহরে পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট যতীন্দ্রমোহন ঘোষকে হত্যা করা হয়। তাঁহার শিশুপুত্রও (ক্রোড়ে ছিল) নিহত হয়।

এই সালেই উত্তরবঙ্গে ২৩এ জানুয়ারী রংপুর কুরুল গ্রামে ৫০,০০০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধরা পড়ে না।

১৬ই ফেব্রুয়ারী রায় সাহেব নন্দকুমার বসুকে (এডিশন্যাল পুলিশ সাহেব) হত্যা করার উদ্দেশ্যে চার জন বিপ্লবী তাঁহার বাড়ী যায় এবং তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া গুলি ছোঁড়ে; তিনি অনাহত রক্ষা পান তাঁহার আর্দ্দালী বাধা দিতে গিয়া গুরুতর আঘাতে নিহত হয়।

২০এ ফেব্রুয়ারী রাজসাহী জেলার ধরাইলএ (নাটোর) ৩০।৪০ জন যুবক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ২৫,০৮০৲ ডাকাতি করে। বাড়ীর দারোয়ান গুলিতে নিহত হয়। অপর দুইজনও আহত হয়। এই ডাকাতিও কলিকাতা হইতে ঢাকা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছে বলিয়া সিডিশন কমিটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

১৯১৫ সালেই ভারতে সশস্ত্র বিদ্রোহের চেষ্টা হয়। ম্যাভেরিক জাহাজে জার্ম্মেণীর অস্ত্র-শস্ত্র জুনের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িবার কথা। সে অনুযায়ী যতীন মুখার্জ্জী, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অতুলঘোষ প্রভৃতি ঐ অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণের ব্যবস্থা করিতেছিলেন।

সিডিশন কমিটি লিখিতেছেন যে, বাংলার বিপ্লবীরা বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে যাহাতে বাংলার বাহির হইতে সৈন্য আসিতে না পারে তজ্জন্য স্থির করিয়াছিল যে, যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বর হইতে মাদ্রাজের রেল লাইন আটকাইবেন, ভোলানাথ চ্যাটার্জ্জীকে চক্রধরপুরে পাঠান হইয়াছিল বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ভার নিতে, সতীশ চক্রবর্ত্তীকে অজয়ে পাঠাইয়া ই-আই-আর রেলের ব্রিজ উড়াইবার কথা হয়, কলিকাতার দল নরেন ভট্টাচার্য্য ও

বিপিন গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে কলিকাতার ও কলিকাতার আশে পাশের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র লুটিয়া লইয়া পরে ফোর্ট উইলিয়ম দখল করিবে। এবং স্থির হয় যে সব জার্ম্মাণ অফিসার ম্যাভেরিক জাহাজে আসিবে তাহারা পূর্ব্ববঙ্গে থাকিবে, এবং সেইখানে সৈন্যদল গঠন করিবে ও শিক্ষা দিবে।

ম্যাভেরিক জাহাজ রায়মঙ্গলে আসিলে স্থানীয় জনৈক জমীদারের লোকজনের সাহায্যে যাদুগোপাল মুখার্জ্জী তাহা গ্রহণ করিবেন। আশা করা গিয়াছিল যে, এই ভাবে যে জার্ম্মাণ অস্ত্র-শস্ত্র আসিবে তাহা ১লা জুলাই সর্ব্বত্র বিতরিত হইবে।

এই জুলাই মাসেই গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণ অস্ত্র আমদানীর খবর পান।

৭ই আগষ্ট কলিকাতায় হ্যারি এণ্ড সনস্ তল্লাস করিয়া পুলিশ জন কয়েক গ্রেফ্‌তার করে। ম্যাভেরিক জাহাজ আর আসে না।

এদিকে ১৯১৫ সালের প্রথম ভাগ হইতেই বাঙালী বিপ্লববাদীরা সৈন্যদলে কাজ করিতেছিল; সমগ্র উত্তর ভারতের সৈন্য বিগড়ান কাজে তাহারা আত্মনিয়োগ করে এবং বিখ্যাত 'গদর' দলের বিপ্লবকামীদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে। এই উদ্দেশ্যে রাস-বিহারীর নেতৃত্বে, শচীন্দ্র, নলিনী, পিংলে এবং আরও অনেকে কাশী, দিল্লী, মিরাট, জব্বলপুর, লাহোর প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করিতে থাকে। প্রিয়নাথ, ভূপতি বেনারস কেল্লার সৈন্যদল বিগড়াইবার কার্য্যে নিযুক্ত হয়, নলিনী বাগচী (এই নলিনীই ঢাকা, কলতাবাজারে ১৯১৮ সালে পুলিশের সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধে

নিহত হয়) জব্বলপুরে (মধ্য প্রদেশে) সৈন্য বিগড়াইবার কার্য্যে নিযুক্ত হয়।

২১এ ফেব্রুয়ারী সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণার দিন নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু লাহোর হইতে তারিখ বদলাইবার সংবাদ আসে। এই সম্ভাবিত বিদ্রোহ ঘোষণার সংবাদ পূর্ব্ববঙ্গের সমিতিগুলিতেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এবং তাহারা উত্থানের জন্য সজ্জিত ছিল। ২৩এ মার্চ্চ মীরাটের কেল্লার মধ্যে পিংলে কতগুলি বোমা সমেত ধৃত হয়।

এই সালের প্রথম ভাগে ১৭ই জানুয়ারী হাওড়াতে ৬,০০০৲ ডাকাতি হয়।

৩রা মার্চ্চ হাওড়া দফরপুরে ২,০০০৲ ডাকাতি হয়। বলা বাহুল্য সর্ব্বত্রই আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩রা মার্চ্চই বরানগর দল ও বরিশাল দলের অনেকে ধৃত হয়।

এই সালেই ২৬এ জুন কলিকাতা গোপীরায় লেনে ১১,৫০০৲ ডাকাতি করিয়া লওয়া হয়। মালিককে একখানা বাংলায় পত্র লিখিয়া ধন্যবাদ দেওয়া হয়, এবং তাহার টাকা সুদ সমেত ফেরত দেওয়া হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। চিঠিতে তারিখ ছিল ১৪ই আষাঢ় ১৩২২ (২৮এ জুন)। পত্রের নীচে সহি থাকে—

J. Balwant,

Finance Secretary to the Bengal Branch of Independent Kingdom of United India.

৪ঠা আগষ্ট সালকিয়া ডোমপাড়াতে অতুল ঘোষ প্রভৃতি আত্মগোপন করিয়া আছে, এই সংবাদ পাইয়া পুলিশ বাড়ী ঘেরাও

করিয়া তল্লাস করিতে যায়। একজন ফেরারী ধৃত হয়। অন্য একজনকেও গ্রেফ্‌তার করা হয়। সে হেড্‌ কন্‌ষ্টেবলকে পিস্তল দিয়া গুলি করিয়া পলাইতেছিল।

এই ঘটনারই দিন কয় পরে রেল গাড়ীতে এক ট্রাঙ্কে একজনের মৃত দেহ বিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই মৃত ব্যক্তি, অতুল ঘোষের আত্মীয়। সে পুলিশে খবর দিত বলিয়া তাহাকে সন্দেহ করা হইত—সিডিশন কমিটির ইহা অভিমত।

১৯১৬ সাল। ১৬ই জানুয়ারী প্রাতে মেডিকাল কলেজের সম্মুখে সাব ইন্‌স্পেক্টর মধুসূদন ভট্টাচার্য্যকে গুলিতে হত্যা করা হয়। এই সম্পর্কে পরে পাঁচ জনকে ধৃত করা হয়। তন্মধ্যে একজন, পিস্তল সমেত ধৃত, বরিশাল দলের নেতা বলিয়া সিডিশন কমিটিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এই বৎসরের ৩০এ জুন পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বসন্ত চট্টোপাধ্যায়কে ভবানীপুর প্রেসিডেন্সি হাঁসপাতালের সন্নিকটে দিনের বেলায় বহু জনাকীর্ণ স্থানে তাহার আর্দ্দালী হেড কন্‌ষ্টেবলসহ হত্যা করিয়া গুলি ছুঁড়িয়া সকলেই পলাইয়া যায়। সিডিশন কমিটির মতে এই হত্যাকাণ্ড ঢাকা দলের অনুষ্ঠিত।

এই সালেই (১৯১৬) পূর্ব্ববঙ্গে নিম্নলিখিত ঘটনা ঘটে :—

১৫ই জানুয়ারী ময়মনসিংহ সুলতানপুর ডাকাতিতে একজন লোক নিহত হয়।

১৯এ জানুয়ারী বাজিতপুরে শশী চক্রবর্ত্তীকে হত্যা করা হয়।

৬ই মার্চ্চ ত্রিপুরা জেলার গন্দোরায় (মুরাদনগর) ১৪,৬১০

ডাকাতি হয়। একজন জখম হয়। একজনের অস্ত্র আইনে ও টেলিগ্রাফ তার কাটার জন্য চার বৎসর সাজা হয়।

৩০এ এপ্রিল ত্রিপুরা নাটঘরে ১৭,৫০০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না।

৯ই জুন ফরিদপুর ধানকাটিতে ৪৩,০০০৲ (হুণ্ডি) ডাকাতি হয়। এই টাকার অধিকাংশই কোন কাজে আসে না। কেহ ধৃত হয় না।

২রা সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা জেলার সাহাপাড়ুয়ায় ৩,৩৭০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না।

১১ই সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা জেলায় ললীতেশ্বরে ৫৩০৲ ডাকাতি হয়। এখানে বিপ্লবী ডাকাতদের সঙ্গে গ্রামবাসীর ভীষণ লড়াই হয়। ফলে পাঁচ জন গ্রামবাসী নিহত হয়, পাঁচ জন আহত হয়। এবং একজন বিপ্লবী নিহত হয়। সিডিশন কমিটির মতে নিহত বিপ্লবী এই সালেরই জুলাই মাসে অন্তরীণ আটক হইতে পলায়িত প্রবোধ ভট্টাচার্য্য।

সেপ্টেম্বরে ফরিদপুর পালং থানার জাজ্ঞা ডাকাতির আয়োজন করা হয়। এই দলই পরে ১৭ই অক্টোবর ময়মনসিংহ সাহিলদেও ৮০,০০০৲ ডাকাতি করে। বাড়ীর মালিক মুসলমান গুলির আঘাতে নিহত হয় এবং অপর ছয়জন আহত হয়।

৩০এ সেপ্টেম্বর ঢাকা রামদিনালীতে (ঘিয়র থানা) ৬৫৫৲ ডাকাতি হয়। সাতজন স্কুলের ছাত্র (ঈশান স্কুল ফরিদপুর) ধৃত হয় ও সাত বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

বৎসরের শেষভাগে ময়মনসিংহ ধরাইলে ডাকাতি হয়। বাড়ীর মালিকের পুত্র নিহত হয়। টাকা বেশী পাওয়া যায় না।

২৭এ ফেব্রুয়ারী পাবনা জেলার কাদিমপুরে ডাকাতি হয়। টাকার কথা উল্লেখ নাই।

এই সালে (১৯১৬) উল্লিখিত ঘটনা ব্যতীত দুইটি ইন্‌ফরমার নিহত হয়, একজন স্কুলের হেড্‌মাষ্টার, বিপ্লবদলের বিঘ্নকারী বলিয়া নিহত হয়, ঢাকাতে দুইজন কন্‌ষ্টেবল নিহত হয়। তাহারা ফেরারীদের খোঁজে ছিল।

১৯১৭ সাল। ৫ই জানুয়ারী গরাণহাটায় জ্ঞান ভৌমিককে হত্যার চেষ্টা হয়। জ্ঞান বিপ্লবী দলে ছিল, কিন্তু সে পুলিশে সংবাদ দেয় বলিয়া সন্দেহ হয়।

এই জানুয়ারীতেই সিরাজগঞ্জে রেবতী নাগকে খুন করা হয়।

২৪এ ফেব্রুয়ারী ঢাকা পাইকারচরে ১,২০০৲ ডাকাতি হয়। কেহ ধৃত হয় না। ১৫ই এপ্রিল রাজসাহী জামনগরে ২৬,৫৬৭৲ ডাকাতি হয়। এই ডাকাতির তিন মাস পর ঢাকা ষ্টেশনে দুই জন বিপ্লবী ধৃত হয়। একজনের ব্যাগেতে উপরোক্ত জামনগর ডাকাতির অলঙ্কারাদি পাওয়া যায়। তাহারা পুলিশকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িয়াছিল, কিন্তু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। দুই জনের ৫।৬ বৎসরের কারাদণ্ড হয়।

৭ই মে কলিকাতা আরমেনিয়ান ষ্ট্রীটে স্বর্ণকারের দোকানে ৫,৪৫৯৲ ডাকাতি হয়। দোকানের দুই জন নিহত হয়, দুই জন আহত হয়। বিপ্লবীদের একজন নিহত হয়। তাহার পেটে গুলি

লাগে। তাহাকে ট্যাক্সিতে বহন করিয়া নেওয়া হয়। কিন্তু আঘাত গুরুতর বলিয়া বিপ্লবীরাই তাহাকে একটা নির্জ্জন স্থানে নামাইয়া গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়া যায়। মৃত ব্যক্তিকে সনাক্ত করিয়া জানা যায় তাহার নাম সুরেন্দ্র কুশারী।

২০এ জুন রংপুর রাখালবুরুজে ৩১,০৮৬৲ ডাকাতি হয়। বাড়ীর মালিক ও তাহার পুত্রকে হত্যা করা হয়।

২৩এ জুলাই ঢাকা সহরে পুলিশ কর্ম্মচারীকে হত্যার চেষ্টা করায় একজনের আট বৎসরের কারাদণ্ড হয়।

২৭এ অক্টোবর ঢাকা আবদুল্লাপুরে (থানা মুন্সীগঞ্জ) ২৪,৮৩০৲ ডাকাতি হয়। টেলিগ্রামের তার কাটা হয়। যে বাটিতে ডাকাতি হয় সেখানে যাত্রাগান হইতেছিল। বহুলোক সমাগম হইয়াছিল।

৩রা নবেম্বর ত্রিপুরা জেলার মাঝিয়ারায় ৩৩,০০০৲ ডাকাতি হয়।

এই বৎসর আরও অনেক ধর-পাকড় হয়। তন্মধ্যে গৌহাটির খণ্ড যুদ্ধ বিখ্যাত। গৌহাটিতে বহু বিশিষ্ট ফেরারী বিপ্লবী থাকিত। সেখানে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করিয়া সকলেই বাহির হইয়া যায়। মুনীন্দ্র রায়, প্রভাস লাহিড়ী জখম অবস্থায় পরে ধৃত হয়, নলিনী কান্ত ঘোষও শেষে ধৃত হয়—সেও জখম হইয়াছিল। বাকি কতটি ধৃত হয় না। তন্মধ্যে নলিনী বাগচী পরে (তারিণী মজুমদারের সঙ্গে) কলতাবাজারে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করিয়া মারা যায়। পুলিশ পক্ষও হত ও গুরুতর ভাবে আহত হয়। তন্মধ্যে গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী বসন্ত মুখোপাধ্যায়ের আঘাত অত্যন্ত

গুরুতর। বাকী কয়জন পরে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সর্ত্ত করিয়া আত্মপ্রকাশ করেন।

এই সালেই ঢাকা ষ্টেশনে পুলিশ কর্ম্মচারী যোগেন্দ্র গুপ্তকে হত্যার চেষ্টা করার অপরাধে প্রফুল্ল রায় ও সতীশ সিংহ ধৃত হয়, এবং দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

এই বৎসরেই সিরাজগঞ্জে গোবিন্দ কর, এবং নিকুঞ্জবিহারী পালকে ধরিতে গেলে পুলিশের সঙ্গে তাহারা সুদীর্ঘকাল লড়াই করে। দুই পক্ষই গুরুতররূপে আহত হয়। গোবিন্দ করের শরীরে সাতটি গুলি বিদ্ধ হয়, নিকুঞ্জও আহত হয়। নিকুঞ্জের বার বৎসর ও গোবিন্দের সাত বৎসর কারাদণ্ড হয়। এই গোবিন্দ করেরই কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইয়াছে।

পরিশিষ্ট

"বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা"

বাংলায় বিপ্লববাদ প্রথম সংস্করণ বাহির হইবার পর আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সম্পর্কে পুস্তক লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী, যুগান্তর যুগের অন্যতম প্রধান কর্ম্মী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কানুনগো মহাশয়ের "বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা" একখানা। তিনি এই পুস্তকে সাধারণভাবে বাংলায় বিপ্লববাদীদের সম্পর্কে, বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে, এবং সেই সূত্রে বাঙালী জাতি ও বাংলার সমাজ সম্পর্কে যে, হতাশার চিত্র আঁকিয়াছেন। তাহা বহুলাংশে একদেশদর্শিতায় বিকৃত, সমগ্র আন্দোলনের সহিত পরিচিত না থাকায় অসত্য বলিয়াই বিবেচিত হইবে। তিনি ১৯০৮ সালেই দণ্ডিত হইয়া দেশের বাহিরে—সুতরাং আন্দোলনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। আমরা গোড়ায়ই বলিয়াছি, বিপ্লব যুগকে ভাল বা মন্দ বলিবার উদ্দেশ্য আমাদের নাই; যাঁহারা বিপ্লব যুগকে সরাসরি বিচার করিয়া এক কথায় 'ভাল' বা 'মন্দ' বলিয়া খালাস হ'ন, তাঁহারা বিপ্লব আন্দোলনের অন্তর্নিহিত ঐতিহ্য ধারাটির সন্ধান জানিলে ভাল বা মন্দ বলিতে হয় ত আরও একটু বিবেচনা করিবেন। সেই কারণে যদিও

আমরা ঠিক ইতিহাস লেখার মত এই আন্দোলনের ইতিহাস লিখি নাই, তবু যে সকল ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, বিপ্লবীদের যে সকল কর্ম্মচেষ্টা প্রকাশ পাইয়াছে, যাহার প্রমাণ অকাট্য, তাহারই বিপরীত কতকগুলি মিথ্যা গবেষণার ফল, সমগ্র বিপ্লব আন্দোলনের ঘাড়ে না চাপাইয়াও হেমবাবু তাঁহার স্বীয় অভিজ্ঞতা এবং তাহারই বিশ্লেষণমূলক কাহিনী সাধারণকে জানাইতে পারিতেন, ইহা আমাদের বিশ্বাস। হেমবাবুর প্রতিপাদ্য বিষয় যে যথার্থ নহে, তাহা দেখাইতে প্রতিবাদে 'বাংলার বাণী'তে যে লেখাটি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহারই কতকাংশ পাঠকদের সুবিধার জন্য এখানে তুলিয়া দিলাম।

"গোড়ায়ই বলি, উদাহরণ দিয়া বিপ্লবকর্ম্ম সম্পর্কে অনেক কিছু বলা-ই, বিশেষ প্রশংসাযোগ্য কিছু প্রমাণ করা বিপজ্জনক—গ্রন্থকারের সে বালাই ছিল না; তিনি প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন বিপ্লবের ব্যর্থতা, ক্ষুদ্রতা, হীনতা, চরিত্রগত দুর্ব্বলতা; বিপ্লবীদের তথা জাতির অযোগ্যতা। বিপ্লবীদের যথার্থ ইতিহাস, স্বাধীন দেশেই যথার্থরূপে লেখা সম্ভব। অধিকাংশ কর্ম্মচেষ্টাও প্রমাণ করা শক্ত। প্রামাণ্য নহে বলিয়া নহে, কিন্তু, কেন—তাহা আইনজ্ঞ মাত্রেই জানেন। গোপন কর্ম্মের অতিরঞ্জনও সম্ভব, অতিনিন্দাও সম্ভব। যথার্থ ব্যাপার শুধু দরদী ও সেই সঙ্গে দেশের হিতকামী ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারাই প্রকাশিত হওয়া সম্ভব। সে যাহাই হউক, বিপ্লবীদলের সঙ্গে গ্রন্থকারের পরিচয় অতি সামান্য। কোনও আন্দোলনের আদিতে থাকিলেই সেই

আন্দোলনের মধ্যে ও অন্তে তিনি ছিলেন বা সেই মধ্য ও অন্তের ক্রমবিকাশের বিষয়ে তাঁহার কিছু বলিবার অধিকার সাব্যস্ত হয় না। গ্রন্থকার ১৯০৮ সালে ধৃত হন। তার পর যান দ্বীপান্তরে। সেখানে দীর্ঘকাল নিজ 'দুষ্কৃতি'র ফল ভোগ করিয়া ১৯২০ সালে রেহাই পান। 'দুষ্কৃতি' কথাটা বলিলাম, গ্রন্থকারেরই বইখানা পড়িয়া। তিনি যাহা করিয়াছেন—সেই ভুল—সেই ভুলের অনুতাপ, ভুলের সঙ্গীদের উপর বিদ্বেষই তাঁহার সমস্ত পুস্তকে ছড়ান। তিনি জন কয় বিপ্লবী কর্ম্মীর (এঁদেরই বলিয়াছেন বিশিষ্ট নেতা, কর্ম্মবীর) কথা আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, আমাদের জাতীয় চরিত্র! আর ঐ সকল দোষের জন্য দায়ী আমাদের সমাজ। এমনি ভাবে কিন্তু দেশের জনকয় কর্ম্মী ও নেতার কার্য্যের আলোচনায় ঠিক ইহার বিপরীত প্রমাণও দেওয়া যায়। সুতরাং জাতীয় চরিত্রও বিপরীত হয়, সমাজও সেই হেতু প্রশংসনীয় হইয়া দাঁড়ায়। জাতীয় চরিত্র কিন্তু এত সহজে প্রমাণ করা যায় না। ইহাই আমাদের বক্তব্য।

গ্রন্থকার বারীন বাবু ও 'ক' বাবুর আলোচনাই সমগ্র বিপ্লব আন্দোলনের সমালোচনা বলিয়াছেন। কারণ "এঁরা দুজনই আদিগুরুদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি, সবচেয়ে দেশপূজ্য ও আদর্শ পুরুষ বলে গণ্য।"

সত্যনিষ্ঠ লেখকের এই সকল হেঁয়ালীপূর্ণ যুক্তি দুর্ব্বোধ্য। কোন আন্দোলনের আদিগুরু বা পাইওনিয়ারই আন্দোলনের সর্ব্বসময়কার গুরু থাকেন না। এই মোটা কথাটি আমরা সবাই

জানি যে, কোন-একটা আন্দোলন গোড়ায় যে ভাবে আরম্ভ হয়, যে সকল লোক দ্বারা চালিত হয়, এমন কি যে উদ্দেশ্যে যে আদর্শে তাহা সুরু হয়, ক্রমে তাহার বহু পরিবর্ত্তন ঘটে, ভাব বদলায়, আদর্শ পর্য্যন্ত বদলায় এবং নানা অভিজ্ঞতায় পন্থা বদলায়; পূর্ব্বে যে সব ব্যক্তি যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইত, পরে সে যোগ্যতার মাপকাঠিও বদলায়। যে উপলক্ষে কোন একটা দল গড়িয়া উঠে সেই উপলক্ষটিও শেষে অবান্তর হইয়া দলের কাছে নূতন বৃহত্তর আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা সুতরাং দায়িত্ব ও কর্ম্মপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। 'ক' বাবু ওরফে অরবিন্দ বাবু দেশপূজ্য, বিপ্লবী বলিয়া নহেন,—কিন্তু কেন. সেকথা শিক্ষিত বাঙালী জানেন। বারীন বাবুকে দেশপূজ্য বা আদর্শ পুরুষ বলিয়া আমরা জানি না। তবে বিপ্লবযুগের অন্যতম পাইওনিয়ার বলিয়া তাঁহাকে লোকে শ্রদ্ধা করে। এই যে কানুনগো মহাশয় জাতির ও বিপ্লবীদের নিন্দারূপ অপকার্য্য আজ করিতেছেন—তাঁহাকেও লোকে তেমনি অন্যতম পাইওনিয়ার বলিয়াই গণ্য ও শ্রদ্ধা করে। কিন্তু বাংলার 'বিপ্লবের চেষ্টায়' ১৯০৮ সালের পর ১৯১৫-১৬-১৭ পর্য্যন্ত যে সকল কর্ম্মী দেখা দিয়াছেন—তাঁহারা, কর্ম্মী হিসাবে,—অভিজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান কর্ম্মী হিসাবে—ত্যাগী হিসাবে যথেষ্ট যোগ্যতা দেখাইয়াছেন—তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বিপ্লব আন্দোলনে মৃত ও দণ্ডিত বহু ব্যক্তির নাম করা যায়—যাঁহারা কি ত্যাগ, কি সাহস, কি শৃঙ্খলা, কি সঙ্কল্প, কি বিপ্লবনিষ্ঠা, কি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় হেমবাবুর বর্ণিত

'ফাঁকিবাজ ধোঁয়াটে' নহেন। তিনিই লিখিয়াছেন 'বারীনের উপর অনেকেই চটিয়াছিল—তার নেতৃত্ব কেউ আমল দিত না; আর বারীন নেতা না হইয়াও নিজকে নেতা বলিয়া জাহির করিয়াছিল'। বারীন বাবু যখন এমনি মেকী নেতা, তখন তাঁহারই সমালোচনা, সমগ্র বিপ্লব আন্দোলনের সঠিক সমালোচনা বলিয়া কেন গ্রাহ্য হইবে? বিপ্লব আন্দোলনে বরাবর 'আদর্শ' ব্যক্তি বলিয়া গণ্য ও মান্য একজন ব্যক্তির সমালোচনায়—ধরিয়া নিলাম—সমগ্র আন্দোলনের আলোচনা হয়, কিন্তু যখন তাঁহাদেরই দলের অনেকে তখনই বারীন বাবুর উপর চটিয়া গেলেন, তাঁহার নেতৃত্ব মানিতেন না—তখন তাঁহাকেই ধরিয়া 'আদর্শ' দাঁড় করাইবার চেষ্টা কেন? এ দলেই কানাই, সত্যেন, সুশীল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি যদি ব্যতিক্রম, সমগ্র বিপ্লব আন্দোলনে বারীন বাবুই বা ব্যতিক্রম নন কেন?—'ক' বাবু ভিন্ন ধাতের লোক—বিপ্লবের নাকি বিশেষ কিছু বুঝিতেন না; তবে তাঁহাকেই ধরিয়া তাঁহার সমালোচনায় সমগ্র বিপ্লব আন্দোলনের সমালোচনা কেন?

এখানে 'আদি' লইয়াও কথা উঠে। বাংলার এই বিপ্লব আন্দোলন, 'ক' বাবুর সৃষ্টি নয়, বারীন বাবুরও নয়, কানুনগো মশায়ের 'অ' বাবুরও নহে। ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার এবং চৈতন্য ও রামমোহনের, বঙ্কিম বিবেকানন্দের বাংলার নব ভাবগ্রাহী মুক্ত মনের উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলা যে মন পাইয়াছিল তাহাই স্বদেশী আন্দোলনের উপলক্ষে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। এর পূর্ব্বে 'গুপ্ত সমিতি স্থাপন' করিয়া ইংরেজ মারার চেষ্টা যাহা

হইয়াছিল তাহা না হইলেও জাতীয় সাহিত্য প্রভৃতিতে যে স্বাধীনতার বাণী উচ্চারিত হইতেছিল—তাহাতে যে দেশাত্মবোধ দেখা দেয়—তাহাই বাঁধনহারা গতিতে বাংলার যুবকদের ক্রমে বিপ্লবের দিকে ঠেলিয়া দেয়, 'স্বদেশী'ও শেষে অবান্তর হয়—অরাজকতা সৃষ্টিও শেষে আদর্শ হিসাবে পরিত্যক্ত হয়। এই আন্দোলন কৃত্রিম নয়—জাতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত দেশাত্মবোধ আহত ও নির্জ্জিত হইয়া স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষায় বিপ্লবে ঝাঁপাইয়া পড়ে।—কেহ পথ দেখায় নাই—পথই পথে টানিয়াছে—নেতাও অবান্তর; কর্ম্মীর পর কর্ম্মী এই পথে জুটিয়াছে,—নেতা পিছাইয়া পড়িলে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই কর্ম্মীদের 'পথ নির্দ্দেশ' করিয়াছে। এই আন্দোলন কোন সভা সমিতি বা বৈঠকে স্থির হয় নাই—ইহা বাংলার জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ। আজ এই আন্দোলনকে খেলো করিতে কারো কারো চেষ্টা চলুক, ইহার ব্যর্থতাও স্থূল দৃষ্টিতে ধরা পড়িবে—কিন্তু পরাধীন জাতির এক অংশের স্বাধীনতার চেষ্টায়,—আপ্রাণ চেষ্টার ফলে—যে সমগ্র জাতির মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে তাহা শত প্রতিক্রিয়ার পরেও বাংলার সমাজে রাষ্ট্রে সাহিত্যে সুস্পষ্ট হইয়া আছে।

আমরা বলি না বা বিশ্বাস করি না যে, তিনি এই ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত যে সকল বিপ্লবীদের (বারীন বাবু প্রভৃতির) কুৎসা কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাঁহাদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা সবাই হুবহু এই রকমই। যদি ধরিয়াও নেওয়া যায়, যে বারীন বাবু অরবিন্দ বাবু বা দেবব্রত বাবু (গ্রন্থকারের মতে

দেবব্রত বাবুর মিথ্যা বলাই ছিল অভ্যাস) প্রভৃতি এই রকমেরই, তবু একথা প্রমাণিত হয় না যে বিপ্লবী নেতারা, বিশিষ্ট কর্ম্মীরা সবাই ছিলেন নামের পাগল, কর্ত্তৃত্বপ্রিয়, ভীরু, নিজের মুক্তিই আগে চাহিতেন, মরিতে ও মারিতে ভয় পাইতেন, স্বার্থপর, মন্ত্রগুপ্তি ছিল না, দৈবশক্তিতে বিশ্বাসী, বুজরুক ইত্যাদি।—আমরা সৌভাগ্যবশেই তবে ১৯০৮ সালের পরে বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দিই। আমরা অনেক বিপ্লবী নেতা ও কর্ম্মী দেখিয়াছি যাঁহারা নাম চান নাই—মন্ত্রগুপ্তি যাহাদের ছিল, একবার নহে বহুবার বিপদে পড়িয়াও, সাজা পাইয়াও আবার বিপ্লব দলে যোগ দিয়াছেন। কোন কোন বিপ্লবী ১৯০৮ সালে ধৃত, দণ্ডিত, লাঞ্ছিত হইয়া ১৯২৩-২৪-২৫-২৬ সালেও আবার আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন বলিয়া সরকার ধরিয়াছেন এবং বিচারে সাজা দিয়াছেন। একবার দ্বীপান্তর হইতে ফিরিয়া বা জেলে গিয়া ইঁহাদের মত বদলায় নাই—দলের নিন্দা করিয়া কেতাবও লেখেন নাই। বাংলায় বিপ্লব আন্দোলনের তাঁহারাই মধ্য ও অন্ত। আদিতেও দুই চার জন ছিলেন—তাঁহারা কেহ মরিয়াছেন—কেহ নীরবে আছেন—অপকর্ম্ম করেন নাই।

কংগ্রেস গোড়ায় কি উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছিল? তখন কোন্ ধরণের রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন ব্যক্তি কংগ্রেসে নেতৃত্ব করিত? সেই কংগ্রেস আজ কোথায় আসিয়াছে—আদর্শ, কর্ম্মপদ্ধতি, কর্ম্মী ও নেতৃত্বের যোগ্যতা বদলাইয়া যায় নাই কি? সেই ৫২ বছরের আগের কংগ্রেসের আলোচনা করিয়া সেই সব

কর্ম্মীদের আদর্শ ও যোগ্যতার কথা কহিয়া যদি কেহ বলেন—ছোঃ! তবে কি তাহা আজ সত্য হইবে? তা হইবে না; কিন্তু এমন অকৃতজ্ঞই বা কে আছে যে, ঐ যে গোড়ায় যাঁহারা কংগ্রেস করিয়াছিলেন—তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ আদর্শ সত্ত্বেও তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা না করিবে? ১৯০৪ সালেরও পূর্ব্ব হইতেই বাংলার সাহিত্যের মধ্য দিয়া বিশেষ ভাবে স্বাধীনতা-বাণী প্রচারিত হইয়াছিল সত্য—কিন্তু তবু এই বিপ্লব আন্দোলন এদেশে নূতন। নূতন আন্দোলনে অনেক বাজে-লোক, ভবিষ্যতের ভীষণতা উপলব্ধি না করার জন্য প্রথমটায় যোগ দেয়, অনভিজ্ঞতার দরুণ অনেক ভুল অনিচ্ছায় হয়, প্রথমটায় আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতিও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। এই সবই সব আন্দোলনের সূত্রপাতেই হয়। কিন্তু তাহা ধরিয়া পরের ক্রমবর্দ্ধমান—সুনির্দ্দিষ্ট আন্দোলনকে কেহ একতরফা বিচার করে না—করা যে সঙ্গত নহে তাহা বারীন বাবুর উপর বিদ্বেষবশতঃ কানুনগো মহাশয়ই হয়ত বুঝেন নাই—অন্যথায় ঐ Rowlatt Reportখানা পড়িয়াও বুঝিতেন। গ্রন্থকার Rowlatt Report খানা পড়িয়া যেখানে আন্দোলনের ত্রুটি আছে তাহাই বাহির করিয়াছেন; কিন্তু ঐ রিপোর্টেও যেখানে আন্দোলনের শৃঙ্খলা, সাহস, নিষ্ঠা, সম্মুখসংগ্রামপ্রবৃত্তি প্রভৃতির বর্ণনা আছে,—তাহা তিনি দেখেন নাই। দেখার ইচ্ছা গোড়া হইতেই তাঁহার ছিল না।

হেমবাবু তাঁহার বইয়ে লিখিয়াছেন আলিপুর মামলায় নাকি অনেকেই গুপ্তকথা প্রকাশ করিতে ব্যস্ত, খালাস পাইবার জন্য দোষ স্বীকারে ব্যস্ত, নেতারা মুক্তির জন্য অতিব্যস্ত। এবং

ইহাই সমগ্র বিপ্লবীদের স্বভাব বলিয়াছেন। এ সব তিনি প্রকাশ করিয়া জাতির বিপ্লব-অযোগ্য স্বভাবেরই প্রমাণ দিয়াছেন। কিন্তু সরকারী মামলায়ই প্রকাশ, ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় পঁয়তাল্লিশ জনের মধ্যে একজনও গুপ্তকথা প্রকাশ করে নাই। কোন নেতাই, কোন কর্ম্মীই খালাস পাইবার জন্য অতিব্যস্ত হয় নাই। সেশন আদালতে পুলিন বাবু বলিয়াছিলেন, 'সমিতির সকল কাজের জন্য একমাত্র আমিই দায়ী, আমি সাজা নিতে প্রস্তুত—আর সকলেই নির্দ্দোষ।'—মামলায় দীন দরিদ্র আসামীর জন্যও সি. আর. দাসই খাটিয়াছেন। সকলের জন্য একই ব্যবস্থা। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় একে অপরকে বরং খালাস করিতে চাহিয়াছে। শেষে ব্যারিষ্টারের সঙ্গে পরামর্শ মত সরকারের সঙ্গে একটা আপোস হয়। তাহাতে কতজন এই সর্ত্তে দোষ স্বীকার করেন যে, নির্দ্দিষ্ট কতটি কর্ম্মীকে বেকসুর খালাস দিতে হইবে, এবং স্বীকারের ফলে যাহাদের সাজা হইবে, তাহাদেরও মেয়াদ নামমাত্র হইবে। এই দোষ স্বীকার কিন্তু একরার নয়। কে কি করিয়াছে, বা কে কি করিয়াছে বলা নহে, কেবল মাত্র 'I am guilty of conspiracy'—এইটুকু বলিয়াছে, তাহাও সকলের সিদ্ধান্তে এবং বাকি সহ-কর্ম্মীদের মুক্ত করারই জন্য। সবাই খালাস পাওয়ার জন্য (বিশেষ নেতারা) যে অতি ব্যস্ত হন নাই, তাহারই প্রমাণার্থ এই কথা বলিলাম।

রাজাবাজার বম কেসে দীনেশ দাসগুপ্ত যতক্ষণ তাঁহার আত্মীয় তাঁহার অপর সঙ্গীদের মামলাও একত্রে করিবার ব্যবস্থা

না করিয়াছিলেন ততক্ষণ নিজে উকিলের সাহায্য নেন নাই।—সকলকে ছাড়িয়া নিজের মুক্তি ধনীও চায় নাই—যার টাকা আছে তার মামলাও যে আলাদা চলে নাই সেজন্যই এই একটা ঘটনা বলিলাম। এমনি আরো প্রমাণ উল্লেখ করা যায়। গ্রন্থকার কিন্তু তাঁহার অভিজ্ঞতায় বিপরীত কথাই বলিয়াছেন।

বিপ্লবীরা ধৃত হইয়া সর্ব্বত্র খালাস হইতে ব্যস্ত হয় নাই। গ্রন্থকারের বর্ণিত আলিপুর মামলায়—নেতারা খালাস হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া সব বলিয়া দিয়াছে—কর্ম্মারাও অনেকে তেমনি খালাস হইবার জন্য অতি ব্যস্ত ও 'প্রতিযোগিতায়' 'ইনফরমেশন' দিয়াছে প্রভৃতি যদি সত্য বলিয়া ধরিয়াও নেওয়া যায় তবু তাহাতে প্রমাণিত হয় না, সুদীর্ঘ বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে অসংখ্য মামলার বিপ্লবী আসামীরা তেমনটাই করিয়াছেন। বরং করেন যে নাই ঠিক তেমনি ঘটনা আমার নিজেরই ২৮টি জানা আছে—আরো কত ত নিজে জানি না।

সোনারঙ্গ মামলা—এগার জন আসামী, একজনও একটি কথাও বলে নাই। ঢাকা গুলিমারা মামলায় দুই জন, কেহই কিছু বলে নাই। কুমিল্লা ডাকাতি মামলায় সাত জনই সাজা পায়, এক জনও কোন কথা বলে নাই। রাজেন্দ্রপুর ট্রেণ ডাকাতিতে চার পাঁচ জন ধৃত হয়, কেহই কিছু বলে নাই। নরিয়া, বাহ্রা, গোপচরেও তেমনি। চট্টগ্রাম খুনের মামলায় একরার নাই। প্রাগপুর ডাকাতিতে কেহ কিছু বলে নাই। লক্ষ্ণৌয়ে বাঙালী সুশীল লাহিড়ীর ফাঁসি হইলেও একরার করিয়া বাঁচিতে চাহে নাই।

রাজাবাজার বম কেসে পাঁচজনই সুদীর্ঘ দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হয়—একজনও confession করিয়া বাঁচিতে চায় নাই। রডা কেসে ধৃত আসামীরা কেউ একরার করে নাই। চারু বসুর ফাঁসি হয়, একরার করে নাই, কাউকে জড়ায় নাই, বাঁচিতে চায় নাই। যতীন রায় সার এণ্ড্রু ফ্রেজারের উপর আক্রমণ করে—দশ বছর সাজা হয়—একরার করে নাই। দক্ষিণেশ্বর বম কেসে ধৃত আট দশ জনের কেহই একরার করে নাই। দীর্ঘ সাজা পাইয়াছে। গৌহাটির গুলির মামলায় দীর্ঘ সাজা পাইয়াছে—কেহই একরার করে নাই। সিরাজগঞ্জের গুলির মামলায় দীর্ঘ সাজা হইল,কেহ কিছু বলে নাই। আসক জমাদার গলিতেও পুলিশের সঙ্গে দাঙ্গার মামলায় সাজা হয়, আসামীরা কেহ একরার করে নাই। এছাড়া প্রায় কোন মামলায়ই নেতৃস্থানীয়গণ এবং বিশিষ্ট কর্মী খালাস পাওয়ার জন্য মোটেই কনফেশন করেন নাই। গ্রন্থকার প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, জেল মস্ত reformatory—বোধ হয় তিনি স্বয়ং ও তৎসঙ্গীদের reformation দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁর বক্তব্য এই—বাঙালী বিপ্লবীদের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিষ্ঠা ছিল না, তাই একবার জেলে গিয়াই সবাই 'reformed' হইয়া গেল—আর ওপথ মাড়ায় নাই। 'আমাদের দেশের জেলখানা রাজদ্রোহীদের পক্ষে অব্যর্থরূপে বিফর্মেটরী'—একথা গ্রন্থকার ও তস্য সঙ্গীদের অনেকের বেলায় হয়ত বা সত্যই কিন্তু বিপ্লব আন্দোলনে তাঁহাদের পর যাঁহারা ছিলেন, গোটা বাংলার সেই ব্যাপক আন্দোলনের ইতিহাসে অধিকতর বিপ্লবনিষ্ঠ, শক্ত, যাহাকে বলে

stamina সম্পন্ন ব্যক্তির অভাব হয় নাই। গ্রন্থকার তাঁহাদেরই '১৯০৮' পর্য্যন্ত পরমায়ু বিশিষ্ট দলের নিষ্ঠার অভাব, সুখপ্রিয়তা, দুর্ব্বলচিত্ততা লক্ষ্যহীনতা। তাঁহারই মতে) প্রভৃতি দ্বারা যদি বিপ্লব আন্দোলন তথা জাতীয় চরিত্রের অযোগ্যতা প্রমাণ করিতে চাহেন, তবে ঠিক তেমনি বিপরীত বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা জাতীয় চরিত্রের বিপরীত দিকই প্রমাণ করা যায়। বিপ্লবীদের ভায়লেন্স সমর্থন জন্য নহে—কিন্তু গ্রন্থকারের উক্তি যে মিথ্যা সেজন্য এসব কথা উল্লেখ করিতে হয়।

বহু বিশিষ্ট বিপ্লব-কর্ম্মী ১৯০৭-০৮ সালে একবার লাঞ্ছিত হইয়া পুনরায় এই আন্দোলনেই যোগ দিয়াছেন, আবারও দণ্ডিত হইয়া মুক্ত হওয়ার পর পুনরায় এ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, এর প্রমাণ আছে। এদিকে বাঙালী যুবকদের, তথা জাতির staminaর অভাব, নিষ্ঠার অভাব গ্রন্থকার দেখাইতে মিথ্যা কতগুলি বাজে কথা বলিয়াছেন, তাই এ সব কথা বলিতে হইতেছে। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র করের পাবনা গুলিমারা (পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের লড়াই হয়, দুই দলই গুলি চালায়) মামলায় সাজা হয় সাত বৎসর দ্বীপান্তর। তাঁহার শরীরে বহুস্থানে গুলি বিদ্ধ হইয়াছিল। হাঁসপাতালে গোটাকয় কাটিয়া বাহির করে—বাকি কয়টা শরীরেই থাকিয়া যায়। তাহাতে তাঁহার শরীরে ব্যাধিও দেখা দেয়। সাত বৎসর পরে তিনি মুক্ত হইয়া আসেন। সরকারেরই বিবরণীতে প্রকাশ, তিনি পুনরায় ১৯২২-২৩ সালে বিপ্লব-আন্দোলনে যোগ দেন। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি একজন প্রধান আসামী, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে

পণ্ডিত। এসব লোক আমাদের হাতে হাতে স্বর্গ আনিয়া দিতে পারে নাই বা পারিত না বলিয়া এদের বিপ্লবনিষ্ঠা বা স্বাধীনতা লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও তজ্জন্য নির্য্যাতন ভোগের 'আত্মপ্রসাদ' ছিল না, একথা বলা হেমবাবুরই শোভা পায়, কারণ তিনি বারীন বাবুর ও তাঁহার নাম করিয়া সমগ্র বাঙালী জাতিরই নিন্দা করিতে বসিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কুমিল্লায় পুলিশের হেপাজত হইতে পালান, পরে গুপ্তভাবে থাকেন। ১৯১৭ সালে তিনি পাথুরিয়া ঘাটায় ধৃত হন। পরে তিনি যে নির্য্যাতন ভোগ করেন বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ, তাহা Modern Reviewএ ছাপা হইয়া আছে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিষ্ঠা ঢালিয়া দিয়া স্নান না করাইয়া রাখিয়াছে,—জল পিপাসায় মূত্রপূর্ণ বোতল দিয়াছে। বড়লাটের কাছেও পরে এই মর্ম্মে দরখাস্ত যায়। যাহাই হউক. নির্য্যাতনের কথা নহে; কথা এই, এর পরও কানুনগো মহাশয়ের 'reformation' ত ঘটে নাই! পরে তিনি regulationএ আটক হন—তার পর ১৯২০ সালে মুক্ত হন। আবার ১৯২৪ সালে অর্ডিন্যান্সে আটক হন। Stamina না থাকিলে—সরকারী বিবরণ ও বিচারে প্রকাশিত ও সাব্যস্ত যাহা হইয়াছে তাহাই বলি—১৯২৬ সালে কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁহারই আবার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইত না। তাহাতে প্রকাশ তিনি যুক্ত প্রদেশে বিহারে নানাস্থানে বিপ্লব কেন্দ্র স্থাপন করিয়া কাজ করিতেছিলেন। শুধু জেল নয়, অমানুষিক নির্য্যাতন সহিবার পরেও

গ্রন্থকারের কথা মত সকলেরই reformation হয় না দেখা গেল, —স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও কমে না। কৃতকার্য্য হয় নাই বলিয়া ইহাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অস্বীকার করিব? বাংলার যুবকেরা স্বাধীনতার জন্য নির্য্যাতন ভোগে আত্মপ্রসাদ লাভ করিত না বলিয়াই নির্য্যাতনে হীন হইত—গ্রন্থকারের এই উক্তি যে সত্য নয়, এই জন্যই কথাগুলি বলিলাম। আর সব পরাধীন জাতির স্বাধীন হইবার যোগ্যতার মতই বাঙালীরও যে যোগ্যতা আছে তাহাই বলিতে চাই। এই প্রসঙ্গে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, রাজেন্দ্র লাহিড়ী প্রভৃতি আরো কত নামই করা যায়। তা ছাড়া পুনঃ পুনঃ দণ্ডিত হইয়াও স্বাধীনতা কামনা কমে নাই—বিপ্লব আন্দোলনের কর্ম্মী বলিয়া পুনঃ ধৃত, দণ্ডিত, Regulation ও Ordinanceএ অন্তরিত ব্যক্তির নাম ত কতই করা যায়। আপাতত যে কয়টি নাম মনে আসিল দিলাম:—ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী। বারকয় সাজার পর পনের বছর দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হন, মুক্ত হইয়া পুনরায় Reg. IIIতে বিপ্লবী বলিয়া অবরুদ্ধ হন। পূর্ণচন্দ্র দাস, বিপিন গাঙ্গুলী, নরেন্দ্র-মোহন সেন, প্রতুল গাঙ্গুলী, রবীন্দ্রমোহন সেন, ভূপতি মজুমদার, গিরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র ঘোষ, রমেশ চৌধুরী, কিরণ মুখার্জ্জী, রমেশ আচার্য্য মনোরঞ্জন গুপ্ত ইত্যাদি।

বিপ্লবীরা ধরা পড়িলেই বাঁচিবার জন্য ব্যাকুল হইত—আর এই ব্যাপারটা 'ছেলেখেল্যাই' ছিল, বাঁচিতে পারিলে সেজন্যই ব্যস্ত হইত, এইসব প্রমাণ করিতে হেমবাবু তাঁহার দলের জন কয়েকের বাঁচিবার অতিব্যস্ততা দেখাইয়াছেন। অবশ্য দুই চার

জনের নির্ভীকতার বর্ণনাও দিয়াছেন—কিন্তু তাহার মধ্যেও নামের নেশা, মন্ত্রগুপ্তির অভাব প্রভৃতির প্রমাণ দিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। কানাই ও সত্যেনের কার্য্য সেই সব বাক্জালের অন্তরালে পড়িয়া ম্লান হইয়া গিয়াছে।

বিপ্লব আন্দোলনে সব সময়ে কর্ম্মপ্রণালী একভাবে চলে না। ১৯১৪ সালের পর বিপ্লবীরা পুলিশের সঙ্গে লড়াইয়ের ভাব দেখায়। তাহাতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে—বাঙালী যুবকেরা যে-কোন দেশের স্বাধীনতাকামীদের মত সাহস, কৌশল ও দৃঢ়তা-সম্পন্ন। সুযোগ পাইলে তাহারা আপাতদৃষ্টিতে অসাধ্য অনেক কিছুই সাধন করিতে পারে। লড়াই করা যেখানে স্থির সেখানে তাহারা অল্পসংখ্যক বহুসংখ্যকের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে 'প্রাণের মায়া' দেখায় নাই—বরং বিপরীত প্রমাণই দিয়াছে। অথচ তখনও ইচ্ছা করিলেই অনেকেই একবার করিয়া বাঁচিতে পারিত। হেমবাবুর চোখে এসব পড়ে নাই—অথচ, "বাংলায় বিপ্লবপ্রচেষ্টা" তিনি লিখিয়াছেন। দুই চারিটি ঘটনাই মাত্র বলিব। বালেশ্বরে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাহিনীর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন লড়াই করে, এবং মৃত্যু বরণ করে—এক জনের ফাঁসি হয়। সে লড়াই ছেলেখেলাই বটে!

বলা যাইতে পারে ওতে আর কি হইল?—কি হইল, সে কথার প্রমাণ বা প্রতিবাদ করিতে বসি নাই। গ্রন্থকার যদি কেবল বলিতেন—বাংলার বিপ্লবীরা দেশে স্বাধীনতা আনিতে পারে নাই—তাহা মাথা পাতিয়া মানিতাম বা এই পথ ভাল নহে

বলিলে নীরব হইতাম। কিন্তু তাহাদের চেষ্টাকে খাটো করার, ব্যঙ্গ করার, শুধু বাহিরের কাজ নয়, অন্তরটাকে পর্য্যন্ত ছোট করিয়া দেখানোর মতলবটাই আমাদের প্রতিবাদ করার বিষয়। কারণ তাঁহার বই লেখার উদ্দেশ্য বারীন বাবু নন, সকল বিপ্লবী তথা সমগ্র বাঙালী জাতি।

কলতাবাজার—ঢাকাতে নলিনী বাগচী ও তারিণী মজুমদার বহু সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত লড়াই করে, অনেককে খুন জখম করিয়া গুলিতে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। নলিনী বাগচী মরিবার সময়ও নিজ নাম প্রকাশ করিয়া যায় নাই। কেহ তাহাকে জানুক, ইহা তাহার কাম্য নহে। এমনি ধারার 'মন্ত্রগুপ্তি' বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে বহু আছে। আমরা তাহা জানি; হেমবাবুর জানা না থাকিলে প্রয়োজন হইলে সেই প্রমাণও দিব। এই মন্ত্রগুপ্তির অভাব লইয়াও তিনি কত নিন্দা, বিদ্রূপ, নিরাশার কথাই না কহিয়াছেন!

গৌহাটিতে—শাস্ত্রীদের বন্দুক একদিকে, বিপ্লবীদের পিস্তল এক দিকে, খণ্ডযুদ্ধ চলিল, শুধু চলিল না—সৈন্যদের ব্যূহভেদ করিয়া গুলি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে তাহারা জখম হইয়া ও জখম করিয়া বাহির হইয়া গেল। পরে দুই চার জন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ধৃত হয়। অমানুষিক নির্য্যাতন সহিয়াও সেই দলের নলিনীকান্ত ঘোষ, প্রবোধ দাসগুপ্ত মৃণীন্দ্র প্রভৃতি কেহই একটি কথাও পুলিশকে বলে নাই। বগুড়াতেও বিপ্লবীরা খণ্ডযুদ্ধ করিয়া বাহির হইয়া যায়। ভারতবাসীদের মধ্যে যে জাতিহিসাবে বাঙালীই মরিতে ও মারিতে স্বভাবতঃ ভীরু,

গ্রন্থকারের এই উক্তি যে সত্য নয়, তাহারই প্রমাণের জন্য তাঁহার বর্ণিত ঘটনার বিপরীত কয়েকটা বৃত্তান্ত বলিলাম।

ডাকাতি, পরস্বাপহরণ কে সমর্থন করিবে? বিপ্লবীদের সেই কার্য্য আমরা সমর্থন করিতে বসি নাই; কিন্তু এই অপকার্য্যটিকে হেমবাবু 'বিধবার ঘটি চুরি' আখ্যা দিয়া ইহার স্বরূপটি যে বিকৃত করিতে চাহিয়াছেন, তাহা সত্য নহে ইহাই বলিতে চাই।

হেমবাবু উল্লেখ করিয়াছেন কাহাদের টাকা ডাকাতি করা হইবে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। রাশিয়ার বা আনন্দমঠের মত "যে অর্থশালী ব্যক্তি, খয়ের খাঁই বা মুখবীরের (informer) কাজ করত, অথবা যে সাধারণের অপ্রিয়, অত্যাচারী, পরস্বাপহারী, সুদখোর—" তাহাদেরই উপর বৈপ্লবিক ডাকাতি হইত কিনা তাহার কোন হিসাব জানি না। কিন্তু এই ডাকাতি গ্রন্থকার বর্ণিত বিধবার ঘটি চুরি অর্থাৎ যেখানে কোন ভয় নাই সেই নিরীহ বিধবার হাজার টাকা গ্রহণের বীরত্ব—যে বিধবার "বাড়ীর আশে পাশে এমন পুরুষ মানুষ কেউ ছিল না যে, ডাকাতদের একটুও বাধা দিতে পারে অর্থাৎ হিংসা কর্ত্তে পারে"—এমনি ডাকাতিই যে কেবল বিপ্লবীরা করিয়াছে ইহা সত্য নহে। ডাকাতি নিন্দাইই মনে করি, কিন্তু বাংলার বৈপ্লবিক ডাকাতি যে গ্রন্থকারের বর্ণিত বিধবার ঘটি চুরি নহে, বাড়া ডাকাতি প্রভৃতি বহু ডাকাতিতেই যে আক্রান্তেরা কেবল বাধা নহে বন্দুকও চালাইয়াছে, বিপ্লবীরা বহু স্থলে আহতও হইয়াছে, ইহা সত্য কথা। বলা বাহুল্য মাত্র যে, আমরা ডাকাতি বা খুন কিছুই সমর্থন

করিতে বসি নাই। তবে গ্রন্থকার অন্যায় সুযোগ গ্রহণ (এ সবের যথাযথ উত্তর দেওয়া যায় না বলিয়া) করিয়া যে বিপ্লবীদের জঘন্য ভাবে খাটো করিতে কলম ধরিয়াছেন, অমরা তাহারই প্রতিবাদ করিতেছি। অনভিজ্ঞতা হেতুও তিনি এসব কথা বলিয়া থাকিতে পারেন, তাঁহার সকল কথার প্রতিবাদ করার স্থান ও কাল ইহা যদিও নহে, তবু আমরা সামান্য ইঙ্গিত করিয়া ইহাই বলিতে চাহিতেছি যে, বিপ্লবীদের সঠিক চিত্র তিনি আঁকেন নাই—আমাদের মনে হয় ইচ্ছা করিয়াই আঁকেন নাই।

গ্রন্থকার Rowlatt Report হইতে দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, বিপ্লবীরা অনেকেই গুপ্ত কথা সব বলিয়া দিয়াছিলেন। Rowlatt Report বিপ্লবীদের খাটো করিবার সহজ মতলবেই লিখিত। তবু বলি, Rowlatt Reportএর ঐ কথা ১৯১৮ সালের কথা। কিন্তু ১৯০৮ সাল হইতে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্তের ইতিহাস কোথায়? তখন কয়জন নেতা, কয়জন বিশিষ্ট কর্ম্মী গুপ্ত কথা বলিয়াছে, কয়জন মন্ত্রগুপ্তি নষ্ট করিয়াছে? আসল কথা এই—১৯১৪ সালের পরে ১৯১৫-১৬ সালের মধ্যে প্রায় সকল নেতাই ধৃত হন। তখন অত্যন্ত নূতন এবং অপরীক্ষিত অনভিজ্ঞ লোকই বিপ্লব আন্দোলন চালায়। ১৯১৭-১৮ সালেও যাহারা ধৃত হয়, তন্মধ্যে যাহারা পুরাতন বিশিষ্ট কর্ম্মী তাঁহাদের সংখ্যা বেশী নহে, (যথা নলিনীকান্ত ঘোষ, অমৃত সরকার, ভূপেন্দ্র দত্ত প্রভৃতি)। তাঁহারা অমানুষিক নির্য্যাতন সহিয়াছেন—কিন্তু একটি কথাও betray করেন নাই। অমৃত সরকার ও নলিনীকান্ত ঘোষের অমানুষিক

নির্য্যাতনের কথা প্রকাশিত হয়। সুতরাং শেষকালের—১৯১৮ সালের, তখন দলের জমাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—ধৃত কেহ কেহ (সেই সংখ্যাও মোট বিপ্লববাদীদের তুলনায় অনেক কম) একরার করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই নরেন গোসাই শ্রেণীর। কেহ কেহ হতাশ হইয়াছে, কেহ কেহ মনে করিয়াছে পুলিশ যখন সবই জানে, তখন আর না বলিয়া মিছামিছি নির্য্যাতন ভোগ করি কেন? কেহ আবার পুলিশ যতটুকু জানিয়াছে, তাহাই বলিয়া interned হইতেও চাহিয়াছে—internment হইতে পলাইতে পারিবে, এই মতলবেও বলিয়াছে। কাহাকেও পুলিশ ভ্রান্তও করিয়াছে, অমুক অমুক বিশিষ্ট কর্ম্মী এই বলিয়াছে—এই ভাবে মিথ্যা বলিয়া ভ্রান্ত করিয়াছে। ইহা অবশ্য আমরাও বিপ্লব আন্দোলনের গুণ বলি না কিন্তু ব্যাপারটা যাহা হইয়াছে তাহার সত্যকার দিকটা দেখানই কি কানুনগো মহাশয়ের কর্ত্তব্য ছিল না?

বিশেষ একটা সময়ের, বিশেষ একটা অবস্থার আংশিক ঘটনা, সমগ্র আন্দোলনের যথার্থ রূপ বলিয়া প্রমাণ করিতে যাওয়া আর সেই প্রমাণ বলেই সমগ্র জাতির দোষগুণ কীর্ত্তন করা সমীচিন নহে।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, বিপ্লবী কর্ম্মীরা ধরা পড়িয়া সবাই খালাসের জন্য ব্যস্ত হয় নাই, গুপ্তকথা ব্যক্ত করে নাই, নাম জাহির করে নাই, পরস্পরকে জড়ায় নাই—বহু মামলায়ও যে একরার নাই, তাহাও দেখাইয়াছি। হেমবাবু প্রথমটায়

বারীন বাবুর স্বীকারোক্তির কথা টানিয়া আনিয়া বলিতেছেন, ('বারীন কেন এমন করেছিল তার কারণ ঠিক ধরতে না পারলেও') 'বারীনের অবস্থায় পড়লে যে দেশ-উদ্ধারকারীরাও ও-রকম ক'রে থাকে, তা দেখানোর জন্যই অত কথা লিখ্‌ছি।" গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য দু'টি, এক ব্যক্তিগত হিসাবে বারীনবাবুকে ঘায়েল করা— অপর সমগ্র বিপ্লব আন্দোলন, তথা এই দেশবাসী—সবাই।

'বারীনের অবস্থায় পড়লে সবাই যে তা ক'রে থাকে' (ক'রে যে থাকে না, তাহা বহু ধৃত দণ্ডিত ব্যক্তির ঘটনায় দেখাইয়াছি) তাহা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন—বীরেন্দ্র দত্তগুপ্তের statement হইতে। বীরেন দত্তগুপ্ত অপেক্ষাকৃত বালক। বিপ্লব আন্দোলন তখনও এদেশে নূতন। অভিজ্ঞতা কম। বীরেন্দ্র সাম্‌সুল আলমকে হাইকোর্টে হত্যা করে। বীরেন্দ্র ফাঁসির পূর্ব্বদিন স্বেচ্ছায় ম্যাজিষ্ট্রেটের (রাউলাট রিপোর্টের কথা) সামনে একরার করে। সে বলে, "জ্ঞানেন্দ্র মিত্র নামক বালকের দ্বারা যতীন্দ্র মুখার্জ্জি নামক একজন ভদ্রলোকের সহিত আমি পরিচিত হয়েছিলাম।" (তার পর যুগান্তর পড়া ও বীরত্বপূর্ণ কাজ করার ইচ্ছা—পরে সামসুল আলমকে হত্যা করার পরামর্শ, যতীনের আদেশ ইত্যাদি বলিয়া) "আমি যতীনের অনিষ্ট করবার জন্য এই এজাহার দিচ্ছিনা। আমি বুঝতে পেরেছি এনার্কিজম্ দ্বারা দেশের কোন হিত হবে না। যে সকল নেতা আমার ওপর দোষারোপ ক'রে বল্‌ছেন,—এ কাণ্ড ঘটেছে কোনও মাথাপাগল বালকের দ্বারা, তাঁদের আমি দেখাতে চাই, আমি একলা এ কাজের জন্য দায়ী নই। আমার

ও যতীনের পেছনে অনেক লোক আছেন, কিন্তু আমি তাঁদের নাম এই এজাহারে উল্লেখ করতে চাই না। যে সকল নেতা আমায় দোষ দিচ্ছেন, তাঁরা দয়া ক'রে এগিয়ে আসুন এবং আমার মত বালকদের সৎপথে চালিত করুন।" (সিডিসন কমিটির রিপোর্ট হইতে গ্রন্থকারের অনুবাদ)।

সিডিসন কমিটি—সুতরাং হেমবাবুও বলিয়াছেন এই এজাহার 'স্ব-ইচ্ছায়' বীরেন্দ্র দিয়াছে! কাল যাহার ফাঁসি হইবে তাহাকে কোন লোভ দেখাইয়া এই একবার করান হয় নাই—ইহা বুঝা যায়। কিন্তু এই বালকটির betrayalএর মূলে যে কতটা মানসিক উত্তেজনা রহিয়াছে এবং এই অনভিজ্ঞ যুবকের মানসিক সাম্য নষ্ট করার জন্য যে কি কি ব্যবস্থা হইতে পারে বা হইয়াছিল, তাহার সংবাদ কে বলিবে? কিন্তু এই একবারেই যাহা প্রকাশ তাহা হইতেই কি কানুনগো মশাই, বিপ্লবীদের এত মনস্তত্ত্ব ঘাঁটিয়াও, এই মনস্তত্ত্ব বুঝেন নাই! এ ত' স্পষ্ট বুঝা যায় বীরেনকে জেলে সংবাদপত্র নিয়া দেখান হইত, (সাধারণতঃ কিন্তু জেলে সংবাদপত্র নিয়া পড়ায় না) সব নহে, বাছিয়া বাছিয়া যে সংবাদপত্রে বালককে নিন্দা করা হইয়াছে, যাহা-তাহা বলা হইয়াছে, তাহাই পড়ান হইত।

দেশের লোক তাহাকে পাগল বলিতেছে ইহা সে জানিয়াছে। তখন অনভিজ্ঞ বালকের মনে হইতে পারে, আমি একা নই যে আমাকে দোষ দিতেছ—আরো অনেক লোক আছে। আমি যদি পাগল হই, উহারাও পাগল। নেতারা এখন নিন্দা করেন

আগে বাহবা দিয়াছেন ; যাঁহারা নিন্দা করেন, তাঁহারা এগিয়ে এসে আমাদের মত ছেলেদের সৎপথে চালিত করুন।—কেহ বিপ্লবী-কাণ্ডে ধরা পড়িলে, অপর পক্ষে পুলিশ কি কি ব্যবস্থা করিতে পারে এবং করে, কোন্ কোন্ কথা বলিয়া মন দমাইয়া দিতে চেষ্টা করে, স্বদেশের লোকদের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি দোষ দেখাইয়া কি কি ভাবে ভ্রান্ত করিতে পারে তাহা বিপ্লবীরা ক্রমে অভিজ্ঞতা হইতে শিখে। বীরেন্দ্রকে পুলিশ সংবাদপত্রের cuttings পড়াইয়া পড়াইয়া ও নেতারা যে তাদের মত ছেলেদের বিপদে ফেলিয়া নিজেরা সাধু সাজিতেছে এবং দেশের সমস্ত ভাল লোকই যে তাহাদের নিন্দা করিতেছে, ইহা বুঝাইয়া এই statement করিতে প্রেরণা দেয় বলিয়াই এদেশে প্রচার। সুতরাং বারীন বাবুর স্বীকারোক্তিকে সমর্থন করিতে বীরেন্দ্রের স্বীকারোক্তি তুলিয়া সব 'দেশোদ্ধারকারীরা' যে এমনই একরার করিয়া থাকে, তাহা বলা চলে না। বহু ব্যক্তি যে করে নাই, তাহা আমরা বলিয়াছি—হালের কাকোরী মামলায় ফাঁসির পূর্ব্বে কেহ একরার করিয়াছে গ্রন্থকার জানেন কি? বীরেনের নজির গ্রন্থকারের কথামত মানিয়া নিলেও তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয় না। কিন্তু বীরেনের ব্যাপারও যে স্বতন্ত্র, তাহাই বলিতে বীরেনের statementএর একটু সমালোচনা করিলাম ; অবশ্য বীরেনের মত বালকদের দলে টানার সঙ্গতি-অসঙ্গতি ভিন্ন কথা।

ব্যক্তি হিসাবে বারীন বাবু বা কাহাকেও সমর্থন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যত বড় লোকই হউন, যদি দেশের সেবায় 'ছেড়ে

দিলাম পথটা বদলে গেল মতটা' এই নীতি অনুসরণ করেন তবে বেশী দিন তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি থাকে না। কিন্তু গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে কয়েকজন নেতা বা কর্মবীরের দোষ দেখাইয়া তিনি জাতীয় চরিত্রের হীনতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই জন্যই আমরাও তাঁহার লেখার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমাদের জাতীয় চরিত্রের নানা দোষ ত্রুটি নিশ্চয়ই আছে, নতুবা এখনও পরাধীন আছি কেন। কিন্তু বারীন বাবুর দোষ (ধরিয়া নিলাম) যদি প্রকৃত পক্ষেই থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে সমস্ত জাতীয় চরিত্রই কলুষিত হইয়া গিয়াছে এমন যুক্তি কোথাও শুনি নাই। আলিপুরের বোমার মামলার আসামীগণের মধ্যে যেমন নরেন গোস্বামী ছিল, তেমনি সত্যেন বসু ও কানাই দত্তও ছিলেন, উল্লাসকরও আছেন। দেশের সকলেই খারাপ লোক একথা কিছুতেই প্রতিপন্ন হয় না।

হেমবাবু গবর্ণমেন্টের প্রকাশিত Rowlatt Reportখানা ভাল করিয়া পড়িলেই মোটামুটি বুঝিতেন যে, সমস্ত দেশটাই তাঁহার বর্ণিত 'Sanko'র মত ছিল না। কত নির্লোভ, নিরহঙ্কার বীরহৃদয় যুবক নীরবে নিশ্চিহ্ন হইয়া বিপ্লব প্রচেষ্টায় আত্মদান করিয়া গিয়াছে। যাহারা অজ্ঞাত অখ্যাত হইয়া শুধু আত্ম-বলিদানেই জীবন সার্থক মনে করিয়া গেল, সেই সমস্ত চরিত্রের লোক হেমবাবুর চক্ষে পড়ে নাই। তিনি "বিশ বাইশ বৎসরের নিদারুণ অভিজ্ঞতায়" নাকি বুঝিতে পারিয়াছেন যে Sankoর মত ভীরু এদেশের সকলেই।

এই "নিদারুণ অভিজ্ঞতা" শব্দেই তাঁহার মানসিক অবস্থা প্রকট হইয়াছে। আন্দামানের 'নিদারুণ অভিজ্ঞতায়' অনেকের মত তাঁহারও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। আজ লাঞ্ছনা ভোগের পর তিনি নিজের হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে দেশের সমস্ত লোকই ভীরু, কাপুরুষ!

কানুনগো মহাশয় আমাদের জাতীয় অযোগ্যতা প্রমাণ করিতে বারীন বাবু, 'অ' 'বাবু, 'ক' বাবু তথা সমগ্র বিপ্লব আন্দোলন এবং সেই সঙ্গে সমাজের দোষ ত্রুটির কালো চিত্র আঁকিয়াছেন। সমাজের দোষ-ত্রুটি আছে, কিন্তু সমাজের দিক হইতেও বাঙালীর নিরাশ হইবার কিছু নাই। আর মুক্তিকাম বিপ্লবীদের কাছে সমাজ অপরিবর্ত্তনীয় বন্ধন বলিয়া মোটেই গ্রাহ্য হয় নাই। আমরা বলিয়াছি, আমাদের দেশে সমাজে দোষের অন্ত নাই। কিন্তু গত শত বর্ষ যাবত দেশে যে সামাজিক বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আজ পর্য্যন্ত জাতিকে উন্নতির পথেই অগ্রসর করিয়া দিতেছে; জাতির উন্নতির পরিপন্থী সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার ও সামাজিক কুরীতি ক্রমশ দূরীভূত হইতেছে। সমাজ-সংস্কার বিষয়ে জাতিহিসাবে আমরা জগতের কোন জাতি অপেক্ষা কম পরিবর্ত্তনশীল নই; ইহা আমাদের জাতির সামাজিক জাতীয় ইতিহাসের দ্বাদশ সহস্র বৎসরের পাতায় লিপিবদ্ধ। রাষ্ট্রবশ্যতা যাহাকে, আজ অচলায়তনবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—রাষ্ট্র সপক্ষ হইলে তাহা দেশ কালের হাত ধরিয়া চলিতে পারিত।—যাক্ ইহা তর্কের কথা। হেম বাবুর বর্ণিত সমাজ-চিত্র সত্ত্বেও ইহা

বাংলার বিপ্লববাদীদের মধ্যে যে বয়সের, যে শ্রেণীর, যে ব্যবসায়জীবী লোক সাধারণত যোগ দিয়াছিল তাহার একটা তালিকা সিডিসন কমিটির রিপোর্ট হইতে দিলাম। যাহারা ১৯০৭—১৭ সালের মধ্যে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের জন্য সাজা পাইয়াছে, অথবা যাহারা অন্যান্য বিশেষ চার্জ্জে অভিযুক্ত হইয়া সাজা পাইয়াছে—বা যাহারা বিপ্লবানুষ্ঠানে মারা গিয়াছে, এই তালিকায় মাত্র তাহাদেরই গণনা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য ইহাতে অন্তরীণদের, রাজবন্দীদের এবং যাহারা শান্তিরক্ষার জন্য বা ঐ রকম কারণে মুচলিকা দিয়াছিলেন তাঁহাদের গণনা করা হয় নাই।

বয়স

১০—১৫	১৬—২০	২১—২৫	২৬—৩০	৩১—৩৫	৩৬—৪৫	৪৫ বছরের উপর
২	৪৮	৭৬	২৯	১০	৯	১

জাতি

কায়স্থ	ব্রাহ্মণ	বৈদ্য	মাহিষ্য	কৈবর্ত্ত	সাহা	রাজপুত	তাঁতি	বৈশ্য	কর্ম্মকার	বারুই	মুচী	শূদ্র	ভিস্তি	ইউরোপীয়ান, অস্ত্র-আমদানী ব্যাপারে
৮০	৬৫	১৩	৩	৩	২	১	১	১	১	১	১	১	১	৪

ব্যবসায়

ছাত্র	[illegible]	শিক্ষক	তালুকদার	কোনও ব্যবসায় নাই	ব্যবসায় বা [illegible]	ডাক্তার অথবা কম্পাউণ্ডার	কেরাণী ও সরকারী কর্ম্মচারী	সংবাদ পত্র	কৃষিব্যবসায়ী	আফিস আদালত